ভূমিকা

গোপাল হালদার



ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬।

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৫৯

দাম—সাড়ে তিন টাকা।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কথা-সাহিত্য: ভাঙন, স্রোতের দীপ, উজান গঙ্গা।
একদা, অন্য দিন, আর-এক দিন।
পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তের শ' পঞ্চাশ।
ধূলিকণা।

প্রবন্ধ-সাহিত্য: সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (যন্ত্রস্থ), বাজে লেখা (যন্ত্রস্থ), এ যুগের যুদ্ধ (ছাপা নাই), বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা: ১২০০ খ্রী—১৮০০ খ্রী, (যন্ত্রস্থ)।

৪২নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরির পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

উপন্যাসের সঙ্গে সত্যের গভীর সম্পর্ক থাক্‌লেও তার কাহিনীর ঘটনা ও চরিত্র যে কাল্পনিক, তা বলাই বাহুল্য। এ কাহিনীতে অনেক খানে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়েছে। বাঙলার ইতিহাসের ইংরেজ-পূর্ব যুগের সাধারণ রূপরেখা যদি বাঙালী পাঠকের সুপরিচিত হত, তা হলে লেখকের পক্ষে তা অবতারণা করা প্রয়োজন হত না। তথাপি পাঠকের পক্ষে সে সব কথা শ্বাসরোধী হবে না, এই মাত্র আশা করি। এ আখ্যানের কাল অবশ্য বিরাট—প্রায় ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত। ১৮৫০এর সময়কার কোনো বাঙালীর মনেও কল্পনায় সেকালের ঐতিহ্য যে রূপ গ্রহণ করেছে—উপন্যাসে তাই বর্ণনা করার চেষ্টা হয়েছে। এ চিত্র কতটা সঙ্গত অসঙ্গত তা হয়ত ঐতিহাসিকের বিচার্য, এবং কতটা সার্থক-অসার্থক তা বিচার্য পাঠক-সাধারণের। উভয়েরই সমালোচনার প্রতীক্ষা করবে লেখক। ইতি

১১. ৯. ৫২ ইং —লেখক

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

ভূমিকা

এক কালে বাড়ি ছিল প্রকাণ্ড; কিন্তু আজ আর তাহার কিছুই নাই। ক্রোশ দুই দূর হইতে গর্জিয়া গর্জিয়া দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ভয়ঙ্করী পদ্মা। আসিবার পথে সে কিছুই ফেলিয়া দিয়া আসে নাই। চৌধুরীদের বহু পুরুষের সঞ্চিত সৌভাগ্যও ধুইয়া মুছিয়া ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে। এ কালের এই ভদ্রাসনের দক্ষিণ দুয়ার হইতে এখন দেখা যায় সেই শ্যামল শ্রীর পরিবর্তে গেরুয়া রঙের নদীজলের নৃত্য-চঞ্চলতা। মাঝখানে তৃণাচ্ছাদিত সামান্য মাঠ, তাহার পরেই পদ্মার মৃদু-মন্থর অলস স্রোত। ভোগতৃপ্ত আয়াসে যেন নদী তৃণশয্যায় গড়াগড়ি দিয়া এখন অবসর বিনোদন করিতেছে। অদূরে পঙ্কলিপ্ত শ্যামায়মান চর; চৌধুরী বংশের নিঃশেষিত বিত্ত বিষয় তাহার তলায় অবলুপ্ত। আর, তাহার উপরে আজ প্রজাপত্তন করিতেছে কালচিতার সেনেরা।

হিজল-ছাতিমের ছায়াতলে চিত্রিসাবের চৌধুরীদের এযুগের ভদ্রাসন কাঁপিতেছে। পশ্চিমের ঝোপে-ঝাড়ে পড়ো ভিটায় বন-জঙ্গলের মধ্যে সমাহিত তাহাদের পুরাতন গৃহ-অট্টালিকা। কিন্তু সেই পুরাতন চিহ্নেরই বা বাহুল্য কোথায়? অনেক দিনই তাহা জনশ্রুতিতে পরিণত। কোথায় ছিল পূর্বদুয়ারী 'দরোয়াজা'; কবে সেই 'ফটক' ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কে বলিবে? দীঘির বাঁধানো ঘাটের চিহ্ন খুঁজিয়া কে পাইবে? সিংহবাহিনীর পুরাতন মন্দির কবে ভাঙিয়া

শেষ হইয়া গিয়াছে ; ছোট মন্দিরে ঠাঁই লইয়াছেন চৌধুরীদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহা ঘিরিয়াও নামিয়াছে একটা পুরাতন বটগাছের ঝুরি। নীলমাধবের দেউল ও কাছারি বাড়ি ত সেদিনের জিনিস—কোম্পানির রাজ্য এই দূর পূর্ব বাঙলায় তখন মাত্র জাঁকিয়া বসিতেছে। কিন্তু দেউল আজ জীর্ণ ; ইট খসিয়া পড়িতেছে। কাছারির শুধু ভিটাই আছে। 'শঙ্কর দীঘি' নামেই শুধু রহিয়াছে, দীঘি আর নাই। নানা জাতীয় বন জঙ্গলে কবেই দীঘির জল মুখ ঢাকিয়াছিল। তাহার উপরে শূকর, শৃগাল চরিয়া বেড়াইত। বড় বড় অজগর নিরুপদ্রবে বাস করিত। পদ্মাই সেই অজ্ঞাতবাস ঘুচাইয়া দিল। ভাঙা পাড়ের মধ্য দিয়া খালের জল দীঘিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। বনাবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া নদীস্রোত হঠাৎ যেন বহুকালের ইতিহাসকে জোয়ার-ভাঁটার বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে আসিল সপ্ত-সমুদ্রের প্রাণোচ্ছ্বাসের সঙ্গে। 'শঙ্কর দীঘি' তাই নামেই শুধু 'দীঘি'।

চিত্রিসারের চৌধুরীদেরও নাম ছাড়া আর কোন্ বৈভব এখন আছে ? সেই নামের আশ্রয়েই তথাপি বাঁচিয়া আছে পরিচয় ; আর সে পরিচয় অতীতের নামে দাবী করে আবার নূতন পরিণতি। ইতিহাসের ক্ষীণ শিখা নিবু নিবু হইয়া যেখানে নিবিয়া যায় সেখানে তাই কল্পনা তাহার ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়—অবারিত। জনশ্রুতি রূপকথার আলোকে রূপায়িত হইয়া উঠে। কালের পরিমাপ সেখানে তুচ্ছ, তুচ্ছ সেখানে ইতিহাসের প্রমাণ-পত্র। চিত্রিসারের চৌধুরীরা আপন মনে গড়িয়া চলে আপনাদের ইতিহাস। রক্তের মধ্যে তাহা দোলা দেয়, জীবনে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিতে থাকে। কল্পনা হইয়া উঠে নূতন প্রেরণা। কিন্তু হঠাৎ তখন চোখে পড়ে আবার পদ্মা। কানে ভাসিয়া আসে কল-হাসি সেই ক্রুর-কুটিল স্রোতের। নূতন কাল

রূঢ় হস্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে স্বপ্নের জাল। জোয়ার-ভাঁটা দিনে দুই বেলা জানাইয়া দেয়—ওই বাঁশ বনের, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আর আপনার একান্ত আশ্রয়ে আপনি সম্পূর্ণ থাকিবার উপায় নাই চিত্রিসারের,—সাগর হইতে সাগরান্তর পর্যন্ত তাহাকে টানিতেছে অন্তরে-বাহিরে,—কল্পনার সমস্ত ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিলেও সাধ্য নাই চৌধুরীরা আর আগ্‌লাইয়া রহিবে ভূমি-সম্পদ ও ভৌমিক মহিমা।

১

শঙ্কর দীঘি

শঙ্কর চৌধুরী :

বিস্মৃতির ঘন-কালো স্রোতের ওপারে চৌধুরীদের চোখে জাগিয়া উঠে এক সৌম্য সুদীর্ঘ সমুন্নত-দেহ ব্রাহ্মণ মূর্তি। ভারদ্বাজ হলভদ্রের সন্তানদিগের সহজ জীবন-গতি তাঁহাকে ঘিরিয়াই হইয়া দাঁড়াইয়াছে চৌধুরীদের ইতিহাস।

উপরের আকাশের আর নিম্নেকার মাটির অনাদি কালের লীলা-রহস্য কবে সমুদ্র-স্নান শেষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সমতট-বঙ্গের বন-জঙ্গল জলাভূমি হইয়া; তাহার তটে-তটে সমুদ্রযাত্রী আদিম মানবের হল্লাশ্রয়ী জীবন-যাত্রা কবে পাইয়াছিল আপনার আশ্রয়; আদিম জীবনযাত্রার সেই প্রদোষান্ধকার ছাইয়া ইতস্তত এখানে-ওখানে কবে জ্বলিয়া উঠিল নূতন মানুষের নূতন যজ্ঞাগ্নি আর গৃহদীপ;—তারপর চলিতে লাগিল বিক্রমপুর হরিকেল পট্টিকেরায় গ্রামে জনপদে, মঠে মন্দিরে, নগরে বন্দরে

ভূমিকা

বৌদ্ধ ও জৈনের, শৈব ও বৈষ্ণবের অভিনব উৎসব ;—সে সব কাহিনীরই বা স্মৃতি কোথায় আর? এ কালের পরিচয় এই :—এই মাঠ বন-জঙ্গল শঙ্কর চৌধুরীরই করস্পর্শে হইয়া উঠিয়াছে নূতন গ্রাম—চিত্রিসার।

কুলজীর পাতা নামটি তুলিয়া ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া যায়,—ইতিহাসের সঙ্গে তাহার পরিচয়ও নাই। কিন্তু ইতিকথার প্রতিধ্বনি কুলজীর সেই দশ পুরুষের নামের মধ্য হইতে এক-একবার ধ্বনিয়া উঠে। আড়াই শত বৎসরের অন্ধকারের ওপারে তাহার চকিত আলোকে এক-একবার চোখে পড়ে—চিত্রিসারের শঙ্কর চৌধুরী। কুলজী স্তব্ধ হয়, কিন্তু দশ পুরুষের কল্পনা কল্লোলিত হইয়া উঠে।

শ্রীপুরের প্রাসাদে তখন কেদার রায় কিংবা চাঁদ রায় আপনার বাহু-বলে আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত। শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে শ্রীখণ্ডের ভট্টগ্রামী গোবিন্দ তাঁহার প্রশস্তি পাঠ করিতেছেন : তুষারশুভ্র কৈলাস-গিরি পরিত্যাগ করিয়া যে মহেশ্বর ইন্দ্রলোকেও যান না, হে মর্তবাসি, সেই কেদারেশ্বর চন্দ্রমৌলি আজ যশোজ্যোৎস্নায় ভূষণা-শ্রীপুর আলোকিত করিয়াছেন। ওহো নভস্তল, মুখাবগুণ্ঠিত করো এইবার। সনাথ তারকারা আজ এই পূর্ব জম্বুদ্বীপের ভূষণাবরণে মুগ্ধ। চপলা "শ্রী" সেই মহীপতি বীরবরের সুরক্ষিত "পুরে" স্বয়ং বন্দিনী। শত্রু-বিনাশন, গো-ব্রাহ্মণ-পালক কেদার রায়, তোমার জয় হউক। জয় হউক রাজা চন্দ্র তোমার।

রাজার আহ্বানে রাঢ়ীয় পণ্ডিতেরা আসিতেছেন এই বঙ্গভূমিতে। রাজসভায় ভট্ট গোবিন্দ অন্যতম সভাপণ্ডিত। শ্রীপুরের উপকণ্ঠে তিনি

সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। সঙ্গে আসিল বিধবা ভগ্নী ও ভাগিনেয় বালক শঙ্কর।

ইতিহাসের তড়িৎ-ছটায় দেখা যায়—শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা ছিপ। গঞ্জালিসের ফিরিঙ্গি সাকরেদরাও আসিয়া সেখানে জমিতেছে। দেশী পাইক ও বরকন্দাজের উপরে দুই-দশজন পাঠান সর্দার ও সওয়ার। 'বারো ভুঞার' এক সামন্ত ভূষণার রাজা চাঁদ রায় আপনার অতিথি পাঠান সুলেমান ও ওস্‌মানকে বন্দী করিতে গিয়া আপনার প্রাণ হারাইলেন। শ্রীপুরে পিতা কেদার রায় তখনো রাজা। সামন্ত সংগ্রামে কখনো তিনি হারিতেছেন, কখনো জিতিতেছেন। অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের বিজয়-বাহিনী সমস্ত হিন্দুস্থানের খণ্ড-বিখণ্ডিত সামন্ত-রাজ্যকে চূর্ণিত করিয়া নদীনালা বনভূমিতে দুর্গম এই অরাজক বাঙালার ক্ষুদ্র ভৌমিকদের স্পর্ধাকে ধূলিসাৎ করিতে আসিতেছে। আসিতেছে সামন্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জল মধ্যাহ্ন, আর পরে ছায়া-স্তিমিত ম্লান মোগল অপরাহ্ণ। কারণ, তখন পৃথিবীর অন্য দূর প্রান্ত হইতে ইউরোপীয় উদ্যোগের বিজয়যাত্রা ভারতেও আসিয়া ঠেকিতেছে। তড়িৎ আলোকে দেখা ইতিহাসের এই সংকীর্ণ সন্নিকট পটভূমিকার ওপরে চিত্রিসারের চৌধুরীদের কল্পনা কিন্তু আঁকিয়া যায় রূপকথার রঙে ইতিহাসের রেখা মিলাইয়া মানুষের উপাখ্যান—শঙ্কর চৌধুরীর কাহিনী।

কল্পনার এই শ্রীপুরের ঘাটে থাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত শত শত কোশা নৌকা। তাহাদের মাল্লারা মাথার ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া দাঁড় টানিয়া পরস্পর পাল্লা দেয়—আজও যেমন বাচ-খেলার দিনে পাল্লা দেয় চিত্রিসারে লক্ষণ মাঝি আর ফরিদ মাঝি এই পদ্মার ঘাটে।

ভূমিকা

কালো তৈল-মসৃণ সেই শ্রীপুরের মাল্লাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল, কালো সুপুষ্ট চিক্কণ তাহাদের দেহ। হাতের মাংসপেশী দাঁড়ের টানে টানে নাচিয়া নাচিয়া উঠে, কবাটের মত প্রশস্ত বক্ষ প্রসারিত হয়, মুখ হইতে ঘন ঘন উঠে দৃপ্ত জয়ধ্বনি 'জয় মা গঙ্গা।' তখনি আবার প্রতিধ্বনি উঠে তেমনি উচ্চকণ্ঠে, অহঙ্কারে—'বদর। বদর।' কর্ভোলিয়াসের ফিরিঙ্গি মাল্লারাও অমনি চীৎকার তোলে দুর্বোধ্য ভাষায়, 'আভে ম্যারিয়া।' নৌ-চালনায় ফিরিঙ্গিদের নিপুণতা অতুলনীয়; যুদ্ধে ইহাদের সাহস দুর্মদ, আর ক্রূরতায়, ছলনায়, নৃশংসতায় বোম্বেটের নাম সমস্ত নিম্নবঙ্গের বিভীষিকা। কর্ভোলিয়াস দরবারে উপস্থিত হইলে স্বয়ং রাজা তাহাকে সসম্মানে সম্বর্ধিত করেন, আপনার হস্তে পান-তাম্বূল দেন, রাজভ্রাতা ও রাজপুত্রদেরই সঙ্গে তাহার আসন নির্দিষ্ট হয়। কারণ, বহু প্রয়াসে চাঁদ রায় গঞ্জালিসের মিত্রতা লাভ করিয়াছেন, বহু যত্নে তিনি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাই না আজ মেঘনা-ধলেশ্বরীর কূল একটু উপদ্রব-মুক্ত হইয়াছে। আর গঞ্জালিসের বন্ধু শ্রীপুরের ভুঁইঞা চাঁদ রায় নৌবহরের দর্পে সকল ভুইঞার দর্পকে খর্ব করিবারও আশা পোষণ করেন। কর্ভোলিয়াস্ যখন সহায় তখন শ্রীপুরের ছিপ মেঘনা বাহিয়া শীতলাক্ষ্যার উপর দিয়া সোনার গাঁয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আর কতক্ষণ? চন্দ্রদ্বীপ ভূষণার দিকেই বা শ্বেত পক্ষ শ্যেনের মত ছুটিয়া যাইবে না কেন চাঁদ রায়ের নৌ-বহর? গর্বে আপনার মধ্যে আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারেন না শ্রীপুরের ভুইঞা চাঁদ রায়।

অদ্ভুত ফিরিঙ্গি মাল্লারা! শুভ্র সুগৌর বর্ণ রৌদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়া উঠিয়াছে, অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সেই অমানুষী রঙ্। মানুষের গায়ের রঙ্ বুঝি এত সুন্দরও হয় না, এত ভয়ঙ্করও হয় না। ঝাঁকড়া চুল, কিন্তু সেই আপিঙ্গল কেশ রৌদ্রের আভায় আগুনের মত জ্বলিয়া

উঠে। দেহ আঁটিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদ। সুদীর্ঘ দেহ চুরিদার ইজের আস্তিন কুর্তায় দীর্ঘতর। কাহারো চোখ আশ্চর্য নীল, কাহারো চোখ আবার পিঙ্গল। কিন্তু কোনো চোখে কোথাও নাই কৃষ্ণ তারকার শান্ত স্নিগ্ধতা। সেখানে নিশ্চিন্ত নির্মমতার বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠে, পাশব উল্লাসের উৎকটতা বীভৎসতা নাচিয়া ফিরে। ফিরিঙ্গি মাল্লাদের আশ্চর্য নৌ-কৌশল ও অদ্ভুতরূপ দেখিতে দেখিতে শ্রীপুরের নদীপারের গ্রামবধূরা পলকহীন চক্ষে যেমন দাঁড়াইয়া পড়ে, ভুলিয়া যায় অবগুণ্ঠন টানিতে, তেমনি আবার চমকিয়া উঠিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া ছুটিয়া পালায় গৃহপথে—ফিরিঙ্গির শাণিত দৃষ্টির কঠিন আঘাতে, দুর্বোধ্য ভাষার আব্রুহীন ইঙ্গিতে। গৃহে পৌঁছিয়াও বুক কাঁপিতে থাকে—'হারমাদের' কি মতলব, কে জানে!

সিপাহী-লস্করদের আস্তানা নদী পারে মাঠের ওদিকে। সেখানে কুচ-কাওয়াজ করে আহসান সিপাহীরা। পিয়াদা পাইকেরা লাঠি ও সড়কি লইয়া 'মার-মার' হাঁক দিয়া এক দল অন্য দলের সঙ্গে লড়াইতে নামে। লম্বা সড়কির উপর ভর দিয়া লড়াইয়ের মাঝখানে লাফাইয়া পড়ে কেহ। তারপরে তরবারি হোক্, সড়কি হোক্, তাহারই একটা অদ্ভুত ভেল্‌কি খেলিতে থাকে মাঠে। কখনো ইহাদিগকে আবার খেলা দেখায় পাঠান ও ফিরিঙ্গি সওয়ার বন্দুকচিরা। ছোট ছোট সীধা তরবারি লইয়া কখনো ফিরিঙ্গিরা নামে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। মুহূর্ত মধ্যে অপূর্ব খেলা জমিয়া উঠে। হাতের অস্ত্র দেখা যায় না,—শুধু দেখা যায় রৌদ্র দীপ্ত ইস্পাত ফলকের বিদ্যুৎ-বৃষ্টি। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময় সওয়ারদের কুচকাওয়াজ আর জিন্‌শি ও দস্তি কামানের বজ্রনির্ঘোষ। আগুনের নুড়ি ছোঁয়াইয়া দিতেই এক-একটা কামানে পঁচিশ বজ্র সমকালে গর্জিয়া উঠে—কানের পর্দা ছিঁড়িয়া যায়। পাঠান সওয়ারেরা বর্শা নাচাইয়া, পাগড়ী দোলাইয়া,

রঙীন কুর্তার ঝাল-মলানি তুলিয়া ছুটিয়া আসে। চক্রাকারে ঘোড়াগুলি ছুটিয়া ফিরে। বল্‌গার বন্ধনে বুঝি তাহাদের সংযত করিয়া রাখা যায়না। অশ্বখুরে শব্দ উঠিতেছে, রশ্মি-বদ্ধ মাথা মাটির দিকে নিবদ্ধ হইতে চাহে না, ঘাড় বাঁকাইয়া যাইতেছে—সমস্ত অঙ্গ ঘিরিয়া একটা শক্তির দুর্জয় প্রবাহ! পৃষ্ঠস্থিত পাঠান সর্দার ও সওয়ারদের চোখে মুখে বাহুতেও শক্তির তেমনি অদম্য দীপ্তি।

ভট্ট গোবিন্দের নির্বোধ ভাগিনেয় এই পটভূমিকার উপর পড়িয়া হইয়া উঠিয়াছিল শঙ্কর চৌধুরী।

কল্পনা পটের উপর রেখা আঁকিয়া চলে—নাম রূপ ধরে: শঙ্কর চৌধুরী।

সন্ধিসূত্র শেষ হইয়াছিল, কিন্তু মুগ্ধবোধ আর শেষ হইতে চাহে না। শঙ্করের মন পড়িয়া থাকে ফৌজী মাঠে, বহরের ঘাটে। একবার মীর বহরের ফিরিঙ্গি সহকারী রোজারিয়োর কাছে শিখিয়া লওয়া যায় না ওই খেলাটা? শিলাদার সর্দার আমিন খাঁর ছেলে নেমুকে সে তলোয়ারের খেলায় সদ্য পরাজিত করিয়া আসিয়াছে।

পাঠানের ছেলে আজ ব্রাহ্মণের নিকট অস্ত্র খেলায় হারিয়াছে। শঙ্করের জয় হইয়াছে। 'জয়'—শব্দটা শঙ্করের বুকের মধ্যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বহন করিয়া আনিয়াছে। কিশোর মনের মধ্যে আত্ম-শক্তির এই প্রথম বার্তা পৌঁছিতেই অবরুদ্ধ আশা এক উল্লাস শিহরণে পরিণত হইল। 'হার মানিয়াছে', 'হার মানিয়াছে'—তাহার শক্তি অপরের শক্তিকে বশীভূত করিয়াছে সে জয়ী, জয়ী, জয়ী। জয়মদের এই প্রথম স্পর্শে কিশোর মন যেন আপনাকে অমনি খুঁজিয়া পায়:—হারাইতে হইবে, হারাইতে হইবে, আরো অনেককে হারাইতে হইবে—এমনি করিয়া

ভূমিকা

তলোয়ারের খেলায়, ঘোড়ার দৌড়ে, নৌকার পাল্লায়—হইতে হইবে জয়ী, জয়ী, জয়ী। তবেই না সুখ, সার্থকতা।

তাল পাতার পুঁথি খোলাই পড়িয়া থাকে। আচার্য্য ভট্ট গোবিন্দের পদধ্বনি শোনা যায় চতুষ্পাঠীর প্রাঙ্গণে। ন্যায় ও অলঙ্কারের ছাত্ররা সসম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শঙ্করের মন স্বচ্ছ, লঘুপক্ষ। পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়া তাহা উড়িয়া চলিয়াছে অন্য লোকে। জয়ী, জয়ী, জয়ী—সে জয়ী।

দুরন্ত অশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে—বুঝি দন্তাঘাতে সে বল্‌গা পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ঘাড়ের কেশর তুলিয়া উঠিতেছে, লাঙ্গুলের ছাঁটা চুল এদিকে ওদিকে চলিতেছে। প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিতেছে অশ্বখুরের খরধ্বনি। বাসন্তী রঙের পাগড়ী উড়াইয়া রক্ত বর্ণের আংরাখা গায়ে আঁটিয়া, সুদীর্ঘ কেশ ঘাড়ের উপর দোলাইয়া বর্শা হাতে তাহার পৃষ্ঠে শঙ্কর—চতুর্দিকে তুমুল উৎসাহ-বাণী। প্রাসাদ ঝারোকায় বুঝি সবিস্মিত গুঞ্জন, পাত্রমিত্র সভাসদ্‌সহ রাজা কেদার রায় বিমুগ্ধ ; হাজারী সওয়ার ইলিয়াস খাঁ সগর্বে হাঁকিতেছে—'সাবাস্‌! সাবাস্‌!'

শঙ্করের তন্দ্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনি স্বপ্নের টুকরা।

রাত্রি প্রভাত হইলে সে গিয়া বসে সিপাহী পাড়ায় সওয়ার মহলে। তাহাদের ছেলেদের সঙ্গে তাহার ডন-কুস্তির লড়াই জমে। কথায় গল্পে ভরিয়া উঠে মন। সেখানে গল্প—হাতিয়ার তলোয়ারের, ছিপ-কোশের বন্দুক-কামানের। তাহাদের কথায়-কথায় শক্তির লড়াই, দৈহিক বল ও কৌশলের প্রতিযোগিতা। রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরের বার্তা লইয়া আসে কেহ ; কেহ সিপাহী, কেহ সওয়ার, কেহ বা কোনো স্বদেশ বিতাড়িত মগ-ফিরিঙ্গি। জৌনপুরের রাজ্যহারা শর্কিবংশীয় সুলতান হোসেন শাহ-এর সঙ্গে গৌড়ে আসিয়াছিল ইলিয়াস হাজারীর পূর্ব্বপুরুষ।

কেহ তাহারা গিয়াছে শ্রীহট্টে, কেহ গিয়াছে রোসাঙ্গের দরবারে। ইলিয়াশ আসিয়াছে ঈশা খাঁর রাজ্য হইতে ভাগ্যান্বেষণে শ্রীপুর-বিক্রমপুরে। এক ব্রাহ্মণ কর্মচারীর কন্যা ছিলেন তাহার মাতা। মুখে ইলিয়াশের এখনো গল্প ঈশা খাঁর, শের শাহ-এর, কতলু খাঁ, মাশুম খাঁ কাবুলীর। আবার, জৌনপুরের, কনৌজের, দিল্লীর, পানিপথের ; তারপর কখনো বা অযোধ্যার, ইন্দ্রপ্রস্থের, কাশী, কুরুক্ষেত্রের। শুনিতে শুনিতে কল্পনাও যদৃচ্ছা ছুটিয়া বেড়ায়। সঙ্গতি অসঙ্গতি, সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে বালকের মন ভেদ-রেখা মানে না। কাবুল, কান্দাহার, বুখারা, সমরকন্দ, বোগদাদ-ইস্পাহান—দিল্লী, লাহোর, কাশী-কাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র-দ্বারাবতী—সব একসঙ্গে মিশিয়া যায়। নব-নব রাজ্যের নব-নব নগরের নাম অদেখা মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-মন্দ্রের মত কৈশোর-চপল বালকের কানে ধ্বনিত হয়। ওই অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া ইলিয়াশের মত ছুটিয়া গেলেই হয়,—মাঠের পর মাঠ ছাড়াইয়া ;—ওখানে শিক্রী, থানেশ্বর, পানিপথ, দিল্লী, দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র,—কুরুপাণ্ডবের অযুত অক্ষৌহিণী, রণসমুদ্রের বিপুল মন্থন। অথবা ঐ ছিপ্ বাহিয়া রোজারিও'র মাল্লাদের মত দক্ষিণ নদীতে যাত্রা করিলেই হয়—মেঘনার কালো জল ছাড়াইয়া নীলসমুদ্রে ;—পাল-তোলা ডিঙা,—বণিকের স্বর্ণ-লঙ্কা, সুবর্ণ দ্বীপ প্রবাল দ্বীপ ছাড়াইয়া নারিকেল, দারুচিনি বনের রাজ্য ছুঁইয়া ধবল-গিরির দেশে ভিড়িবে জাহাজ,—যেখানে মাতা-মেরীর নামে প্রার্থনা করে শ্বেতাঙ্গ নর-নারী ; ক্রুশবিদ্ধ দেবতার উদ্দেশে করে রণসজ্জা নূতন পৃথিবী জয়ের আকাঙ্ক্ষায়।

কোথায় যায় ন্যায়ের টীকা, ব্যাকরণের সূত্র, মাতুলের ভর্ৎসনা, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পাড়ার বিদ্রূপ।—কোনো কিছুই শঙ্করের কানে পৌঁছায় না। বিপুলা পৃথিবীর বিচিত্র কাহিনী, বীরভোগ্যা বসুন্ধরার দুর্বার বাণী

—সব মিলিয়া যেন শঙ্করকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। চক্ষুর সম্মুখে সে যে পাড়িতেছে সৌভাগ্যের সুস্পষ্ট লিপি—ব্রহ্মত্র দেবত্র নয়, তলোয়ারে বীর্যে, সাহসে সম্পদে, ভূমিতে জায়গীরে মানুষের মর্যাদা, পুরুষের পরীক্ষা, কুলের প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন 'ব্রাহ্মণের ধর্ম—অধ্যয়ন অধ্যাপনা।' শুধুই অধ্যয়ন অধ্যাপনা ? ইহাই কি জাতিধর্ম শঙ্করের ? আর ভয়াবহ এই জাতিধর্ম ত্যাগ ? তাহা হইলে শ্রীপুরের রায় কি ব্রাহ্মণ নন ? তাঁহার রাজসভায় মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষরাও অনেকেই ত ব্রাহ্মণ। তাঁহারাই সৌভাগ্যের অধিকারী, রাজ্যে পাত্র মিত্র সেনাপতি। তাঁহাদের ছেলেরাও অস্ত্রবিদ্যাই শিক্ষা করে,—শাস্ত্র পাঠ ও স্মৃতির ব্যাখ্যা লইয়া কিছুমাত্র ব্যস্ত হয় না। শঙ্করই কি শুধু রচনা করিবে অনুষ্টুভ ছন্দে তাঁহাদের প্রশস্তি ; আর আশীর্বচন বিলাইয়া এই তাহার কুস্তি, কসরৎ, বাচ-খেলা আর ঘোড়-দৌড়ের সঙ্গীদের নিকট হইতেই মাগিয়া লইবে ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ? —ভট্ট গোবিন্দ বুঝাইতে চাহেন—হাঁ, ইহাই তাঁহাদের কুলগত প্রথা। মাতা চিন্তিতা, জানান—বহুবিশ্রুত কুলীন কুলের বংশধর শঙ্কর,—অশ্ব পৃষ্ঠে চড়িতেও তাহাদের মানা। শঙ্কর চোখের সম্মুখে দেখে—সওয়ারের সদর্প ক্রীড়া-কৌশল, মাল্লাদের বলিষ্ঠ বাহুর অদ্ভুত সৌন্দর্য। রাজসভায় সে দেখে ইলিয়াশের আদর, রোজারিওর দম্ভ, তোপখানার ব্রাহ্মণ দারোগা মোহন পাঠকের মর্যাদা, বৃদ্ধ দেওয়ান রামশরণ রায়ের বিষয়-বৈভব, কুলগর্ব। শঙ্কর দেখে আর কুলধর্মের বিধি-নিষেধ যেন শিথিল হইয়া যায়। পুরুষের ধর্ম পৌরুষ ; বীর্যশুল্কে ক্রয় করিতে হয় পৃথিবীর স্বামিত্ব ; বিষয়-বিত্তে, জমিতে-জায়গীরে স্থায়ী করিতে লক্ষ্মীর আসন। সব না জানিলেও শঙ্কর বুঝিতেছে—সাহস, কৌশল, উদ্যোগ—ইহাই পুরুষের ধর্ম, কুলের ধর্ম, জাতির ধর্ম। ইহাতেই মানুষের জীবনের জয়পত্র। কিছু না জানিয়াও

শঙ্কর চাহে—শস্ত্রবলেই আপনার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা। শঙ্কর চাহে—ভৌমিকের অভীষ্ট—ভূমি-সম্পদ, সামন্তের জমি-জায়গীর।

শঙ্করের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পথও মুক্ত হইয়া গেল।

নদীর ঘাটে সেদিন বাচ-খেলা। কনিষ্ঠ রাজভ্রাতা কেশব রায় রোজারিওর সাকরেদ শঙ্করকে হালে বসাইয়া খেলায় জিতিলেন।

কুতূহলী ছোট রায় জিজ্ঞাসা করেন: কে তুমি?

—মুখুটি গাঁইএর শঙ্কর ওঝা—ভট্ট গোবিন্দের ভাগিনেয়।

ছোট রাজা কর্ভোলিয়াসকে আপ্যায়ন করেন: ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেদেরও ওস্তাদ করিয়া তুলিলে তোমরা সাহেব?

কার্ভোলিয়াস সদম্ভে বলে: জেন্টুরা কি আর কালাপানি পাড়ি দিবে? না হইলে তৈরী করিতে পারিতাম কাফ্তান।

ভট্ট গোবিন্দকে রায় বলেন: চতুষ্পাঠীতে কি এই শিক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন নাকি আচার্য?

ম্লান হাস্যে ভট্ট উত্তরদান করিলেন: শাস্ত্র ত ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, এইবার চতুষ্পাঠীতে শস্ত্রই জাঁকিয়া বসিবে।

ছোট রায় হাসিলেন: দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যরা না থাকিলে রাজপুত্রদের গুরু হইবেন কে?

শঙ্করের প্রাণে গর্বের হিল্লোল খেলিয়া বেড়ায়।

ছোট রাজমাতা শঙ্করকে স্বর্ণবলয় কুণ্ডল উপহার দিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরাণীকে রাজমাতা জিজ্ঞাসা করেন: এবার বিবাহ দিন ভাগিনেয়ের।

—রাঢ় হইতে পাত্রী আনা প্রয়োজন—

—কেন? এ রাজ্যে পাত্রী নাই। এই ত—

সাত বৎসরের একটি বালিকা দেওয়ান-বধূর অঞ্চল আশ্রয় করিয়াছে

ততক্ষণে। রাজমাতা দেওয়ান বধূকে বলিলেন: রায় বউ, জামাই পাইলে ত?

রায় বউ গম্ভীর। বলিলেন: আমাদের ক্রিয়াকর্ম ভুঞাদের সঙ্গে; তাঁহাদের আমাত্য, পাত্রমিত্রদের সঙ্গে। ব্রহ্মত্রজীবী অধ্যাপক পুরোহিতদের কিছুই আমরা জানি না।

দম্ভ যেন গৃহ মধ্যে থম থম করিতে লাগিল।

গম্ভীর হইল ভট্ট গোবিন্দের ব্রাহ্মণীর মুখ। কণ্ঠ শোনা গেল আচার্যের ভগিনীর: না, রাণী মা, এই সৌভাগ্য আমাদের জন্য নয়। স্বভাব কুলীনের সন্তান শঙ্কর—মেলভঙ্গ সে করিবে কিরূপে?

ছায়া ঘনাইয়া উঠিল যেন গৃহে।

রাজভগ্নী সোনামতী বলিলেন: কেন? শঙ্কর যোদ্ধা,—সে সর্দার হইবে। তাহার আবার কুলীন-অকুলীন কিসের?

রাজমাতা হাসিলেন: ইহা আমাদের ভুঞাদের কথা। উঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, উঁহাদের রীতি অন্যরূপ।

কিন্তু ভারদ্বাজ বলভদ্রের সন্তানও মনে মনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল।

কেশব রায় তখন তাহাকে আপনার পার্শ্বরক্ষী করিয়া লইয়াছেন। রাজ কৃপার দুয়ার খুলিতেছে। সে জয়ী হইবে,—জয়ী, জয়ী, জয়ী।

আকাশের নীল শয্যা ছাড়িয়া যে চন্দ্র ভূষণায় সতারকা বিলাস করিতেছিলেন, তিনি আকাশের কোলে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভট্ট গোবিন্দ, আচার্য দেবী দাস, মন্ত্রিবর সুধাকর শ্রীপুরপতি কেদার রায়ের যশোগাঁথা রচনায় ব্যস্ত। সেনাপতি মোহন পাঠক ও দেওয়ান রামশরণ রায় কার্ভোলিয়াসকে লইয়া বসিয়াছেন সন্দ্বীপ বিজয়ের দ্বারাই রায়ের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করিবেন, না, সোনার গাঁয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া

শ্রীপুরের রাজ-গরিমা প্রসারিত করিবেন। এমন সময়ে সংবাদ পৌছিল মশ্বাদি, রাঙ্গামাটি রণ-ভাওয়াল জয় করিয়া কত্রাভু হইতে ঈশা খাঁর সৈন্য সোনার গাঁয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

চিন্তাগ্রস্ত হইলেন কেদার রায়।

কেমন বীর ঈশা খাঁ?—কেদার রায় জানেন। ইলিয়াশ আবার জানায়, তাঁহার হস্তী অসংখ্য, বন্দুকও অজস্র, তোপখানাও আছে তাঁহার প্রকাণ্ড, উসমান লোহানি তাঁহার এখন সহায়।

কেমন বীর এই ঈশা খাঁ?—জিজ্ঞাসা করেন রাজমাতা, রাজভগ্নী সোনামতী, রাজপরিবারের নর-নারী। রাজভ্রাতার পার্শ্বরক্ষী শঙ্কর বলে: মহাবীর তিনি। ইলিয়াস হাজারী বলে, বাঙালা মুলুকে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। অখণ্ড রাজ্যের অধিকারী ঈশা খাঁ। তাঁহার কপালে রাজ-তিলক। কপিলেশ্বর জ্যোতিঃরত্ন তাঁহার জন্ম পত্রিকা রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঈশান এব ঈশা খানঃ ঈশানী যং ভজতে'—এ পৃথিবীতে গৌরীর মত তিনিও সতীকুল শিরোমণি।

—খাঁ-এর সেই বেগম কে?—সোনামতী জিজ্ঞাসা করেন।

শঙ্কর জানে না, তবে শুনিয়াছে—ভাওয়ালের বেগম আছেন একজনা। বেগম আছেন জৌনপুরী এক কন্যা। কিন্তু কেহ তাঁহারা ঈশা খাঁর রাজরাণী নহেন। বীর ভূঞাদের বীরকন্যা, বীরনারী ছাড়া কে নিজের শক্তিতে গ্রহণ করিতে পারিবে ঈশা খাঁর রাজ্ঞীর আসন?

একদিকে চলিল শ্রীপুরের সিপাহি পাইক, সওয়ার, বন্দুকচি, গোলন্দাজ, সৈনিকেরা। অন্যদিকে নানা রঙের পাল উড়াইয়া মেঘনা, ধলেশ্বরীর বুক খান-খান করিয়া ছুটিয়া চলিল শ্রীপুরের নৌ-বহর।

সোনার গাঁয়ের নিকটে ঘোরতর সংগ্রাম প্রায় পরিবৃত হইলেন কেদার রায়। পার্শ্বে তাঁহার পার্শ্বরক্ষী শঙ্কর; সম্মুখে ইলিয়াসে হাজারী;

চারিদিকে শত্রু। শঙ্কর একবার যুদ্ধক্ষেত্রে তাকাইল—শত্রু, শত্রু, শত্রু —অগণিত, অশেষ সেই শত্রু-বাহিনী। ভাবিবার অবকাশ নাই। মহারাজকে রক্ষা করিতে হইবে, ফিরিতে হইবে নৌবহরে। কপালের স্বেদবিন্দু মুছিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একবার সে দূরে গজপৃষ্ঠস্থ ঈশা খানকে দেখিল—মাথায় হীরকখচিত প্রদীপ্ত শিরাভরণ, গায়ে রক্তবর্ণ আংরাখা, গলায় মোতির মালা, হাতে সমুদ্যত তরবারি, পার্শ্বে আনত বর্শা।—আশ্চর্য তেজোময় উন্নতদেহ বীর মরজবান্-ই-ভাটি।

জীবনের প্রথম যুদ্ধ শঙ্করের। জয়ের সৌভাগ্য হইল না; রণোন্মদনায় আত্ম-বিস্মৃত হইবার মত সুযোগ হইল না তাহার। সে পালন করিবে মহৎ দায়িত্ব—শত্রু পরিবৃত রাজাকে রক্ষা করিবার ভার। বীরত্বের সঙ্গে চাই কৌশলের সংযোগ,—উন্মাদনা নয়, বরং চাই স্থির বুদ্ধি। জয় নয়, আত্মরক্ষা।

আহত-দেহ কেদার রায় সে দিন রক্ষা পাইলেন। শ্রীপুরে ফিরিয়া ইলিয়াশ হাজারীকে তিনি ভুলিলেন না; ভুলিলেন না তাঁহার পার্শ্বচর শঙ্করকে। আহত ইলিয়াশ ঈশা খাঁর বন্দী; আহত শঙ্কর রহিল পুররক্ষার ভারে নৌবহরের নূতন 'হাজারী'।

যুদ্ধ থামে না। ঈশা-খাঁ কেদার রায়ের সংগ্রাম চলিয়াছে, যেমন ভৌমিকে-ভৌমিকে বরাবর যুদ্ধ চলে। সোনার গাঁয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন ঈশা খাঁ। কেদার রায় আজ এখানে কাল ওখানে নৌ-বহর লইয়া হানা দেন।

এদিকে মগেরা তাহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিতেছে; শ্রীপুর পর্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত। পর্তুগীজরা ও সন্দীপ অভিযানে শ্রীপুরের সহায়তা না পাইয়া ক্ষুন্ন। ওদিকে দিল্লীর মোগল বাদশাহ সমস্ত হিন্দুস্থান পদানত করিয়া শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদকেও উড়িষ্যায় অনুসরণ করিতেছেন।

পাঠানের শেষ আশা নিবিয়া যাইতেছে হিন্দুস্থানে। রাজপুত রাজারা বিবাহ-বন্ধনে মোগল বাদশাহের রাজত্বকে হিন্দুস্থান ছাড়াইয়া বাঙালার বুকেও চাপাইয়া দিতে আসিতেছে। ঈশা খাঁ ভাবেন, আজ কি আর বাঙালায় ভূঞাদের পক্ষে পরস্পর সংগ্রাম সাজে? ইহা কেদার রায়েরও অজ্ঞাত নয় যে, সোনার গাঁ আর তাঁহার হস্তগত হইবে না। আরও জানেন—শ্রীপুরও বুঝি ফিরিঙ্গিদের লুব্ধ গ্রাসে পড়িতে যাইতেছে। রাজ-পরিবার সেখানে রাখাও সম্ভবত নিরাপদ নয়।

হঠাৎ শ্রীপুরবাসী চমকিত হয়। ইকদারাপুরের দিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী রামশরণ রায় শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া গোপনে নৌকাযোগে রওনা হইয়াছিলেন, রাজ পরিবারকে ইকদরাপুরে নিরাপদ দুর্গাশ্রয়ে রক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার পর আর তাঁহাদের উদ্দেশ লাভ করা যায় না। কেহ বলেন তাঁহারা জলমগ্ন হইয়াছেন, কেহ বলেন তাঁহারা ঈশা খাঁর নৌ-বহরের হাতে পড়িয়াছেন।

কেদার রায় নদী বক্ষে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় ঈশা খাঁর দূত আসে। তাহার সঙ্গে ইলিয়াস হাজারী ও শঙ্কর ওঝা।

সত্যই তাহা হইলে ঈশা খাঁর হস্তে বন্দিনী সোনামতী।

ইলিয়াস হাজারী জানায়ঃ মহারাজ, বেয়াদবী মাফ হয়।

একবার কেদার রায় বলিলেনঃ রামশরণ রায় ও সোনামতীকে ঈশা খাঁ অবরুদ্ধ করিয়াছেন? বৃদ্ধ মন্ত্রী কি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছেন?

—মহারাজের কিছুই অবিদিত নাই। শঙ্কর ওঝা তাঁহাদের সঙ্গী ছিল। আদেশ করিলে নিবেদন করিবে—দাগাবাজি কেহই করেন নাই। ঈশা খাঁর নিকট দাগাবাজের ক্ষমা নাই।

কেদার রায় বলেন: থাক্। শুধু বলো খাঁ এখন কি চাহেন।

—মস্‌নদ-ই-আলা চাহেন শ্রীপুরের রাজার বন্ধুত্ব। তিনি আপনার কুটুম্ব হইতে চাহেন।

শুনিয়া কেদার রায় চমকিত হইলেন না। হাজারী জানাইল: রাজভগ্নী সোনামতীকেই মহারাজ সোনার গাঁ যৌতুক স্বরূপ দান করিতে পারেন।

শঙ্কর জানায়, মরজবান-ই-ভাটি সসম্মানে রাজভগ্নীকে স্বতন্ত্র অতিথি রূপে রাখিয়াছেন। শ্রীপুরের রাজভগ্নীকে তিনি তাঁহার প্রধানা বেগম করিতে অভিলাষী; রাজভগ্নীর অনিচ্ছায় কোনো কাজই খান করিবেন না। সোনামতী তাঁহার প্রধানা বেগম হইবেন।

আবার বলে শঙ্কর: দিল্লীশ্বরের প্রধানা বেগম আজ রাজপুত-কন্যা—ইহা রাজপুত-রাজ ভগবান দাসের গৌরবের কথা। ঈশা খাঁও আপনার কুটুম্বিতা-প্রার্থী—

কেদার রায় নীরব রহিলেন। শঙ্কর বলিল: মহারাজ জানেন, বাঙালায় এমন কোন ভুঞা আছেন যাঁহার কন্যা, যাঁহার ভগ্নী ঈশা খাঁর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণে করিতে অনিচ্ছুক ?

ভুঞরা সঙ্গে ভুঞার ভগ্নীর বিবাহ—বীরের কণ্ঠে বরমাল্য দিবেন বীরের ভগ্নী,—ইহা নূতন কিছুই নয়। সম্ভবত সোনামতীরও তাহাই ছিল প্রার্থনা; ঈশা খাঁ-কেদার রায়েরও তাহাই ছিল গোপন-ব্যবস্থা।

কেদার রায় তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন: সোনার গাঁ খান্ প্রত্যার্পণ করিবেন না ?

ইলিয়াশও নিবেদন করিল: খাঁর তাহা যৌতুক রূপে প্রাপ্য। খান মহারাজকে ভুষণা পুনরুদ্ধারের সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, মগদের বিতাড়িত করিবার জন্য দিবেন কোশা ও বন্দুক—খানের সোনার-গাঁর

কারখানার কামার কারিগরেরা আপনাকে সরবরাহ করিবে জিনসি ও দস্তি কামান।

সোনার গাঁয়ের কারখানার বন্দুক কামান—বহুমূল্য তাহা যে কোনো ভূঞার পক্ষে।

সন্ধি স্থির হইয়া গেল। যথা সময়ে শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিল ইলিয়াস হাজারী ও শঙ্কর ওঝা: কিন্তু আসিলেন না আর রামশরণ রায় ও সোনামতী। রামশরণ রায়ের পুত্র রামগতি পিতৃপদে দেওয়ান হইয়া বসিলেন। সোনামতী ঈশা খাঁর প্রধানা রাণী সোনাবিবি।

ইলিয়াস হাজারী শ্রীপুরেই নূতন জায়গীর লাভ করিলেন। শঙ্কর ওঝা নৌবহরের নায়েব দারোগা।

মেং রাজগী সেলিম শাহের বিরুদ্ধে কার্ভোলিয়াসের পক্ষে পর্তুগীজদের যুদ্ধে তখনি শ্রীপুরের নামিতে হইল। তাহাতে রোজারিও'র সাকরেদ শঙ্কর। নৌকা লইয়া মেঘনার স্রোত বাহিয়া, উচ্ছ্বসিত স্রোতের চূড়ায় ভাসিয়া, লবণাম্বু রাশির উৎক্ষিপ্ত ফেনায় ভিজিয়া সাগরের উপকূলে, দ্বীপে, সমুদ্রে সেই যুদ্ধ। মগ-ফিরিঙ্গির যুদ্ধে সে কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! পর্তুগীজদের হস্তে সন্দ্বীপ সমর্পণ করিয়া বহু উপঢৌকন লইয়া রোজারিও-কার্ভোলিয়াসের সঙ্গে আবার শ্রীপুরের রাজ দরবারে ফিরিল শঙ্কর। নিজেও সে কম সৌভাগ্য অর্জন করে নাই। কেদার রায় দরবারে তাহাকে সসম্মানে স্থান দিলেন। তাহাকে খেলাৎ দিলেন কাবা কুর্তা, ইনাম দিলেন বিক্রমপুর পরগণায় নূতন জায়গীর। ভট্ট গোবিন্দের ভাগিনেয় উপাধিলাভ করিলেন—চৌধুরী।

কিন্তু ইহাত কাহিনীর আরম্ভ।—এবার সংসারে প্রবেশ করিবেন শঙ্কর চৌধুরী।

রামশরণ রায়ের পুত্র রামগতি তখন ছোট আমাত্য। কেদার রায় বলিতেই ছোট আমাত্য শঙ্করকে জামাতৃপদে বরণ করিতে উৎসুক

হইলেন। আসলে রামগতি রাজাদেশের অপেক্ষায়ই ছিলেন। কন্যা ভদ্রাবতী ইকদারাপুরেই নাকি মনে মনে শঙ্করকে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ভট্ট গোবিন্দের তেজস্বিনী ভগিনী সম্মত হইবেন কি? —অনেক রূপে তুষ্টি বিধান করিলেন রামগতি ও তাঁহার স্ত্রী। মাতাও জানেন—পণ্ডিত সমাজের মতামত ও কৌলিন্যের বিচার মানিয়া নওয়ারার নায়েব শঙ্কর চৌধুরীর চলিবে না। মাতারও গর্ব—তাঁহার শঙ্কর সেনাপতি রাজপুরুষের পদবীর মানুষ;—আর সেই রায়বধূই আসিয়াছেন আজ প্রার্থনা লইয়া।

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। রায় বংশের কন্যাকে গৃহ আনিলেন নায়েব দারোগা শঙ্কর ওঝা।

কল্পনা একবারের মত ডানা গুটাইয়া লয়।' ইতিহাসের আলো জল-জঙ্গলের অন্ধকারে জোনাকীর মত জ্বলিতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। শাহ্ বর্দিকে পরাজিত করিয়া ঈশা খাঁ কত্রাভূপুরে স্বাধীন হইয়া উঠেন, কোচ রাজ্য হইতে ত্রিপুর রাজ্য পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য সীমা বিস্তৃত। তিনি বিক্রমপুরের অধিপতি, কেদার রায়ের মিত্র, পরাক্রান্ত পাঠান ভৌমিক। ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে প্রথম মোগল অভিযানে আসে শাহ্বাজ খাঁ। মোগলের সেই বিজয় বাহিনী পূর্ব বাঙলার নদ নদী, জলা-জঙ্গলের মধ্যে দিশাহারা হইয়া গেল; মীর-ই-আদল বন্দী হইল ঈশা খাঁর হস্তে। পরে মোগল নওয়ারার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আসিলেন স্বয়ং রাজা মানসিংহ—মোগল সাম্রাজ্যের অতুলনীয় বীর। নিশ্চয়ই সে বাহিনীকে ঈশা খাঁ প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না। এগার সিন্ধুর দুর্গমূলে মোগল নৌবহর অবশ্য পরাস্ত হয়। কিন্তু বিচক্ষণ ঈশা খাঁ মোগল শাহানশাহের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। রাজা মানসিংহ

তাঁহাকে সসম্মানে নিজ রাজ্যে সমাসীন রাখিয়া গেলেন,—বাদশাহ্-এর খাজনা যথা সময়ে সরকারে পৌছাইলেই হইল। কিন্তু ইহাও শেষ সন্ধি নয়। ভুঁঞাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন একেবারে নিবিল না, নিবিয়া গেল একদিন ঈশা খাঁর জীবন-দীপ মোগলের আক্রমণ ঝটিকায়।

সেদিন সোনার গাঁয়ে স্বামীর রাজ্য, স্বামীর স্বপ্ন, ভুঞার অধিকার অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জাগিয়া ছিলেন ভুঞার কন্যা, ভুঞার রাজরাণী সোনামতী—ইতিহাসের সমাধিক্ষেত্রে প্রদীপ রেখার মত সোনার গাঁয়ের জনশ্রুতিতে জ্বলিতেছে সোনাবিবির পুণ্য-কথা। উত্তর পূর্বে তাঁহার রাজ্যে হানা দিয়াছে ত্রিপুর-বাহিনী, দক্ষিণে মগ, আর ফিরিঙ্গিরা এদিকে সেদিকে লুণ্ঠনে তৎপর। খিজিরপুর, কত্রাভুপুর, কদম রসুল—সোনাবিবির কোনো দুর্গই তবু দ্বার খুলিল না। —ইতিহাস কিন্তু জানে ঈশা খাঁর বীরপুত্র কত্রাভুপুরের মুশা খাঁকে। মোগল অভিযান বাঙলার সমস্ত ভুঞাকে দিল্লীর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। মুশা খাঁ বিক্রমপুরে ও কেদার রায় শ্রীপুরে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে একত্রিত। একবারের মত শ্রীপুরও তখন আত্মরক্ষা করিল তাহার নৌ কৌশলে। মোগল ফৌজের অধিনায়ক মন্দা রায় নদী গর্ভে নিমজ্জিত হয়। তারপর বিক্রমপুরের নিকট ফতেজঙ্গপুরের যুদ্ধে মানসিংহের আক্রমণে শ্রীপুরের ভাগ্য অস্তমিত হইল। রাজা কেদার রায় আহত ও বন্দী ; মানসিংহের নিকটে পৌছিতে না পৌছিতে কেদার রায়ের জীবনান্ত হয়। ইতিহাস হইতে মুছিয়া গেল শ্রীপুরের নাম। অনেক যুদ্ধের পরে মুশা খাঁ-এর সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া গেল বাঙলার ভুঞাদের কীর্তি।

স্বাধীন সামন্ত রাজা ও স্বাধীন জমিদারের দিন ফুরাইতেছিল। মানসিংহের অভিযান ও টোডর মল্লের ভূমি-ব্যবস্থা তাহা সম্পূর্ণ করিল। সম্রাট আকবরের পরে জাহাঙ্গীর যখন দিল্লীর তখ্‌তে ইসলাম খাঁ তখন

ভূমিকা

পূর্ব বাঙলার সুবাদার, মোগল শাসন ব্যবস্থা ও মোগল রাজস্ব ব্যবস্থা তখন হইতে বাঙলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। জায়গীরের পরিবর্তে খাজনার নিয়ম প্রচলিত হইল, রাজকরের পরিমাণ ফসলে ও তন্‌খায় ধার্য হইতে লাগিল। স্বাধীন ভুঞাদের ক্ষমতার দিন শেষ হইয়াছিল, মোগল শাসনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতাপ প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ হইল শুধু নিজ নিজ জমিদারীতে। পাইক বরকন্দাজ যদি বা রহিল, ছিপ কোশা বন্দুক তোপের বড়াই করিবার মত কাহারও আর বিশেষ কিছু বেশি দিন রহিল না। ঢাকায় জাহাঙ্গীরনগরে বসিয়া তখন সেই শাসন-ক্ষমতা পরিচালনা করেন সুবাদার, কেন্দ্রে কেন্দ্রে রহিল তাঁহার অধীন ফৌজদার ও থানাদার। মাসে দুইবার করিয়া সুবাদার 'ডাক চৌকিতে' দিল্লীতে সংবাদ পেশ করেন। 'সে-বন্দী' পাইকের সাহায্যে তিনি জমিদারদের জারগীরদারদের করেন 'রবৎ' ও 'জবৎ'। জাহাঙ্গীরনগর হইতে রাজস্ব আদায় করেন দেওয়ান। মাসে একবার করিয়া তিনি দিল্লীতে ডাকে হিসাব সংবাদ পেশ করেন। 'ক্রোরী', 'তহসীলদার', 'আমিন', 'কানুনগো' প্রভৃতির সাহায্যে তিনি খাজনা আদায় করেন, আব্‌ওয়াব্‌ বন্ধ করেন, রায়ৎদের তাকাবি কর্জ দেন, আদায় ওয়াশিল চালান। অধীন কাজীদের সাহায্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইস্‌লামী কানুন মত বিচার হয়। শহরে আছে শহর কোতোয়াল, বেতন অধ্যক্ষ বক্‌সী, ইস্‌লামী ধর্ম পর্যবেক্ষক মুহ্‌তাসিব। কেন্দ্রে কেন্দ্রে সরকারী কারখানার দারোগা, ডাক চৌকির দারোগা, ওয়াকি-নবিশ, সওয়ানি-নিগার, হরকরা ইত্যাদি। মোগল শাসনের একটা জমজমাট অবস্থা। কিন্তু গ্রামে সেই সনাতন পল্লিসমাজ, জাত পঞ্চায়েত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার-শাসক।

সেই বাদশাহী শাসনের সুবিস্তৃত ছায়ায় বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ শ্রীখণ্ড ছাইয়া বৈষ্ণব-ধর্মের প্রেম ভক্তির বাণী,—সেই প্রেম, সেই জীবে দয়া,

ভূমিকা

সেই ভক্তিবাদ, সেই শাস্ত্র বিচার, সেই সদাচার, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া বহিয়া বরেন্দ্র-বঙ্গ-সমতটের উপর দিয়া শৈব বৌদ্ধ সহজিয়া-তন্ত্র বিমিশ্রিত ধর্মচেতনা ও জীবন-যাত্রার মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়া শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, মণিপুর, ত্রিপুরা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু কী সেই সামন্ত-সাম্রাজ্যের মহিমা ও আয়ু? তাহার দুয়ারে বহু পূর্বেই পড়িয়াছে পৃথিবীর নব-জাত সভ্যতার উদ্ধত করাঘাত। সপ্ত সমুদ্র মথিত করিয়া বেড়ায় পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিক, জল-দস্যু, উপনিবেশিকেরা। নব পৃথিবী আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতের সমুদ্র-পথও খুলিয়া গিয়াছে। দ্বীপবাসী ইংরেজের বণিকও বাণিজ্য-সনদ লইয়া হিন্দুস্থানের পথে জাহাজ ভাসাইয়াছে। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ যখন প্রেম-বন্যায় টলমল, ভাটপাড়া কোটালীপাড়া বিক্রমপুর যখন স্মৃতি ও ন্যায়ের বিচারেই মগ্ন, পৃথিবীর নূতন উদ্যোগ, নূতন জিজ্ঞাসা, নূতন অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞানের নূতন আলোক তখন ইউরোপের ধর্মবোধকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, কেপলার, গ্যালিলিও, বেকন প্রমুখকে লইয়া নবযুগের প্রভাত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। মোগল মহিমা ত এই তুলনায় রাত্রির অন্ধকার।

মধ্য-যুগের এই অন্ধকারে ইতিহাসের আলো তবু জ্বলে নিবে। কখনো ক্ষণেকের বিদ্যুৎ-দীপ্তি, কখনো রাত্রি-জোড়া দীপান্বিতা; কখনো সে আবার একেবারে অদৃশ্য, অন্ধকারে লুপ্তশিখা। আর, সেই অন্ধকারের আড়ালেও জীবন তাহার ইতিহাস লিখিয়া যায়; পুরাতন পটের উপর নূতন ছাঁদে, নূতন অক্ষর সাজাইয়া আপনার গতিতে লিখিয়া চলে আপনার অফুরন্ত কাহিনী। এই কাহিনীও দীপ শিখার মতই প্রতি-নিমেষে নূতন, ইতিহাসের এই মানুষ আবার চির পুরাতন।

ভূমিকা

নয়া গাঙের মোড়ে যেখানে বড় খালটা বাঁকিয়া গিয়াছে সেই বাঁকে শ্রীপুরের নওয়ারার একটা বহরের কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন—ওদিকটার জলদস্যু মগ, ফিরিঙ্গি, উদ্ধত ডাকাত ও গ্রাম্য জমিদাররা শাসনে থাকিবে। এই বহরের ভারে ছিলেন শঙ্কর চৌধুরী। আধক্রোশ দূরে অনেকটা পতিত মহল পড়িয়া আছে। খালি জমির, মাঝে মাঝে জঙ্গল, কোথাও নিচু মাঠ। এক কালে হয় ত সেখানেও জন-বসতি ছিল; সে হয় ত যখন বিক্রমপুর সেনরাজাদের রাজধানী। এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠা তখন প্রবর্ধমান—বৌদ্ধ জৈনদের তখনই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ওদিককার পূর্বাঞ্চলে হয় ত তাহারা সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনো কালে এখানে কিছু থাকিলেও এখন চিত্রিসারের এই এলাকাটায় আছে বন, মাঠ, আর নিচু জমি। আবাদ না করিলে এ অঞ্চল এমনি থাকিবে বরাবর। এই নূতন এলাকাটাই শঙ্কর চৌধুরীর জায়গীর মিলিয়াছে—বড় খালের ওপারে আছে ইলিয়াশ হাজারীর জায়গীর। এইখানেই প্রজাপত্তন করিয়া শঙ্কর চৌধুরী নূতন আবাদ স্থাপন করিবেন—তিনি বলেন, 'রাজ্য- স্থাপন' করিবেন।

প্রজা পাইক, অনুগত পরিজন সকলকে লইয়া শঙ্কর চৌধুরী করিবেন 'রাজ্য শাসন'—এই তাঁহার স্বপ্ন। যেন কালকেতুর কলিঙ্গ পত্তন।

মাঠ-জঙ্গলে মানুষের সৃষ্টিশক্তি জয়োল্লাসে আগাইয়া গেল।

নদী নিকটে নয়। জলাশয়ও নাই। শুধু একটা 'ডাঁড়া' আঁকিয়া বাঁকিয়া মাঠের মধ্য দিয়া গিয়াছে, বর্ষায় তাহার সহিত নূতন খালের যোগ থাকে, কিন্তু বৎসরের বেশি সময়ে সে ডাঁড়ায় জল থাকে না—ধূ ধূ করে মাঠ। চারি দিককার বন-জঙ্গলও আকাশের মেঘের প্রত্যাশায় যেন তাকাইয়া থাকে। আবাদ করিতে হইলে, লোকের বসতি করিতে হইলে, চাই জলাশয়। ডাঁড়াটা প্রশস্ত করিয়া নৌ-চলাচলের ব্যবস্থাও করা চাই।

নীচু জলা জমিটা পড়িয়া আছে—কে জানে, এককালে ছোট একটা দীঘিও হয়ত ছিল। এখন শুধু তাহা নিচু জলা আর কিছু নয়। শঙ্কর চৌধুরী নিজ গৃহ পত্তন করিবার সংকল্প স্থির করিয়া প্রথমেই উদ্যোগী হইলেন দীঘি খননে।

'মাটিয়াল' বড় সহজে লাভ করা যায় না। বাহিরের মজুরেরা আসে শরতের শেষে, হেমন্তের প্রারম্ভে। ছ মাসের খোরাক আর চাষের জমি মজুরের জন্য তাই বরাদ্দ। নূতন মাটিতে চারদিকের পাড় উঁচু করিয়া বাঁধাইতে হইবে, তার পর অনেকটা ভরাট করিয়া উঁচু করিতে হইবে ভাবী চৌধুরী ভিটা। মজুরেরা ছোট ছোট করিয়া ইটের পাঁজা সাজায়, পরে আগুন দিবে। শঙ্কর চৌধুরী তাঁহার বাস গৃহ গড়িয়া তুলিবেন পাকা ইটে। আশ্চর্য কথা, ইটের বাড়ি। এ অঞ্চলে পাকা বাড়ি জমিদার জায়গীরদারেরও বিশেষ নাই। সকলেই থাকে বাঁশের বেড়ার বা মাটির দেওয়ালের খড়ের ঘরে। মঠ-মন্দিরের জন্য ছাড়া কেহ ইট-পাথরের কথা ভাবে না। এক ভুঞারাই গড় ও ইটের প্রাসাদে বাস করেন। কিন্তু শঙ্কর চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষা সামান্য নয়, ইষ্টক-গৃহে বাস না করিলে রামগতি রায়ের মত কুটুম্বরা তাহাকে মানিবে কেন? তাঁহার মাথায় পরিকল্পনা পরিষ্কার। ডাঁড়াটা কাটিয়া এখন প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছেন; অন্তত ছয় মাস বড় খাল হইতে মাঝিরা নৌকা লইয়া আসিতে পারিবে তাঁহার গ্রামে। বর্ষায় চারিদিকের নিচু জমি ডুবিয়া গেলে তাহারা নৌকা বাঁধিবে তাঁহার বাড়ির ফটকে। অন্য সময়ে ডাঁড়ার দিক হইতে উঠিয়া আসিবে তাহার গৃহের বড় দরওযাজায়—মাঠের উপর দিয়া দীঘি ও মঠ-মন্দিরের সম্মুখে। দীঘির চারিদিকে নূতন মাটি দুই তিন বর্ষায় জমিয়া বসিলেই শঙ্কর চৌধুরী প্রথম নির্মাণ করিবেন চারিদিকের চার ঘাট। দীঘির পূর্বে বসিবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যর পাড়া। অন্যদিকে

দক্ষিণে মজুর মিস্ত্রি ছুতার কারিগর যাহারা কাজ করিতে আসিয়াছে তাহারা বসিবে। তৃতীয় আর একদিকে কামার, কুমার, প্রভৃতি নব শাখ। আর পশ্চিমে এই চৌধুরী বাড়ি, পূর্ব হইতে 'ফটকের' মধ্য দিয়া আসিয়া 'দরওয়াজ' ঠেকিবে উহার পূজা প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণের উত্তরে পূজা মণ্ডপ; সুন্দর কারুকার্য করা স্তম্ভের উপর রহিবে চিত্রিত ছাদ। দক্ষিণে কাছারি বাড়ি, এক পাশে অতিথি শালা, অন্য পার্শ্বে পাইক বরকন্দাজদের ঘর। মণ্ডপ ও কাছারিবাড়ির মধ্যখানে নাট মন্দির। পশ্চিম খণ্ডে চৌধুরীর খাশ দরবার। পূর্বমুখী সেই ঘরে বসিয়া সামনের ফটক দিয়া দীঘির ওপার পর্যন্ত এক পলকে চোখে পড়িবে। আর এই খাশ দরবারের পিছনে থাকিবে অন্দর মহল, অন্দরের প্রাঙ্গণ। প্রকাণ্ড বারান্দা—পরিচারিকারা কাজ কর্ম করিবে; মেয়েরা অপরাহ্নে কড়ি খেলিবেন, সন্ধ্যায় চাঁদের আলোতে বসিবেন গল্প করিতে—দেব-দৈত্যের, জিন-পরীর রাজা বাদশার, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্রের, সওদাগর বণিকের, কাঞ্চনমালার, বকুলমালার, সাত ভাই চম্পার। পশ্চাতে ফুলের ফলের বাগান। সম্মুখেও বাড়ি হইতে ফটক পর্যন্ত ফুল বাগিচা—ফিরিঙ্গিদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে নানা রঙের ফুল, ইলিয়াশ হাজারীর নিকট হইতে আনাইবেন পাতাবাহারের সার। হাঁ, যেখানে যাহা পাইবেন সেখান হইতেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিবেন। সোনার গাঁয়ের রাজ মিস্ত্রিরা আসিবে মঠ-মন্দির ও পাকা বাড়ির জন্য। ভেলুয়া বিলের 'ছইয়ালদের' আনিবেন তিনি কাছারি বাড়ির বাঁশের কাজের জন্য। প্রত্যেকটি বাঁশ জলে ডুবাইয়া রঙ তুলিতে হইবে, চাঁছিয়া তাহা মসৃণ করিতে হইবে, বাঁশের বুনটে, বাঁধনে ঘরটা যেন চমক লাগাইয়া দেয়। বাড়ির দক্ষিণের সেই নিচু জমিটার মধ্যে বর্ষার জল আসিয়া জমিবে, কুমুদ কহ্লার ফুটিবে, জল ছল ছল

করিবে, আর উহার মধ্যে শঙ্কর চৌধুরী নির্মাণ করিবেন তাঁহার সখের জলটুঙি।

শঙ্কর চৌধুরী স্বপ্নে মাতিয়া উঠেন।

বন-জঙ্গল সাফ করিতে প্রথম আসিল নমঃশূদ্র তিন ভাই। বোড়া ঝাড়ে তাহাদের জমি ছিল, ঘর দুয়ারও ছিল। তাহাতে অবশ্য তিন ভাইএর কুলাইত না। তবু তাহারা সেখানেই থাকিত। কিন্তু থাকিবার উপায় নাই। জমিদারদের ক্ষেতে খাটিয়া পেটে ভাত জুটে না, তার পরে বেগার খাটাইবে আবার আমলা-গোমস্তরা সকলে। জমিতে ইস্তফা দিয়া তাহারা আসিয়াছে চৌধুরীর আশ্রয়ে। আর তাহাদের সঙ্গে আসিতেছে জমির আশায় সেখানকার আরও পাঁচ-সাত ঘর চাষী কৈবর্ত। জমিদার গোমস্তার জ্বালায় তাহারাও জমি পাইলে গ্রাম ছাড়িতে চায়। বন-জঙ্গল সাফ করিয়া তাহারাও ঘর বাঁধিবে, গ্রাম পত্তন করিবে। মাঠের আগাছা সাফ করিয়া তাহারা লাঙ্গল দিবে—শস্যে ভরিয়া উঠিবে নূতন আবাদ। আসিয়া যেন দেখে তখন বোড়াঝাড়ের গোমস্তা-পাইক এই কৈবর্ত দাসদের।

শঙ্কর চৌধুরী অভয় দিয়া বলেন: আসিবে? আমার নাম শুনিলেই ভয়ে কাঁপিবে।

স্বাস্থ্যবান্ পরিশ্রমী মানুষ। জঙ্গল সাফ হয়, গাছ কাটা চলে, ক্ষেত আবাদ হয়, লাঙল পড়ে। মিস্ত্রী আসে দুই ভাই কাঁঠালিয়া হইতে। কাঠ চিড়িবে, করাতীর কাজ করিবে, ঘর তৈয়ারী করিবে তার পরে। নূতন গাঁয়ে জমি পাইলে তাহারা এই খানেই ঘর বাঁধিবে। ওখানে ত কয়েক ঘর মিস্ত্রীই তাহারা আছে। নূতন গাঁয়ে না গেলে ওখানে তাহাদের আর কুলাইবে না। পুরাতন কাঁঠালিয়া গ্রাম হইতে তাহাদের পরে আসে জমির আশায় দুই ঘর মালি, এক ঘর ভুঁইমালি, দুই ঘর

ধোপা, একঘর নাপিত। নজরানা নাই, সস্তা জমি, লাখেরাজ ও মিলিবে।

শঙ্কর চৌধুরী তাঁহার তাঁবের পাইক-পিয়াদা, মাঝি-মাল্লা ইহাদের, চাহেন, তাহাদের লাখেরাজ দিতে হইবে। সওয়ার ও বন্দুকচিয়া কেহ তবু আসিতে চাহে না। তাহাদের সর্বত্রই চাহিদা। হারুণ ঢালী আসিল তাহার দলের লোকদের লইয়া। একটা নূতন পাড়া পত্তন করিল ঢালীরা। কালো কুচ্‌কুচে চেহারা দুই ঘর জোয়ান আসিল—গৌড়ের হাব্‌সি সিপাহীদের নাকি তাহারা বংশধর। তাহাদের পরে আসিল মাল্লা, মাঝি কয়েক ঘর। শঙ্কর চৌধুরীর পুরাতন সঙ্গী তাহারা জঙ্গে লড়াইতে। একসঙ্গে খেলিয়াছেও অনেকে শৈশবে-যৌবনে।

পাইক, পিয়াদারা যত বেশি আসে ততই শঙ্কর চৌধুরী উৎফুল্ল হন, তাঁহার শক্তি সুদৃঢ় হইতেছে। চাষ হইবে, আবাদ হইবে, কিন্তু লাঠি সড়কির জোর না থাকিলে তাহা ত পার্শ্ববর্তী ডাকাত জমিদারেরা লুঠিয়া খাইবে।

বাসু কামারকে যেদিন চিত্রিসারে শঙ্কর চৌধুরী আনয়ন করিতে পারিলেন সেদিন তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। মেঘনা পার হইতে বছর সাতেক পূর্বে বাসু কামারকে ফিরিঙ্গি দস্যুরা জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। আর তাহার খবর ছিল না। সন্দ্বীপের যুদ্ধে গিয়া বাসুকে আবার দেখিতে পাইলেন শঙ্কর চৌধুরী। ফিরিঙ্গি কামারের কাছে সে ফিরিঙ্গিদের বন্দুক হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। আশ্চর্য তাহার হাত। ফিরিঙ্গিরা তাহাকে দাস হিসাবে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল, কিন্তু তাহার কারিগরী দেখিয়া তাহাকে হাত-ছাড়া করিতে চাহিল না। সেই বাসুকে অনেক কহিয়া শঙ্কর চৌধুরী উদ্ধার করিয়া আনেন। কিন্তু বাসু নিজের গাঁয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিপদে পড়িল।

'ফিরিঙ্গি বাসুকে' ঘরে নিতে চাহিল না তাহার জাতের লোক। রাজাদের হুকুমে শেষ পর্যন্ত গ্রামে সে জায়গা পাইল, কিন্তু সকলে তাহাকে মনে করে সমাজ বহির্ভূত। এখন যখন সুবিধা জুটিল তখন বাসু তাহার স্ত্রীপুত্র লইয়া চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অবশ্য বড় ছেলে ও তাহার বউ ব্যাটা আসিবে না। তাহারা ওগাঁয়েই রহিল। কিন্তু বাসু চিত্রিসারেই বসতি করিবে। হাঁ, বন্দুক সে তৈয়ারী করিবে, তবে লোহা চাই, ইস্পাত চাই। সেনার গাঁয়ের কামারেরা কামান ঢালাই করে। চৌধুরী যদি ইস্পাত জোগাড় করেন, চুল্লীর ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বাসু কর্মকারও চিত্রিসারে ঢালাই করিতে পারিবে দস্তি। কিন্তু সেই জিনিসপত্র কোথায়? ততক্ষণ বাসু ও তাহার ছেলেরা তৈয়ারী করিবে লাঙলের ফাল, কোদাল, কুড়াল, দা, বঁটি আর খড়্গ।

কেহ বংশ বৃদ্ধির ফলে পুরাতন গ্রাম ছাড়িয়া নূতন গ্রামে আসিতেছে; কেহ জমিদার, গোমস্তা মহাজনের পীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া চৌধুরীর আশ্বাসে নূতন গ্রামে বাস করিতে চাহিতেছে; কেহ দুর্বল জমিদারের এলাকায় দস্যু পীড়িত হইয়া আশ্রয় খুঁজিতেছে শঙ্কর চৌধুরীর সবল বাহুর। শঙ্কর চৌধুরী উদার হস্তে সামান্য জমায় জমি দান করেন, লাখেরাজ দিতেও কার্পণ্য নাই। কুম্ভকারেরা আসিল দুই ঘর। সূত্রধরেরা তিন ঘর আসিল। গোয়ালারা আসিল—দুগ্ধ ঘৃত জোগাইবে তাহারা পুরুষানুক্রমে চৌধুরীদের। তাঁতীরা আসিল—জোলারা পূর্ব হইতেই ছিল তাহার মহালে কালচিতার টঙ্গে, যোগীরা জোগাইবে ধুতি, উত্তরীয়, চেলির জোড়। বারুজীবি, মালাকার, তিলী তাম্বলী হইতে পাটিয়াল, জালিক, আলি, ঋষি, ডলী, নানা বৃত্তিজীবীরা আসিল। গন্ধবণিক, তিলী, সাধু, বন্দরের কংসকার ও শংখকাররা কেহ এখনো আসিতেছে না,—নদী নাই, হাট নাই। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরাও বিশেষ উৎসাহ পায় না—

নূতন দীঘি খনন শেষ হইলে, জলাভাব দূর হইলে, আবাদ আরম্ভ হইলে, তাঁহাদের এগ্রামে বসবাসের ইচ্ছা।

এমনি সময়ে—দীর্ঘিকা খনন যখন বারো আনা প্রায় সমাপ্ত—মৃত্তিকা গর্ভ হইতে উঠিল দেবী মূর্তি—অষ্টভূজা ভদ্রকালী, সিংহবাহিনী! শুধু কি উঠিল? সেদিন বুঝি মঙ্গলবার, সর্বসিদ্ধি দ্বাদশী—আর তাহার ঠিক পূর্ব রাত্রেই চৌধুরীর বৃদ্ধা মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছেন—সিংহবাহিনী; শঙ্করের পূজা চাহেন দেবী। একদিনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। ছোট বড়, উচ্চ নীচ দীঘির দিকে ছুটিয়া আসিল। চিত্রিসারে যে পুণ্য ক্ষেত্র তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ ভট্ট গোবিন্দ স্বয়ং এবার ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন—চিত্রিসারে দেবী প্রকাশিত হইয়াছেন। ভট্ট গোবিন্দের পুত্র মুকুন্দ আসিয়া তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিবেন। শ্রীখণ্ডের বনমালী বিদ্যাভূষণ তাঁহার শ্যালক,' তিনিও শ্রীহট্টের পথে কিছুদিনের জন্য আসিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি বৃন্দাবনেই যাইবেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র পরিবার এখানেই অবস্থান করিতে থাকিবে: চতুষ্পাঠী না হইলে গ্রাম চলিবে কেন? এই বিক্রমপুর সমাজ, পণ্ডিতের সমাজ। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বহুকালের প্রাধান্য এখানে; বৈদ্য ও কায়স্থদেরও বহুদিনের প্রভাব।

ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা এবার আসিতে উদ্‌গ্রীব হইলেন নূতন গ্রামে। মেঘনার পারে আজ বড় অনিশ্চিত তাঁহাদের জীবন-যাত্রা। সুন্দরী কন্যা বধূ লইয়া কেহ কি মেঘনার-পাড়ে বাস করিতে পারে? সর্বত্র মগেরা এখন লুঠপাট করিয়া ফিরিতেছে। কাহাকে কখন অপহরণ করে ঠিক নাই। উচ্চবর্ণের কাহাকেও তাহারা একবার ছুঁইলেই সেই বংশের সর্বনাশ। 'মগী বামুন', 'মগী কায়েৎকে' আর কেহ সমাজে গ্রহণ করিবে না। চিত্রিসার মেঘনার নিকটে নয়। স্বয়ং সিংহবাহিনী সেই গ্রামের

রক্ষয়িত্রীরূপে প্রকাশিতা হইলেন। তাহা ছাড়া, শঙ্কর চৌধুরীর নিজের তাঁবেই আছে রাজার বহর। গ্রামেও তাঁহার পাইক, পিয়াদা তিনি বসাইতেছেন। নিরাপদ এই আশ্রয়।

মেঘনার পার হইতে, নয়া গাঙের তীর হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ দুই চারি ঘর এবার আসিয়া চিত্রিসারে বসতি স্থাপন করিলেন। শঙ্কর চৌধুরী তাঁহাদের সসম্মানে আহ্বান করিয়া আনেন; ভূমিপত্র লিখিয়া দেন। কায়স্থরা আসিতেছে, ফার্সি নবিশ মুন্সিও দুই একজন তাহার চাই। আর ব্রাহ্মণরা যখন আসিতেছেন শাস্ত্র চর্চ্চাও হইবে। বৈদ্যরাও তাঁহার জায়গীরে বসবাস করিতে আসিলেন; মধ্যমগ্রাম হইতে সেনেরা দুই ঘর কালচিতায় আসিলেন। ওই ধূ ধূ মাঠটা ছাড়াইলেই কালচিতা —চৌধুরীরই এলাকা। বহুদিনের একটা শ্মশান নাকি ছিল এইদিকে। মাটি খুঁড়িলে এখনো মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। বড় টিবিটার তলায় আছে কোন্ পীরের বস্তান, হয়ত বা ভাঙিয়া পড়া কোন্ চৈত্য বা স্তূপ। সে জায়গায় এক ফকির থাকিত বটে, এখনো আছে কয়েকঘর জোলা।

দীঘি, বাড়ি, দেবী মন্দির: শঙ্কর চৌধুরীর স্বপ্ন প্রায় সফল।

কল্পনা জনশ্রুতির লঘু পক্ষের উপর ভর দিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়ায়।

শঙ্কর চৌধুরীর ভৌমিকত্বের স্বপ্ন তখন প্রায় সম্পূর্ণ। মন্দিরে সিংহ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া এখন দীঘি উৎসর্গ করিলেই হয়।

মন্দির প্রতিষ্ঠায় ঘটা করিতে হইবে। গ্রামের প্রত্যেক জাতের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ আশীর্বাণী ও পূজার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সেইদিন হইতে হইবেন সিংহবাহিনীর সন্তান, শঙ্করী চৌধুরীর প্রজা, প্রত্যেকের আত্মীয় প্রত্যেকে। পণ্ডিত বিদায় হইবে, ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, দশ গ্রামের জাত-পঞ্চায়েৎরা উপস্থিত থাকিয়া অনুমোদন করিবেন শঙ্কর চৌধুরীর

দৈবী প্রতিষ্ঠা, গ্রাম-স্থাপনা। রামশরণ রায়ের বংশও স্বীকার করিবে শঙ্কর চৌধুরীর সম্মান-গৌরব।

কুলগুরু সদাশিব ঠাকুর রাঢ় হইতে আসিতেছেন। শিষ্যের সমস্ত ক্রিয়া তাঁহারই উপস্থিতিতে সুসম্পূর্ণ হইবে।

শঙ্কর চৌধুরী স্থির করিয়াছেন অষ্টম বর্ষীয় একটি বালককে বলি দিয়া প্রথম এই দীর্ঘিকা দান সম্পূর্ণ করিবেন, আর সিংহবাহিনীর প্রতিষ্ঠা হইবে জোড়া নরবলি দিয়া। রামশরণ রায়েরা একটির বেশি নরবলি দেয় না—শঙ্কর চৌধুরী বলি দিবেন তিনটি। শঙ্কর চৌধুরীর পাইকেরা গিয়াছে দক্ষিণে; মগ-ফিরিঙ্গিদের সহিত ব্যবস্থা করিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছে অষ্টম বৎসরের বালক, আর দক্ষিণ দেশীয় দুই জন পুরুষকে। নৌ-ঘাটায় কোশায় তাহারা বদ্ধ আছে।

বনমালী বিদ্যাভূষণ শ্রীহট্ট লাড্ডুয়া হইতে ফিরিয়াছেন। শুনিয়াই তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। শঙ্কর চৌধুরীকে বলিয়া লাভ নাই। সে শাস্ত্র বুঝে না। বঙ্গদেশীয় ভুঞা জমিদারদের নিয়ম—নরবলিতে দেবীর তুষ্টি করিতে হয়। ইহাই সে-ও বুঝে।

বনমালী বিদ্যাভূষণ শঙ্করের মায়ের শরণাপন্ন হইলেন।

—এই নরহত্যা আপনি থাকিতে ঘটিতে দিবেন না।

—রাজ্য প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠায় রাজাদের ইহাই ত নিয়ম।
—বৃদ্ধা বলিতে গেলেন।

—কিন্তু সে রাজা কে? কোনো কালে নরবলি দিয়াছেন আপনাদের ভারদ্বাজ বলভদ্র বংশীয়রা কেহ? ইহা বাঙাল দেশীয় আসুরিক আচার। সদাচারী শাক্ত ব্রাহ্মণের কুলক্রিয়া নয়; কলিযুগে চণ্ডালের আচার।

বৃদ্ধা চমকিতা হইলেন, সত্যই তাঁহাদের কুলাচার ইহা নয়। তথাপি তিনি বলিলেন: কিন্তু মায়ের বলি চাই।

—মায়ের বলি চাই সন্তানকে? আপনি মা হইয়া ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন? মা হইয়া তাহা হইলে কেমন করিয়া আপনি সহিবেন অন্ত মায়ের এই ঘোরতর সর্বনাশ? তাহারা অভিশাপ দিবে না আপনাকে? অভিশাপ দিবে না আপনার পুত্র ও তাহার বংশধরদিগকে? তাহাদের আর্তনাদ কি জগজ্জননীর কানে পৌঁছিবে না?

এবার মাতার প্রাণ আলোড়িত হইল। তাঁহার মনে পড়িল সুরভি পাগলিনীর ক্রন্দন। মেঘনার তীরে ছিল সুরভিদের বাড়ি। এক রাত্রে মগেরা তাহাদের গ্রামে পড়িল। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে নৌকা করিয়া সুরভিও ভয়ে পলাইল জঙ্গলের মধ্যে। তাহার বৎসর দশেকের ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—মাগো, আমাকে ফেলিয়া যাইও না, ফেলিয়া যাইও না। কিন্তু গ্রামের পুরুষরা তাহাকে নৌকায় গ্রহণ করিতে দিল না। দিবালোকে পরদিবস গ্রামে ফিরিয়া সুরভি দেখিল গ্রামের সর্বস্ব লুণ্ঠিত, অনেককে মগেরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার ছেলেও নাই। সুরভি আর তারপর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না। সেই অবধি নদীর পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, ডাকিয়া ফিরে, —বাপরে! আয়, আয়। আমি আসিয়াছি তুই কোথায়?—সুরভি মাঝে-মাঝে এখনো আসে 'ব্রাহ্মণ-মায়ের' নিকটে, হয় ত দুই মুঠা খায়—যত্ন করিয়া তাহাকে বৃদ্ধা বসিয়া খাওয়ান। কিন্তু খাইতে খাইতে হঠাৎ সুরভি শঙ্করের মাতাকে জিজ্ঞাসা করে—শঙ্কর কি তাহার ছেলেকে দেখিয়াছে সন্দীপের দিকে, মগেদের যুদ্ধে? অমনি ভাত ফেলিয়া, আহার্য ফেলিয়া হঠাৎ ছুটিত দূর গাঙের দিকে, "বাপরে আয়, আয়।"

বাসু কামারকে চৌধুরী উদ্ধার করিয়া আনিল মগদের হাত হইতে। সে কি সুরভি গোয়ালিনীর ছেলে কানাইকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে

না? সে যে তাহার মায়ের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে।—জিজ্ঞাসা করিতেন শঙ্করের মাতা।

শঙ্কর চৌধুরী শুনিয়া হাসিতেন—দুঃখের হাসি। মগ্‌রা কোন্ দেশে কাহাকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে তাহার ঠিক আছে?—কত মায়ের, কত নারীর, কত অভিসম্পাত উহাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে। তাই আজ উহাদের এমন পতন। নারীর লাঞ্ছনা, মায়ের অভিসম্পাত লাগেই লাগে—ইন্দ্র-চন্দ্রও তাহার হাত হইতে নিস্তার পায় না। মানুষ কোন্ ছার।

মনে পড়িতে বৃদ্ধা চমকিয়া উঠেন—'মায়ের অভিসম্পাত লাগেই লাগে',—তাঁহার শঙ্করই ত এই কথা বলিয়াছে তাঁহাকে। তাহা হইলে কেন সে নৌকার পাটাতনের তলে হাত-পা বাঁধা পরের মায়ের বাছাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে বলির জন্য? তাঁহাদের মায়ের অভিসম্পাত কি লাগিবে না? কাহাকে লাগিবে তাহা, কাহাকে লাগিবে?···

শিহরিয়া উঠিলেন বৃদ্ধা। শঙ্কর চৌধুরীর ডাক পড়িল মায়ের সকাশে। মায়ের কণ্ঠে যেন কথা বাধিয়া যায়: কোথা হইতে এই পরের মায়ের বাছাদের ধরিয়া আনিয়াছ?

—ধরিয়া আনি নাই, মগেদের নিকট হইতে কিনিয়া আনিয়াছি। দক্ষিণ চন্দ্রদ্বীপের মানুষ বোধ হয় ইহারা।

—কি? অর্থবলে কিনিয়া আনিয়াছ? উহাদের মায়ের বাপের কথা ভাবিয়াছ কি?—তাহারা কি অভিসম্পাত দিবে না?

শঙ্কর চৌধুরী বলিতে চাহিলেন: মায়ের নামে যে বলি যাইবে ইহা ত এই হতভাগ্যদের পুণ্যফল। না হইলে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গির গোলাম বান্দা হইয়া এ জীবনেও নষ্ট হইত, পরকালেও দুঃখ পাইত।

কিন্তু মাতা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন: না, না। কিছুতেই

না, কিছুতেই তাহা হইবে না। টাকার জোরে মানুষ বলি দিয়া তুমি সিংহবাহিনীকে তৃপ্ত করিতে চাও? কিছুতেই তাহা হইবে না, আমি ইহা হইতে দিব না। মায়ের অভিসম্পাত হইতে দেবতারা রক্ষা পান না, আর তুমি রক্ষা পাইবে তোমার অর্থের বলে, জায়গীরের জোরে?

শঙ্কর চৌধুরী এই মূর্তিকে চিনিতেন। এই দৃঢ়স্বর, এই সতেজ ভঙ্গিমা তাঁহার মায়ের মধ্যে না থাকিলে তিনিও ত চতুষ্পাঠীতেই ব্যাকরণ অলঙ্কার পাঠ করিয়া জীবন কাটাইতেন—ভট্ট গোবিন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে শঙ্কর চৌধুরী হইয়া উঠিতে পারিতেন না, রামগতি রায়ের স্ত্রীর দর্পকে খর্ব করিয়া সেই রায় বংশে বিবাহ করিতেন না। তিনি বুঝিলেন মায়ের সংকল্প প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হইবে।

বৃদ্ধা জননী সিংহবাহিনীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন: তুমি জগন্মাতা। জানি, কোনো সন্তানের অমঙ্গল তুমি সহিবে না। আমি রাজ্য চাহি না, বিত্ত চাহি না; তাহা তুমিই দিয়াছ, তুমিই গ্রহণ করিও। কিন্তু আমার শঙ্করকে, আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে—তুমি রক্ষা করিতে শিখাইও, জগন্মাতা।

সংকট ঘনাইয়া উঠিল। শঙ্কর গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পদ-বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: গুরুদেব, সিংহবাহিনী কি বলি চাহেন না?

—জগন্মাতা সন্তানের রক্ত চাহেন না। তিনি চাহেন ভক্তি, ত্যাগ।

—চিরদিন শাক্ত ভৌমিক-রাজারা নরবলি দ্বারাই জননীর পূজা করেন।

—জোর করিয়া যদি জীব-বলি দিতে হয়, তবে তাহা বলি নয়—জীব-হিংসা।

মাত্র এক শতাব্দি, কিন্তু উহারাই মধ্যে আসলে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্যন্ত

প্রেমধর্ম আপনার প্রভাব শাক্তভন্ত্রের রাজ্যেও বিস্তার করিয়াছে। তাই রাঢ়ীয় শাক্তগুরু সদাশিব ঠাকুর শঙ্করকেও বলিলেন: নরবলি যদি দিতে হয় জিজ্ঞাসা করো কাহাকেও কে স্বেচ্ছায় বলি যাইতে চাহে; তাহাকেই বলি দিতে পার।

—স্বেচ্ছায় বলি যাইতে চাহে?—শঙ্কর বিমূঢ়, হতবাক্ হইয়া থাকেন।

কিন্তু ইহাই গুরুদেবের বিচার। শঙ্কর চৌধুরী তখন উন্মাদের মত এদিকে সেদিকে ছুটিতে থাকেন। 'স্বেচ্ছায় কে বলি দিবে নিজেকে—স্বেচ্ছায় কে বলি দিবে?—না, না, অর্থ বিনিময়ে নয়, ভূমি বিনিময়ে নয়। —লোভে নয়, ভয়ে নয়, সজ্ঞানে, ভক্তিবশে,—কে বলি দিবে নিজেকে দেবতার কাছে—সিংহবাহিনীর সম্মুখে?

কাহাকেও পাওয়া যায় না।

আবার গুরুদেবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে শঙ্কর: গুরুদেব, উপায় করুন্। উপায় করুন্। আমি সর্ব্বস্ব দিব—পণ করিতেছি।

সদাশিব স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন: তাহা হইলে ত উপায় তুমিই করিতে পারিয়াছ। এই ভূমি—এই জায়গীর—তোমার এই দর্প, এই অহঙ্কার,—ইহাই তুমি বলি দান করো সিংহবাহিনীর নিকটে।

শঙ্কর চৌধুরী স্তম্ভিত হইলেন। মনে হইল জীবনের সমস্ত স্বপ্ন বুঝি এক মুহূর্তে মিলাইয়া যাইতেছে। পদতলের পৃথিবী বুঝি একটি নিঃশ্বাসে বৃক্ষলতা-পত্রহীন শূন্যতায় পরিণত। অব্যক্তস্বর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল: —এই ভূমি, এই জায়গীর?

—সর্ব্বস্ব বলিলে যে। অসম্ভব মনে হইতেছে? পারিবে না?

সদাশিবের মুখে হাসি ফুটিল। বিদ্রূপের নয়, করুণার ও নয়, বরং স্নেহমাখা অনুযোগের।

'পারিবে না?' সে শঙ্কর চোধুরী পারিবে না—এমন কি সুকঠিন কাজ আছে পৃথিবীতে? অন্তরের গভীরতম প্রদেশের অহঙ্কারই আবার এই সাফল্যের চরমক্ষণে মাথা তুলিয়া উঠিল—সে জয়ী হইবে, জয়ী হইবে, জয়ী হইবে। সকল বাধার উপরে সে হইবে—জয়ী, জয়ী, জয়ী!

শঙ্কর চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেনঃ পারিব। আপনার আশীর্বাদে তাহাই হইবে।

দশ গ্রামের মানুষ সবিস্ময়ে শুনিল—সমস্ত জায়গীর, সমস্ত সম্পত্তি সিংহবাহিনীর নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন চিত্রিসারের শঙ্কর চৌধুরী সস্ত্রীক। সে দেব-সম্পত্তির ভার লইবেন কে? গুরু সদাশিব ঠাকুর তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সিংহবাহিনীরই হইবে সমস্ত জমিদারী। শঙ্কব চৌধুরী চিত্রিসারে জমিজমা-মাত্র ভোগ করিবেন সিংহবাহিনীর সেবক-রূপে। আপনার বলিতে থাকিবে তাঁহার শুধু এই দীঘি—'শঙ্কর দীঘি'।

সত্যে ও কাহিনীতে মিশিয়া যাহাই গড়িয়া উঠুক, প্রত্যক্ষ সত্য এই যে, এই মাঠ, জলাভূমি, বন-জঙ্গলের মধ্যে সেই জলাশয়কে আশ্রয় করিয়াই চিত্রিসারের পত্তন, তাহারই জলে জীবনযাত্রা এই গ্রামে গড়িয়া উঠিয়াছিল;—সিংহবাহিনী এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শঙ্কর দীঘি এই গ্রামের প্রাণ। প্রমাণ নাই যে, শঙ্কর চৌধুরী কোথাও জায়গীরী লাভ করিয়াছিলেন। মোগল রাজ্যের বিক্রমপুর শ্রীপুর পরগণার জরিপ ও নূতন ব্যবস্থায় কোথাও তাঁহার উল্লেখও নাই। আছে এক ভদ্রকালী শর্মার নাম; আছে তাহার পার্শ্বে চন্দ্রচূড় চৌধুরীর ক্ষুদ্র জমিদারীর কথা—তুমার-ই-জমায় উহার হিসাব রহিয়াছে, জাহাঙ্গীর নগরের দেওয়ানিতে উহার খাজনা পৌছিয়াছে—আমিন কানুনগো হিসাব করিয়া সে জমিদারীর চৌহদ্দি নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। চিত্রিসার গ্রাম লইয়া উত্তরের নিচু

মাঠ ও জলাটা শুদ্ধ, কালচিতা ও পীরের ঢিবি ও নওডাঁড়ার দুই দিককার গোচারণের ভূমি শুদ্ধ সেই এলেকা বড় খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার বার্ষিক খাজনা মবলগ প্রাপ্য ৭৩ তন্‌খা। বড় খালের খেয়াঘাটের মাশুলও চৌধুরীরা আদায়করে, তাহার বাবদ প্রাপ্য 'চৌকি' জোগায় ৩ তন্‌খা। নয়া গাঙের নৌকাযাত্রীর মাশুল আদায়ের কোনো কথা নাই, উহা পাৎশাহী সরকারের খালসা,—খালসা আমিনরা তাহা দেখিবে। মুছিয়া গিয়াছে আর সব কথা - জায়গীর এনাম, শ্রীপুরের রাজা রাজ্য, তাহার যুদ্ধ বিগ্রহ, শঙ্কর চৌধুরীর নাম, বারভুঞার সামন্ত প্রয়াস, স্বাতন্ত্র্য ঐতিহ্য। আসল কথা, তখন মোগল সাম্রাজ্যের ভুজবল সামন্ত সাম্রাজ্যকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া কেন্দ্রিত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু সে সাম্রাজ্যের কি চিহ্ন আঁকা আছে চিত্রিসারের পল্লি-নিবদ্ধ জীবন-যাত্রায় ? সেখানে তাই 'শঙ্কর দীঘিই' সত্য। এবং চৌধুরীদের নিকট সত্য—শঙ্কর চৌধুরীর কথা।

২

দেবীর আসন

বংশ-পীঠিকার নামগুলি যথানিয়মে অনুসরণ করা যায়ঃ—চন্দ্রচূড় চৌধুরী ও চন্দ্রশেখর চৌধুরী এবং দুই কন্যা। তৃতীয় পর্যায়ে তাহাদের সাত পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র, হরচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, বীরচন্দ্র, ধীরচন্দ্র, সুরচন্দ্র ; কিন্তু কন্যাদের আর উল্লেখ নাই। তারপর হঠাৎ চিত্রিসারের চৌধুরী গৃহে শুধুমাত্র শিবচন্দ্রের সন্তানেরা তিনজন—অপরাপর শাখা অন্যত্র ছড়াইয়া গিয়াছে, শ্রীনগর, সোণার গাঁ, ভূষণা, বাকলা পর্যন্ত। তারপর মহানন্দ, উমানন্দ, ভবানন্দ। পঞ্চম পর্যায়ে চিত্রিসারে শুধু উমানন্দের সন্তান—

সুরথ ও ভৈরব। একবারের মত জানা যায় নয়াগাঙের মোড়েও সুরথ চৌধুরী তখন গায়ের জোরে চৌকি আদায় করেন। আসলে দুই পুরুষ যাবৎ যাহা তাঁহারা করেন তাহা ডাকাতি। কিন্তু সেই পর্বের অবসান ঘটিল সুরথ চৌধুরীরই সঙ্গে। 'ডাকাতের কালীতলা' হইল 'দেবীর কালীতলা'।

মানিক সর্দার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সুরথ চৌধুরী দলবল পাঠাইয়া দিলেন নয়াগাঙের বাঁকে। অপরাহ্নে নিজেও ঘোড়ার পিঠে রওনা হইলেন। নদী নিকটবর্তী হওয়ায় এখন এই সব মাঠঘাট বর্ষায় প্লাবিত হয়; তাই নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে।

বহু সাহসে ভর করিয়া গৃহিণী অনুনয়-বিনয় করিলেন: আজ আর বাহির হইয়ো না। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করিবার মত মানুষ চৌধুরীরা নহেন। সে স্ত্রী, গৃহকর্ত্রী,—গৃহ-সংসার দেখিবে, দাস-দাসী শাসন করিবে, পুরুষের কথায় তাহারা আসিবে কেন? সত্য বটে, গৃহিণীর দুইটি পুত্রই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; লোকে বলে সুরথ চৌধুরীর পাপে। কিন্তু সুরথ চৌধুরী এই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ চোখের জল-ফেলা দেখিতে চাহেন না। গৃহিণী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। হেমন্তের সন্ধ্যার অন্ধকারে নিত্যকারের মত সিংহবাহিনীর নিকটে চলিলেন আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে, আপনার বেদনা নিবেদন করিতে, জিজ্ঞাসা করিতে,—কেন তুমি জননী হইয়া আমার বুকের সন্তানকে কাড়িয়া লও? তাহারা কি পাপ করিল?

মন্দির হইতে বাহির হইতেই এক বিদেশীয় ব্রাহ্মণ চৌধুরী ঠাকুরাণীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তিনি আশ্রয়প্রার্থী; সঙ্গে তাহার নবম বর্ষীয় বালক পুত্র। তাঁহারা নবদ্বীপে চলিয়াছিলেন মেঘনার

পূর্বতট হইতে, নবদ্বীপে এই পুত্র অধ্যয়ন করিবে। পথে নৌকাডুবি হওয়ায় এখন পদব্রজে চলিয়াছেন। কেহ যদি ব্রাহ্মণ সন্তানের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেয় সেই আশায় এইগ্রামে আসিয়াছেন। কত যাত্রী নৌকা শহরে যায়; ব্যবসায়ীদের নৌকা ও নয়া গাঙ বড় খাল ধরিয়া যায়,—ধলেশ্বরী, ইছামতীর পথে কাশীমবাজারে, মুর্শিদাবাদে, মালদহে, পাটনায়। উহাদের কাহারও সহিত একটা ব্যবস্থা হইবে না? ততক্ষণ এই রাত্রির মত—ব্রাহ্মণ আশ্রয় চাহেন ব্রাহ্মণ জমিদার চৌধুরীদের।

চৌধুরীদের অতিথিশালা তখন নামেই আছে। তাহাতে ভাঙা আসবাবপত্র পড়িয়া থাকিত, তাহাই আছে। চালা নাই, বেড়া নাই, কিছুই নাই। সিংহবাহিনীর মন্দিরও ভাঙিয়া পড়েতেছিল, সুরথ চৌধুরীর শীঘ্রই তাহার সংস্কার করাইবার কথা। তাই দেবীর মন্দিরের বারান্দায় প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পিতাপুত্রে এই রাত্রি কাটাইবেন। চিন্তিত, শঙ্কিত অন্তরে ব্যবস্থা করিয়া গৃহিণী অন্তঃপুরে ফিরিলেন। কেমন আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল—হেমন্ত সন্ধ্যায় নৌকাডুবি কি সত্য ঘটনা?

শেষ রাত্রিতে সুরথ চৌধুরী ফিরিয়া আসিলেন। রুদ্র বেশ, রুক্ষ কেশ, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, গম্ভীর মূর্তি। গৃহিণী কথা বলিতেও সাহস করেন না। বুঝিলেন, শিকারী পশুর হাত হইতে মৃগ কোনোরূপে পলায়ন করিয়াছে। —তিলী মহাজনের নৌকায় কানাকড়িও পাওয়া যায় নাই। পূর্বেই এই অঞ্চলেস্থ উপদ্রবের কথা শুনিয়া মহাজন আপনার গুরুদেবের নিকটে সোনা-রূপা টাকা-কড়ি তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে কোন গ্রামে নামাইয়া দিয়াছিল;—মাঝিদের এই কথা মিথ্যা নয়, বুঝা গেল। নৌকাটা ডুবাইয়া দিয়া, সুপারি ও মরিচ লুটিয়া লইয়া সুরথ চৌধুরীর ক্ষোভ যেন তাই দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি মানিকের ঠ্যাঙানিতে

মহাজন যে সত্যই মরিয়া যাইবে, তাহা মনে হয় নাই। কিন্তু স্বরথ বলেন, মরার উপযুক্তই সে বজ্জাত লোকটা! কেমন করিয়া স্বরথ চৌধুরীকে ফাঁকি দিবার জন্য পূর্বেই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। ইহা কি দুর্বুদ্ধি? না, নিতান্তই ব্যবসায়ীর ঘৃণিত অর্থমমতা? অর্থের প্রতি কী কদর্য মায়া এই ব্যবসায়ীদের—প্রাণের মমতাও নাই! স্বরথ চৌধুরী এমন লোকের মৃত্যুতে নিজের কিছুমাত্র অপরাধ দেখেন না। বরং তাঁহার অন্তর জ্বলিতেছে' লোকটার প্রতারণায়—এত করিয়াও কিছুই লাভ হইল না এই যাত্রা স্বরথ চৌধুরীর!

প্রভাত না হইতেই গৃহিণী মন্দিরে দেবতাকে প্রণাম করিতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণও করজোড়ে দাঁড়ইয়া আছে। আরত্রিক শেষ হইতেই গৃহিণী তাহাকে সন্ত্রস্ত কঠিন কণ্ঠে জানাইলেন: আপনি সপুত্রক এই মুহূর্তে এই অঞ্চল পরিত্যাগ করুন। সন্ধ্যার পূর্বে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করুন—অন্তত ইলসাজারির হাজারীদের এলাকায় যান। রাত্রিতে যেন কিছুতেই এই অঞ্চলে পথে ঘাটে থাকিবেন না। নানা ভয়।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই স্বরথ চৌধুরীও জানিতে পারিলেন তাঁহার কবল-চ্যুত শিকার তাঁহার এই মন্দিরে—এই সিংহ-গহ্বরেই—কাল রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আজ প্রত্যূষে আবার পদব্রজে রওনা হইয়া গিয়াছে।

লোকজন ছুটিল। নদীকূলে, বড় খালের ঘাটে তাঁহার অনুচরেরাই ব্রাহ্মণকে যাত্রীরূপে নিজেদের নৌকায় তুলিয়া লইবে। তারপর সন্ধ্যায় তিনি স্বয়ং ব্যবস্থা করিবেন সেই দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণের।

গৃহিণী পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন: আর পাপের ভার বাড়াইয়া তুলিয়ো না। সিংহবাহিনীই ব্রাহ্মণ ও তাহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তিনিই তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনিই আশ্রয় দিয়াছেন।

সুরথ চৌধুরী ক্রুর ভাবে হাসিলেন। তাঁহাকে প্রতারিত করিবার অভিসন্ধি করিতেছে এই ছলনাময়ী রমণী। ক্রুর স্বরে কহিলেন: সিংহবাহিনীই বুঝি শেষ রাত্রিতে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া পলায়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, না? তাহা হইলে মায়ের ইচ্ছাতেই বীজতলার শ্মশানে এই সন্ধ্যায় আসিয়া তাঁহারা মায়ের অনুচরদের হাতে বলি যাইবে—সিংহবাহিনী সেইজন্যই পথ দেখাইয়া থাকিবেন।

সেই রাত্রিতে সুরথ চৌধুরী গৃহে ফিরিলেন শ্রান্ত, পরিতৃপ্ত অন্তরে। সত্যই ব্রহ্মহত্যায় তাহারা অনিচ্ছুক; তাই ব্রাহ্মণ ও তাহার পুত্রকে হাত চোখ মুখ বাঁধিয়া বীজতলার শ্মশানের 'ডাকাতের কালীর' সম্মুখের ঝোপে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। খাউক তাহাদিগকে শৃগাল শকুনে, খাউক বাঘে-ন্যাকড়ায়। সুরথ চৌধুরী ইহাও করিতেন না—যদি নির্বোধ ব্রাহ্মণ ধন-সম্পত্তি সহজে প্রত্যর্পণ করিত। কিন্তু সে শিষ্যের বিশ্বাস হারাইবে না। মোহরের থলিটা বুকে জড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বারেবারে জানায়—সিংহবাহিনী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।

সুরথ চৌধুরী দেখিলেন—গৃহ নির্জন, শয্যা শূন্য। দাসী জানাইল: মা, আজ কি বিশেষ মানস করিয়া সিংহবাহিনীর মন্দিরে ধর্ণা দিয়াছেন। সুরথ চৌধুরী মনে মনে গর্জন করিতে করিতে শ্রান্ত দেহে শয়ন করিলেন। আদেশ করিলেন, রাত্রিতে কেহ যেন তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। স্পর্ধা বটে এই ছন্নবুদ্ধি স্ত্রীলোকের! কিন্তু রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা বারেবারে ব্যাহত হইল। সেই ব্রাহ্মণের কাকুতি-মিনতি কানে পৌছিতে লাগিল। একবার দেখিলেন সেই নিরুপায় মহাজনকেও। তাহার চক্ষু কেমন পলকহীন—সেই মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যেমন স্তব্ধ বিহ্বলতায় চাহিয়াছিল, ঘনঘন শ্বাস বহিতেছিল, এখনো তেমনি চাহিয়া আছে—সুরথ চৌধুরীর দিকে। একবার নিজ স্ত্রীকেও

ভূমিকা

সুরথ চৌধুরী স্বপ্নে দেখিলেন : 'আমি চলিলাম, তোমার পাপের ভার আমি আর সহিতে পারি না, সহিতে পারি না।' রাত্রিশেষে সুরথ চৌধুরী দেখিলেন—সিংহবাহিনী! তাঁহাকে দেখিয়াই দেবী প্রতিমা মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ঘর্মাক্ত দেহে সুরথ চৌধুরী জাগিয়া গেলেন। শিয়রের নিম্নস্থ মোহরের তোড়ার উপর হাত পড়িল। কঠিন, শীতল একটা স্পর্শে গা যেন হিম হইয়া গেল। কিন্তু তখনো তাঁহার ললাট স্বেদসিক্ত।

সমস্ত রাত্রি গৃহিণী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই বুঝি। কিন্তু ক্রোধে এবার মন জ্বলিতে চাহিল না। কেমন একটা আশঙ্কা তাঁহাকে অধিকার করিতে চাহিতেছে। গৃহের বাহিরেও কী একটা ত্রাসগ্রস্ত জটলা চলিয়াছে যেন।

সুরথ চৌধুরী দ্বার খুলিতেই দেখিলেন—মন্দিরের ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া। ভয়ে দেহ কাঁপিতেছে, চোখে ভীতি, মুখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না!

—জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধ ত মায়ের নিকটে করি নাই।

—কিন্তু, কি ব্যাপার?

অনেক কণ্ঠ; কে কি বলিতেছে যেন কিছুই বুঝা যায় না। সুরথ চৌধুরীও না বুঝিয়াই বলিতেছেন : মন্দিরে দেবতা নাই? কে আছে?

—কর্ত্রীঠাকুরাণী!

—কোথায় তবে দেবী-বিগ্রহ?

একটু পরেই সংবাদ আসিল। বীজতলার শ্মশানের পার্শ্বে বট তলায় দেবী দণ্ডায়মানা; —চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ির দিকে তিনি পিছন ফিরিয়া আছেন—আর বুঝি ফিরিবেন না।

বীজতলার নিকটে-দূরে তখন কোথাও কেহ নাই। সেখানে

'ডাকাতে কালীর' পাট। নিকটে জালিয়া পাড়ার মানুষেরা বলিতেছে—এক বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ও তাহার পুত্রকে বারুজীবীরা পাণের নৌকায় সকাল বেলা তুলিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ নাকি তাহাদের বলিয়া গিয়াছেন নিশীথে তাঁহারা শ্মশানে পথ হারাইয়াছিলেন। কাঁদিতে থাকেন, দেবতাকে ডাকিতে থাকেন। তখন শ্মশানে আসিলেন চৌধুরীদের কর্ত্রীঠাকুরাণী। তিনিই তাঁহাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া পথ দেখাইয়া বলিয়াছেন,—রাজ্যে অনেক পাপ জমিতেছে। দূরে যাও, দূরে যাও।

কিন্তু চৌধুরীদের কর্ত্রী-ঠাকুরাণী তখনো সিংহবাহিনীর মন্দিরতলে অবলুণ্ঠিতা হইয়া আছেন। পুরোহিত দেখিয়াছেন সমস্ত রাত্রি এই ভাবেই তিনি রহিয়াছেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণী কিন্তু সমস্তই দেবীর মুখে শুনিয়াছেন; জানিয়াছেন চৌধুরীদের বিভীষিকা-ভরা কঠিন ভবিষ্যৎ। তাই সমস্ত রাত্রি পাথরে কপাল ঠুকিয়া ঠুকিয়া ললাট রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন—দেবী প্রসন্ন না হইলে এই মন্দির ছাড়িয়া আর তিনি গৃহে ফিরিবেন না।

সিংহবাহিনী বিমুখ। সেদিনই দেওয়ানীর পাইক আসিয়া সুরথ চৌধুরী ও ভৈরব চৌধুরীকে বন্দী করিয়া জাহাঙ্গীরনগরে লইয়া গেল। তাঁহারা সম্রাট সরকারের রোষে পড়িলেন কেন, কেহ জানে না। এইবার তাঁহারা 'ঠাণ্ডা গরাদে' বাস করিবেন। কেহ বলিল ফৌজদার তাঁহাদের মুকুন্দাবাদে পাঠাইয়াছেন,। কেহ বলিল সেখানে সুরথ চৌধুরীর 'বৈকুণ্ঠ বাসের' আদেশ হইয়াছে। হয় ত জাতিচ্যুতিও ঘটিবে।

কাজীপাড়ার কাজী ফৈজুদ্দীন প্রায় চার মাস পরে জামিন হইয়া ফিরাইয়া আনিলেন প্রথম ভৈরব চৌধুরীকে। —সেই সূত্রেই কাজীরা চৌধুরীদের বড়খালের চোকিও আদায় করিতে লাগিলেন।

ভৈরব চৌধুরী বাহান্ন পীঠের সিদ্ধাসাধক ত্রিপুরেশ্বর ঠাকুরের নিকট শরণ লইলেন। অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক মিনতি ভিক্ষার পরে,

আগমানন্দ আসিলেন। তাঁহারা শক্তিসাধক, কাহারও জাতি পাতের ভয় করেন না। বীজতলার শ্মশানে আগমানন্দ যোগাসনে বসিলেন। আহ্বান করিয়া দেবীর মন্ত্র পড়িলেন। আর ধ্যান শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বয়ং দেবী প্রতিমাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন: আয়া হি দেবী, ভদ্রকালী! খেটকখর্পরধারিণী!

প্রতিমা নড়িয়া উঠিল। মুখ ফিরাইল।

সুরথ চৌধুরী রাজকোষ মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিলেন, কিন্তু গৃহে ফিরিলেন না। নূতন মন্দিরে এবার দেবীর বোধনও প্রতিষ্ঠা করিলেন সিদ্ধা ত্রিপুরেশ্বর আগমানন্দ। নির্দেশানুযায়ী ভৈরব চৌধুরী ও সুরথ চৌধুরী নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপন করিলেন। গুরুর কৃপায় ভৈরব চৌধুরী একটা নূতন মহালও বন্দোবস্ত পাইলেন। কিন্তু সুরথ চৌধুরী আর গৃহে ফিরেন নাই। পতিপত্নী দুইজনেই যান বীজতলার শ্মশান কুটিরে। সেখানে দক্ষিণা কালীর পূজা করিলেন। বৃক্ষতলের আসনে চৌধুরী গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। দৃষ্টি শূন্য, সংজ্ঞা যেন বিলুপ্ত, চতুর্দিকের সংসারকে চিনিতে পারেন না। কাহার সহিত কথা বলেন, হাসেন, কদাচিৎ কাঁদেন। তিনি দেয়াসিনী; আসনে বসিয়া যাঁহাকে যাহা বলিবেন তাহাই সত্য হয়।

বটগাছের ঝুরি আজ ঘিরিয়া আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে চৌধুরী কর্তার ও চৌধুরী কর্ত্রীর সেই সাধন আসন। চিত্রিসারের মনে আছে ঐখানে 'দেবীর আসন'; মানত করিলে বিপদ দূর হয়।

কাহিনী যাহাই আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হইয়া থাকুক, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই মোগল-সাম্রাজ্য তখন বিগত-মহিমা। আওরেঙ্গজীবের জীবন-সন্ধ্যা, দাক্ষিণাত্য অভিযানে তাঁহার রাজকোষের সমস্ত ঐশ্বর্য

নিঃশেষিত। শুধু মুর্শিদকুলিখাঁই তাঁহার ভরসা। বাঙলার রাজস্ব মুর্শিদকুলি খাঁ কঠিন নির্মমহস্তে আহরণ করিতেছিলেন— দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য। জাহাঙ্গীরনগর হইতে রাজধানী চলিয়া গিয়াছে মুকশুদাবাদে। আর বাকী-বকেয়ার দায়ে পুরাতন জায়গীরদার জমিদারদের সম্পত্তি মাল জামিনি প্রথায় তিনি খালসা করিয়া লইতেছিলেন। মুসলমান জায়গীরদারেরও দুর্দশার অন্ত নাই। খাজনাবাকীর দায়ে হিন্দুদের ত সপরিবারে ধর্মত্যাগও করিতে হয়। অবশ্য অন্যদিকে চতুর হিন্দু আমিন, আমিল, কানুনগোদের তিনি ইজারাদার নিযুক্ত করিয়া নূতন জমিদার বংশেরও পত্তন করেন। এইরূপে দ্বিগুণ তেজে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের ও প্রজা-শোষণের দুর্দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা সম্রাটের রিক্ত রাজকোষের পক্ষে চমৎকার, পুরাতন জমিদার-জায়গীরদার পক্ষে ও শোষিত উৎপীড়িত বাঙলার প্রজাদিগের পক্ষে বিভীষিকা। পাঁচ পুরুষে শঙ্কর চৌধুরীর বংশেও তখন সম্বল কিছুই ছিল না। 'ফটক' ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, 'শঙ্কর দীঘিও' সংস্কারাভাবে শ্যাওলায় আচ্ছাদিত, পুরাতন মন্দির জরাজীর্ণ। রাজ-সরকারের খাজানা যে বাকী পড়িতেছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্যদিকে পুরাতন ভূস্বামিত্বের নামে নিকটে পথে ঘাটে চৌধুরীরা করিতেছিলেন ডাকাতি ও রাহাজানি—মুখে বলিতেন নিজেদের চৌকি আদায় করেন। ইব্রাহিম খাঁয়ের পর হইতে জাহাঙ্গীরনগরের সুবাদাররা ছিলেন আলস্যে মগ্ন। রাজস্ব আদায় হইত না। জমিদারীর বাকী বকেয়ার দায়ে তাই একদিন চৌধুরীরাও অনেকের মত ধৃত হইয়াছেন। হয়ত শহরে তাঁহাদের গরাদ বাস করিতেও হইয়াছে। তারপর আবার মুরুব্বি-বন্ধুর সহায়তায় মুক্তিও পাইয়াছেন। এমন কি বিচক্ষণ মানুষ হিসাবে উচ্চ ওয়াদায় নূতন বন্দোবস্তের দিনে চৌধুরীরা ইলশাজারীর

হাজারীদের একটা ছোট মহালের ইজারাদারী সংগ্রহ করিয়া আবার নূতন করিয়া নিজেদের ভাগ্য গঠনেও উদ্যোগী হইয়াছেন। আবার স্থির চলিয়াছে চিত্রিসার গ্রাম, তেমনি রহিয়াছেন উহার 'ভুঞা' চৌধুরীরা।



কাছারি বাড়ি

ঢাকার সরকারী দপ্তরে চৌধুরীদের যোগাযোগ কিন্তু বাড়িয়া গিয়াছিল সেই ভৈরব চৌধুরীর দিন হইতে। তাই ষষ্ঠ পর্যায়ের ভবানী চৌধুরী নূতন মহালে বুড়ীগঙ্গার দিকে বাস তুলিয়া ল'ন। সপ্তম পর্যায়ে পদ্মনাভ চৌধুরী কিন্তু সামান্য ফারসির জোরে আর নিজের বুদ্ধি বলে বিশ পঁচিশ বৎসর ঢাকায় দেওয়ান বকসীর আমিল রূপে কাটাইয়া চিত্রিসারের গৃহে ফিরিলেন—তখন প্রচণ্ড তাঁহার প্রতাপ। এই কয় বৎসরে নবাব সরকারের আমিলরূপে তিনিই ওয়াদাদার হইয়াছেন নয়াগাঙের ও বড় খালের মুখের এই চৌকির, আত্মসাৎ করিয়াছেন সেই সুযোগে নওডাঁড়ার দুই দিকের বহু জমি। মোটের উপর তাঁহার জমিজমা এখন তত সামান্য ব্যাপার নয়। কারণ, সেই 'ছোট গাঙ' আর 'নয়াগাঙ' নাই—এখন তাহা ক্রম-প্রসারী নদী 'পদ্মা'—এখনো অবশ্য 'ছোটই'। তাহার সংলগ্ন জমিও এখন মূল্যবান্। নদী এদিকে অগ্রসর হইয়া আসাতে নওডাঁড়াও এখন ভালো খাল। সেই পথে প্রায় বারো মাস নৌকা চলে। তাহা আঁকিয়া বাঁকিয়া মাঠের নিচু জমি প্লাবিত করিয়া কালচিতার জোলাদের 'পীরের

ঢিবির' পাশ দিয়া গিয়া কাজীপাড়ার পার্শ্বে 'বিল ধুলিয়ায়' মিশিয়াছে। বড় খালের একটা ছোট শাখা ইলশাজারির পার্শ্ব দিয়া উঠিয়াছে; মধ্যমগ্রামের মধ্য দিয়া আসিয়া তাহাও এই 'চিত্রিসারের খালের' সঙ্গে মিলিয়াছে। বর্ষায় এখন চিত্রিসারের মাঠ ঘাট ভরিয়া যায়। মাঠের জমি আগে ছিল উঁচু, এখন যেন ক্রমেই নিচু হইতেছে। চিত্রিসার, কালচিতা, ইলশাজারি, কাজীপাড়া, মধ্যম গ্রাম—সমস্ত গ্রামগুলিই এখন জনবহুল। কোথাও এক চিলতা জমিও অনাবাদী নাই। জলের অভাবে চাষ হইত না এই অঞ্চল, এই কথা চাষীরা এখন শুনিলেও বিশ্বাস করিবে না। কারণ, জলাই ত বেশি। নৌকাযোগে প্রতিটি গ্রামের সঙ্গে বাহিরের লেন-দেনের সুযোগ এখন সুনিশ্চিত হওয়ায় গ্রামগুলির শ্রীবৃদ্ধিও দ্রুত হইবে। এখন কি, বর্গীর উৎপীড়নে রাঢ়ের, নিম্নবঙ্গের দুই চারিটি পদস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবার এদিকে বসবাস করিতে আসিয়াছেন। অথচ নূতন বাড়ি পত্তন করিবার মত স্থান বুঝি আর গ্রামের কোনো পুরাতন গোষ্ঠীরও নাই। বাড়ির সঙ্গে বন-জঙ্গল-বাগান অবশ্য এখনো আছে; কিন্তু এই আম বাগান, হিজল ছাতিমের জঙ্গল, ঝোপঝাড় সবই যদি নিঃশেষ হয় তবে মানুষ জ্বালানি পাইবে কোথায়? খাইবে কি? পরিবে কি? এমনিতেই খাদ্য অপ্রচুর, গ্রামের ধান-চা'ল আসে শ্রীহট্ট বাখরগঞ্জ হইতে—হাড়িকুড়ি, শাঁখা, কাঁসার বিনিময়ে।

বাহির হইতে অন্য আমদানীও আসে। ঢাকা, বাখরগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর যোগীদিয়া হইতে ইংরেজ কুঠিয়ালরা দেশের চারিদিকে ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। কত ইহাদের টাকা তাহা যেন গণিয়া উঠা যায় না! নগদ তন্‌খা এমন করিয়া ফেলিতে নবাব সরকারও পারে না। তাই নবাবের ফৌজদার থানাদার সকলেরই চক্ষু কুঠিয়ালদের উপর—ইংরেজ ও ফরাসী কুঠির সাহেবেরা 'টাকার কুমীর'। শাসকেরা কেহ তাহাদের

চাপ দিয়া টাকা আদায় করিতে চাহে, কেহ তাহাদের গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া টাকা আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট। এদিকে সাহেবেরা দাদন দিয়া দেশের সাধারণ জোলা, যোগী, তাঁতীকে পর্যন্ত হাত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে তাহারাও অবশ্য টাকার মুখ দেখিতেছে। সাত পুরুষ ধরিয়া গ্রামের যোগীরা চৌধুরীবাড়ির ধুতিশাড়ী জোগায়, পূজা পার্বণের জন্য শাড়ী জোগায় দু জোড়া, ধুতিও দু' জোড়া, গামছা জোগায় আট খানা। কিন্তু আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ তাহারা ঢাকার কুঠির দাদন পাইয়া প্রায় এই দায়িত্ব ভুলিতে বসিয়াছে। এখন বলে ঃ—হুজুর কর্তা, কুঠির দাদনের কাপড়ও জোগাইয়া উঠিতে পারি না। আপনাদের ধুতিশাড়ী আর দিতে পারি আপনাদের না। আপনারা বরাবরকার মুনিব, বরং তনখায় উহার একটা দর ধরিয়া দিন। টাকাই দিই।

পদ্মনাভ অবশ্য তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। তন্‌খা আবার কি? তাঁহার প্রজা, তাঁহাকে কাপড় জোগাইবে না ত জোগাইবে কি কুঠির দালাল পাইকারকে? কিন্তু ইংরেজ কুঠির গোমস্তা দালালেরা এখন সত্যই তাঁতীদের হর্তা-কর্তা হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মনাভ তাহাদের সহিতও কলহ করিতে চাহেন না। কারণ, ইংরেজের গোমস্তা নবাবের "ক্রোরী" মনসবদারের অপেক্ষা কম ক্ষমতাপন্ন নয়। বেণী চন্দ এখন ইলশাজারির আড়ৎএ কুঠির গোমস্তা। সে রীতিমত একটা বড়মানুষ এখন ;—দুই পুরুষ আগেও উহারা ছিল মধ্যমগ্রামের বাবুদের শিকদার। মধ্যমগ্রামের গুপ্তবাবুদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁহারা বহু পুরুষের সম্মানিত ঘর, —ছিলেন রাজ-বৈদ্য। কিন্তু বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদেরও সব যাইতে বসিয়াছিল। রক্ষা পাইল রাজনগরের রাজ-বাটির রাজা রাজবল্লভের স্বজাতি কুটুম্ব হিসাবে। তাহাতে নবাব সরকারে উন্নতির সুযোগ পাইলেন। তারপর তাঁহারা ইংরেজ কুঠিয়ালদের বকীল হইলেন। কৃষ্ণ

বল্লভের সঙ্গেসঙ্গে অবশ্য রাজরোষে ভাগ্যবিড়ম্বনাও গুপ্তদের সহিতে হইয়াছে। কিন্তু এইবার ত তাঁহাদেরই ভাগ্যোদয়। মীর জাফর কোটি কোটি টাকা ইংরেজ কোম্পানিকে দিয়া বাঙলার নবাব হইয়াছেন। গুপ্তদের এককর্তাও কলিকাতা, না, কাশীমবাজারেই থাকেন।

পদ্মনাভ চৌধুরী বিচক্ষণ লোক হইলেও একটা ভুল করিয়াছেন। বাঙলার মসনদ্ লইয়া এখন শতরঞ্চ খেলা চলিতেছে। নিজের জীবনেই তিনি দেখিয়াছেন আলীবর্দী খাঁর ভাগ্যোদয়; শুনিয়াছেন শাহানাবাজের রাজ্যচ্যুতির কথা। মুর্শিদাবাদে না গেলেও; ঢাকায় বসিয়াও তিনি বুঝিয়াছেন—ইংরেজ বণিক কী শক্তিতে শক্তিমান! কিন্তু তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছে। প্রথম তিনি মনে করিতেন বুঝি বর্গীরাই বাঙলার কর্তৃত্ব লাভ করিবে। পরে ভাবিয়াছিলেন—ফরাসী বণিকেরা তাহাদের এই চিরশত্রু ইংরেজদিগকে যে করিয়াই হউক আগলাইয়া রাখিবে। নবাবের কলিকাতা অবরোধের পরে পদ্মনাভ তাঁহার মুনিব বক্সী ফৌজদার দেওয়ানদের মতই স্থির করিয়াছিলেন—ইংরেজের ভাগ্য অস্তমিত হইতেছে;—নায়েব জশরৎ খাঁ ঢাকার ইংরেজ কুঠি দখল করিয়া তখন ইংরেজ কুঠিয়াল ও তাহাদের বিবিদের পর্যন্ত ফরাসী কুঠির জিম্মায় বন্দী করিয়া রাখেন। পদ্মনাভ মনে করিলেন—সেই সঙ্গেই অস্তমিত হইতেছে এইবার রাজা রাজবল্লভের ভাগ্য ও মধ্যমগ্রামের গুপ্তদেরও আশা, আর তাঁহাদের আত্মীয় পরিজন, উমেদার, তাঁবেদার অন্যান্যদেরও ভবিষ্যৎ। অথচ দুই বৎসর না যাইতেই সেই ইংরেজ মীরজাফরকে মসনদে বসাইল, আর সিরাজোদ্দৌলার শিরশ্ছেদ করিল। পদ্মনাভ চৌধুরীর হিসাবে এই ভুল ঘটিয়াছে। এখন সযত্নে, সাবধানে তিনি তাহা শুধরাইয়া লইতে চাহেন—কোনো পক্ষে এখন এখনি যোগদান করা ঠিক নয়।

তাঁহার পুত্র সনাতন ও জনার্দনকে তিনি ঢাকায় ফারসি পড়াইয়া

উপযুক্ত করিতেছেন। কাজীপাড়ার কাজী সফর আলী বলে—সনাতন আলেমদার মুন্সি মানুষ; ফারসিতে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না তালেব আলেমদের মধ্যে। সফর কাজীবংশের ছেলে,—সনাতনের বন্ধু, নবাব সরকারে তিন পুরুষ তাঁহাদের কর্ম ও প্রতিষ্ঠা। সে নিজে দেওয়ান মহম্মদ আলীর ডাক চৌকির দারোগা। অবশ্য পুরাতন ডাক চৌকির দপ্তর নাই, ওয়াকা-নবিশেরা নাই, সওয়ানি-নিগাররা নাই। দিল্লী দূরের কথা, মুর্শিদাবাদে ডাক পাঠাইবারই বা তাগিদ দিবে কে? বরং ঢাকার কুঠির সাহেবরাই এখন প্রতিদিন তাহাদের খবরাখবর কাশীমবাজারে, কলিকাতায়, চট্টগ্রামে প্রেরণ করে। সফর আলীর কাজ তাই এখন শুধু জমিদার, জমাদারদের ভাবগতি লক্ষ্য করা, ইংরেজ কুঠির সাহেবদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করা। সফর তেজীয়ান লোক, সনাতন তাহার বন্ধু, এখনো সে দেওয়ানীতে 'আমিল' মাত্র। বন্ধুর সাহায্যে সনাতন উন্নতি করিয়া ফেলিতে পারিবে। অবশ্য সনাতন সেদিকে একটু নিস্পৃহ। অর্থার্জন অপেক্ষা বিদ্যার্জনে সে অধিক আগ্রহশীল। বরং সে দিকে জনার্দনই বুদ্ধিমানও স্থিরচিত্ত, সেও ফার্সি পড়িতেছে। কিন্তু তাহার উৎসাহ ছিল কুস্তিতে, ডনে, বাচখেলায়, ঘোড়-দৌড়ে। ঢাকায় সে ফৌজে একটা পদ লাভ করিতে পারিবে। পদ্মনাভ ততক্ষণে চিত্রিসারে বসিয়া আপনার আহরিত সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবেন।

পদ্মনাভ বাড়িঘর নূতন করিয়া মেরামত করিবেন। দালান-কোঠাই তুলিতে পারিতেন, এখন অতটা জাঁকজমক করা সুবুদ্ধি হইবে না। শত্রুদের অমনি তাহা চোখে পড়িবে। কেহ হয়ত 'দেওয়ান-ই আমুয়াল' বলিয়া তাহা 'বা'ৎ-উল্-মালে' বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। দেওয়ানের কোন্ তন্‌খা বাকী পড়িয়াছে, বক্সীর কোন্ হিসাব দাখিল করেন নাই,—এইরূপ একটা ওজুহাৎ তুলিলেই হইল। মুর্শিদ কুলি খাঁর

ভূমিকা

আমল হইতে সরকারের অভাব যত বৃদ্ধি পাইতেছে ফৌজদার থানাদার দেওয়ান ফোতাদার সকলের বিষয়-বিত্ত জবৎ করিবার দিকেও ততই সরকারের ঝোঁক পড়িয়াছে। জমিদার, ফৌজদাররাও ছাড়েন নাই; অধীনের ক্রোরী, জমাদার, ওয়াদাদার হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় আমলা কর্মচারী যাহারই সুসম্পন্ন অবস্থা দেখিয়াছেন, একটা না-একটা ফিকিরে তাহারই সম্পত্তি 'বা'ৎ-উল-মালে' জবৎ করিয়া লইয়াছেন। ইলশাজারির হাজারীরা নিস্তার পান নাই। কাজীরাও নিষ্কৃতি পান নাই। আবার সেই কাজীরাও মধ্যমগ্রামের জমিদারদের নিস্তার দেন নাই। মুর্শিদকুলিখাঁর আমলে অমন দুর্গোৎসব যে হিন্দু জমিদার করে, থানাদার কাজী ও বা'ত-উল-মালের দারোগার দৃষ্টি আর তাহাদের উপরে পড়িবে না? সুরথ চৌধুরীর পর হইতে চৌধুরীদেরও দুর্গোৎসব তাই বন্ধ। মণ্ডপও শূন্য। অবশ্য নবাব সরকারেরও এখন সেদিন আর নাই; ফৌজদার, বক্সী, বুয়াতাতেরও সেই দাপট নাই। ইংরেজের আশ্রয় লাভ করিয়া বরং কুঠির গোমস্তা-দালালেরাও এখন কর্তৃত্ব করে। তাই বুঝিয়া চলিতে পারিলে তিনি পদ্মনাভ চৌধুরীও আপনার নাম মান পদ প্রতিষ্ঠা বিষয়-আশয় সবই বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিবেন। গ্রামে বসিয়া কিছুদিন ধীরভাবে অবস্থা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। আর, ঢাকায় তাঁহার ভালোও লাগিতেছে না। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী সুখবতীরও এখানে সম্প্রতি কাল হইয়াছে। এখন এখানে কে তাঁহার পরিচর্যা করে?

পদ্মনাভ চৌধুরী চিত্রিসারে আসিয়া বসিলেন। প্রথমেই কাছারি বাড়ি নূতন করিয়া তুলিলেন। এখনো কাঁচা, পরে পাকা করিবেন। সেখানে তিনি আদালতে বসিবেন; সাধারণ ভাবে তাহার দরবারও বসিবে। দুই দশ জন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অনুগত অনুচর লইয়া কাছারিতে তিনি দরবার জমাইয়া তুলিলেন। গল্প করিতে করিতে উর্দু ও ফার্সি চৌধুরী

কর্তার মুখে আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে,—পুরাতন অভ্যাস। উপস্থিত ভদ্র গৃহস্থ ও প্রজা পাইকেরা না বুঝিয়া সসম্ভ্রমে তাকাইয়া থাকে। সেই পদ্মনাভ চৌধুরী যিনি পাঠশালায় সংস্কৃত ও বাংলা শিখিতে হিমসিম খাইয়াছেন, তিনি কিনা ফার্সি বলিতে থাকেন 'অনর্গল ও নির্ভুল'। তাহা যে নির্ভুল এই. বিষয়ে স্মৃতিরত্নের সন্দেহমাত্র নাই। নূতন কাছারিবাড়িতে পদ্মনাভ আসিয়া বসেন রীতিমত দরবারি কায়দায়—মলমলের চুস্ত পা'জামা, চাপকান পরিয়া। কাছারির লোক দাঁড়াইয়া উঠে। বন্ধু-প্রতিবেশীরা 'সুপ্রভাত' জানায়। মুসলমান প্রজারাও আদাব না জানাইয়া পারে না। রূপার বিদরিতে তামাক সাজিয়া হুকা বরদার আসিয়া দাঁড়ায়—গ্রামের নানকার গোলামদের দিয়া এই কাজ ঠিক মত হইত না। চৌধুরী অনেক করিয়া শহরের একটা চাকরকে সঙ্গে আনিয়াছেন। মধু সিংকে 'খানসামা' বলিতে হয়, বাড়ির দাস-দাসীরা তাহাকে যথারীতি সম্মান করে। চৌধুরীকেও শুধু 'কর্তা' বলিবার উপায় নাই। 'হুজুর কর্তা' বলিতে হয়। খড়ার দিনে তিনি পালকি চড়িয়া মহাল দেখিতে যান। কখনো বা বাজপাখী হাতে মাঠে যান শিকারে। মধুর হুকুম মত গ্রামের চাকর বিদরি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলে। কখনো পদ্মনাভ বিদরিতে এক-আধ টান দেন। দরবারে বসিলে অবশ্য আর বিদরি টানেন না। তখন প্রজাদের বিচার করেন, শাস্তি বা পুরস্কার দেন। মেহদি পাতায় রঙা দাড়ি ও বাবড়ি চুল; হাতও রঙীন, চোখে সুর্মা আঁকা, দীর্ঘ দেহ গৌরবর্ণ, —আমীর ওমরাহের মতই দেখায় কাছারিতে পদ্মনাভকে। আতর মাখা রেশমি রুমালে এক-একবার তিনি মুখ মুছিয়া লন। মধু খানসামা রূপার বাটা আগাইয়া দেয়, কিমাম কস্তুরীভরা পান পদ্মনাভ মুখে পোরেন। পূজায় পার্বণে, ইদে-মহরমে পদ্মনাভ পণ্ডিতদের ভালোভাবে বিদায় দেন,

প্রজা-বরকন্দাজদের ভালো করিয়া বখশিস্ করেন। ঢালী পাড়ার মস্‌জিদেও পীরের ঢিবিতে তিনি সাহায্য দেন। দুর্গামণ্ডপ ও নাটমন্দির, আবার খড় দিয়া ছাওয়াইতেছেন। ভাসানের গানে, মঙ্গল গানেও তাঁহার উৎসাহ আছে। তবে সকলেই জানে—ফার্সিই তিনি ভালোবাসেন। কিন্তু তাই বলিয়া পণ্ডিতদের 'বিচারই' কি তিনি বোঝেন না? চতুষ্পাঠীর বৃত্তি তিনি বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। নাটমন্দিরে বিদ্যালঙ্কার তাঁহাকে মহাভারত, ভাগবত শুনাইবেন। পদ্মনাথ সময় না পান, গৃহিণী, প্রতিবেশিনীরা অন্তত ভাগবত পাঠ, কথকতা, প্রভৃতি নাটমন্দিরে শুনিবেন, তাঁহাদেরও ক্রিয়াকর্ম আছে ত।

পদ্মনাভের কাছারিবাড়ির খানদানী কায়দা চিত্রিসারে নূতন চমক লাগাইল। শহরে বহুকাল বাস করিয়া তিনি অবশ্য গৃহ-জীবনেও কিছুটা মুসলমানী কায়দা দোরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রিসারের ভদ্রাসনে তাহা কোনদিন তিনি জাহির করিতে চাহেন না। উহা কাছারিবাড়ির আদাব-কায়দা। গৃহ-ব্যবস্থায়, অন্তঃপুরের আচার-নিয়মের সহিত উহার সম্পর্ক কি? সেখানে চৌধুরী কর্ত্রী তাঁহার শাশুড়ী ও পূর্ববর্তিনী কর্ত্রীদের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিয়াছেন, চিরদিনই তাহা রাখিবেন। পদ্মনাভেরই কি সাধ্য আছে তাহা নড়চড় করেন? সেখানে গোবর-জলে দাসদাসীরা গৃহাঙ্গণ পবিত্র করিবে; বাসন কোশন ধুইবে মাজিবে; দেবসেবার জন্য গৃহিণী বধূরা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধাচারে প্রস্তুত হইবেন; বার-তিথি অনুযায়ী পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়িবেন; গৃহিণী-বধূ ব্রতনিয়ম উপবাস যথানিয়মে পালন করিবেন। সূর্যার্ঘ্যে দিন আরম্ভ হইবে; পূজায় আহ্নিকে মধ্যাহ্ন অপগত হইবে; শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যা আসিবে। সাবিত্রী ব্রত ও যম-চতুর্দশীর ব্রত, যমপুকুর ও মাঘমণ্ডল, তারা ব্রত ও বারুণী স্নান,—বৈশাখ হইতে চৈত্রসংক্রান্তি পর্যন্ত ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতে নিয়মে

ভূমিকা

চৌধুরী গৃহিণীর ও চৌধুরী বধূদের জীবন-যাত্রা আকাশ পৃথিবী ও তাবৎ চরাচরকে আত্মীয়তা সূত্রে গাঁথিয়া লইয়া যুগ-যুগান্তের নিয়মে চলিবে যুগ যুগান্ত পর্যান্ত। পদ্মনাভ চৌধুরীও সেখানে শুভ্র উপবীত দোলাইয়া, খালি গায়ে, খড়ম পায়ে, কাষায় বস্ত্র পরিয়া পূজা আহ্নিক করেন; আহারে-বিহারে স্মৃতি ও পঞ্জিকার নির্দেশ ও গৃহকর্ত্রীর ব্যবস্থা পালন করিয়া চলেন; সিংহবাহিনীর নিকট নিবেদন না করিয়া সন্ধ্যাকালীন সুরাপানও করিতে সাহসী হনন।।—ইহা শহর নয়, ভদ্রাসন; এই গৃহকর্ত্রী তাঁহার আয়েষা-তুল্য। প্রেয়সী সুখবতী নয়, চিত্রিসারের চৌধুরী কর্ত্রী; চৌধুরীদের আচার নিয়ম তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না।

তবে পদ্মনাভও সৌখীন মানুষ। সম্ভব হইলে তিনি কাজীপাড়ার ফয়েজ কাজীর মত নির্মাণ করিতেন 'রংমহল'। কিন্তু এত সাহস ভালো নয়। পদ্মনাভ সময় মত নির্মাণ করিবেন জলটুঙি—দক্ষিণের বাগিচার শেষে তিনি নূতন পুকুর খনন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। উহারই মাঝখানে তিনি নির্মাণ করিবেন জলটুঙি। সেখানে বসিয়া তিনিও শুনিবেন কাজীপাড়ার কাজী সাহেবদের মত 'লোরচন্দ্রাণীর পাঁচালী', 'মধু-মালতীর উপাখ্যান', 'মৃগাবতীর আখ্যায়িকা' 'বিদ্যাসুন্দর'। তৎপূর্বে কাছারি বাড়িতে বসিয়া জমিদারী শাসন ও পালন করিতে হইবে।

এমন সময় সনাতন বাড়ি ফিরিয়া আসিল। শহর তাহার ভালো লাগিতেছে না। নবাব সরকারে চাকরিও সে আর করিতে চাহে না। সফর আলীরও নাকি তাহাতে আর আগ্রহ নাই। ইংরেজেরা মীর জাফরকে বরখাস্ত করিয়া মীর কাশিমকে গদিতে বসাইয়াছে। বিনিময়ে মীর কাশিম তাহাদিগকে বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের খাজনা ইজারা দিয়াছে।

পদ্মনাভ বুঝিতে পারিলেন না—তাহাতে সনাতন বা জাফরের কি ?

সনাতন ধীরে ধীরে বলিল : সফর আলী বলেন, নবাবী কি এই ইংরেজদের ব্যবসায়ের সওদা নাকি ?

—সে মীর জাফর, মীর কাশিম বুঝিবেন। না হয় নবাবের জাত সফর আলী, সেও বলিতে পারে ওই সব বড়-বড় বুলি। কিন্তু তুমি-আমি হিন্দু। আমরা সুবাদার ফৌজদার নই, আমীর-ওমরাহ নই। দুই একজন মাত্র জমিদার ; অন্যেরা চাকরি করি, সেই সূত্রে জমিজমাও অর্জন করিয়াছি। নবাব যে খুশী হউক, আমরা চাকর। আমাদের আপত্তি করিবার কি ?

সনাতন একবার সাহস করিয়া হাসিল। সহজভাবে বলিল : কিন্তু নিমক খাই ত।

পদ্মনাভও হাসিয়া উঠিলেন : কাহার নিমক কে খায় ? রাজ্য দিল্লীর বাদশাহের। তাঁহার নিমকের মান কে রক্ষা করিতেছে ? আলীবর্দী করিয়াছিলেন কি তাহা ? মীরজাফরও কি নিমক-হারামি করে নাই ? তাহা হইলে মীর কাশিম নবাব হইলে আপত্তি করিতেছ কেন ?

—মীর কাশিম বলিয়া সফর আলী আপত্তি করেন না। বরং তিনি মীর জাফরকেই মনে করিতেন অকর্মণ্য, নিমক-হারাম। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আপত্তি—হারাম-খোর ইংরেজ এই আমীর-ওমরাহদের পুতুল-নাচ নাচাইতেছে।

পদ্মনাভ এবার গম্ভীর হইলেন। প্রথম নীরব রহিলেন, পরে বলিলেন : তোমার বুদ্ধি আছে, বুঝা উচিত। ইংরেজের বিরুদ্ধে কেহই আর দাঁড়াইতে পারিবে না। পূর্বে আমি ভুল করিয়াছি। কিন্তু এখন তুমি যদি ভুল করো তবে সর্বনাশ হইবে। তুমি সফর আলীর এসব কথায় কান দিও না। নিমক টিমকের প্রশ্ন নয়, জোর যাহার মুল্লুক তাহার।

সনাতন নীরব থাকিয়া বলিল : আমি আর চাকরি করিতে চাই না। এই গোলমালে কেমন আমি কিছুরই ঠিকানা পাই না।

পদ্মনাভ বিস্মিত হইলেন : কেন ? গোলমাল বটে, কিন্তু উন্নতির সুযোগও তেমনি এই সময়েই বাড়িবে। মধ্যমগ্রামের গুপ্তদের দেখো, বেণী গোমস্তাকে দেখো।

সনাতন বলিল : কিন্তু, আমি সেরূপ সুযোগ গ্রহণে অক্ষম।

পদ্মনাভ সবিস্ময়ে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুস্থ, সুগঠিত দেহ,—ঈষৎ ক্ষীণাঙ্গ, এই যুবক বলে কি ? হাঁ, কী যেন একটা ভীতি ও শঙ্কা উহার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : কি করিতে চাও তবে ?

—পাটনায় গিয়া মুন্সি হইতে চাই।

পদ্মনাভ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। পরে বলিলেন : এখন অনিশ্চিত কাল, পথঘাট নিরাপদ নয়। বরং ঢাকাতেই পড়ো।

কিন্তু সনাতন ঢাকা যাইতে অনিচ্ছুক, ভীতও।

পদ্মনাভের একটা কথা কানে গিয়াছিল। মধু সিং জানাইয়াছিল, তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রী সুখবতীর এক বিধবা কুটুম্ব-কন্যা সনাতনের প্রতি প্রণয়াসক্ত। ইদানীং মেয়েটা একটু বে-সামাল হইয়া পড়িতেছে। 'তবে ছোট হুজুর ত কেতাব লইয়াই মশগুল।' সনাতন ঢাকা হইতে কি তাই পালাইয়া আসিয়াছে ?

পদ্মনাভ সাবধানে বলিলেন : ঢাকার সেদিন নাই, কিন্তু এখনো সেখানে ত মৌলবী মুন্সি আছে। তাহা ছাড়া বুজর্গ মৌলবী ও সুফী পীররাও আছেন। তুমি ত শুনিয়াছি পিয়ারা শাহ সাহেবের ও নিকট যাতায়াত করো।

সনাতন বলিল : হাঁ।

—তবে ঢাকা ত্যাগ করিবে কেন ?

—শাহ্‌ সাহেবই আমাকে ঢাকা ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম তাই পাটনার কথা।

পদ্মনাভ চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলেন : পীর-মুর্শিদের কথা অবশ্য অবহেলা করিবার মত নয়। বেশ, তুমি গৃহে থাক। কাজকর্ম তদারক করো—না হয় সরকারের আমিন, মুশরিফ্‌ না হইলে। তুমি জমিদার বংশের বড় ছেলে, আমি থাকিতে থাকিতে সব বুঝিয়া লও। জনার্দনই বরং ঢাকায় চাকরি করিবে। সফর আলীকে অনুরোধ করিয়া তোমার পদেই এখন তাহাকে নিযুক্ত করো।

কিন্তু পদ্মনাভের কেমন অদ্ভুত মনে হইল—কথাটা কি সত্য ? একটা স্ত্রীলোকের ভয়ে কর্মত্যাগ করিয়া, শহরের গুণী ও সভ্য-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারে কোনো পুরুষ—পদ্মনাভ চৌধুরীর পুত্র, সুরথ চৌধুরী, ভৈরব চৌধুরীদের বংশধর ? সুরথ চৌধুরীকে পদ্মনাভ দেখেন নাই, কিন্তু ভৈরব চৌধুরীকে দেখিয়াছেন—মালী পাড়ার চাঁড়াল বা কাপালিদের একাধিক স্ত্রীলোক তাঁহার তান্ত্রিক সাধনার সহায়িকা ছিল। বারুজীবী পাটিয়াল মাঝি, ডুলিদের গৃহে একাধিক পুত্রকন্যা চৌধুরীবংশের রক্তের গর্ব করিতে পারে। দাসী বাঁদীর সন্তানেরা তাই ত কর্তাদের ভরণপোষণের যোগ্য। তিনি পদ্মলাভ চৌধুরী—তিনি ত বুঝিতেই পারেন না স্ত্রীলোককে কি করিয়া ভয় করে পুরুষে ? কিন্তু একটা সন্তোষের কারণও তিনি পাইলেন :—সনাতন সেই বিধবা কুটুম্ব-কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। হিন্দু-বিধবা আচার ও ধর্মভ্রষ্ট হইলে পরম অকল্যাণ হয়। শাস্ত্র ও ধর্মের আর কি বাকি থাকে তখন ? বিশেষতঃ, পদ্মনাভ চৌধুরীর তাহাতে অপমান হইত। তিনি পদ্মনাভ চৌধুরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পক্ষ হইয়া প্রথম রাজা রাজবল্লভের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন

এই বিধবা-বিবাহের প্রশ্নেই। রাজা তাঁহার বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন—সে ছিল রাজার আদরের কনিষ্ঠা কন্যা। মাত্র সাত বৎসর বয়সে সে বিধবা হয়। রাজা তখন ঢাকায় খানখানান, তাঁহার প্রবল প্রতিপত্তি। তাঁহার চেষ্টায় বৈদ্যদের উপনয়ন সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। বৈদ্য-সমাজে তাঁহাকে বাধা দিবার কথাই উঠে না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজেই বা এই অঞ্চলে কে তাঁহার বিরোধিতা করিবে? বিক্রমপুর কোটালিপাড়ার পণ্ডিত-সমাজ প্রায় ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন—স্বর্ণ গাভী নির্মাণ করিয়া তাহার গর্ত্ত হইতে বাল-বিধবা কন্যাকে যদি ভূমিষ্ঠ করানো যায়, তাহা হইলে সে কন্যার পুনর্জন্ম হয়। তখন শাস্ত্রমতে সে বিবাহের সম্পূর্ণ যোগ্যা। —অবশ্য সেই স্বর্ণ গাভী পরে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হইবে। রাজবল্লভ প্রায় প্রস্তুত হইয়াছিলেন। খড়ের উপরে সোনার পালিশ দিলে কোনো গাভীর পক্ষে কন্যাপ্রসব অসম্ভব নয়। তারপর গাভীর ওজনে 'যথাসম্ভবং কাঞ্চন মূল্যং' রৌপ্যখণ্ডে বা তাম্রখণ্ডে পণ্ডিতদেব দিলেই হইত। 'বিদায়'-লোভী, ব্রহ্মত্র-ভোগী, আলো-চা'ল-কাচকলা ভোজ্য-প্রত্যাশী ব্রাহ্মণেরা ধর্মকে প্রায় ডুবাইতে বসিয়াছিল। তাহা রক্ষা পাইল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত ব্রাহ্মণ রাজা দেশে ছিলেন বলিয়া, পদ্মনাভের মত ব্রাহ্মণ জমিদার-জায়গীরদার, ভুঞা চৌধুরী এখনো আছে বলিয়া। নবদ্বীপ-ভট্টপল্লীর পণ্ডিত সমাজ তাই বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজও ভীত হইয়া পড়িলেন। আর রাজা রাজবল্লভ ও তাঁহার বৈদ্য অনুচরেরা বুঝিলেন—যতই উপবীত ধারণ করিয়া তাঁহারা অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হউন, এখনো ব্রাহ্মণই সমাজের কর্তা, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ব্রাহ্মণই হিন্দুজাতিকে শাসন করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের সেই বিরোধিতা কি রাজা বিস্মৃত হইয়াছেন? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা রাজবল্লভ দুইজনেই আজ ইংরেজের পক্ষীয়।

উভয়েই ইংরেজের বন্ধুত্বে একত্রিত, উভয়েই বুদ্ধিমান। কিন্তু পদ্মনাভ চৌধুরী সুযোগ হারাইয়া বড় দূরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য সনাতন সেই বিধবা কুটুম্ব-কন্যার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া তাহার পিতার নাম কীর্তিকেই সুরক্ষিত করিয়াছে। নবাব সরকার ত্যাগ করিয়াও সে অন্যায় করে নাই। বরং ইংরেজের কুঠির উকিল, মতসুদ্দি হইলেই এখন উন্নতির সম্ভাবনা।

কিন্তু সনাতন ইংরেজের চাকরি গ্রহণ করিবার জন্যও উদ্যোগী হইল না। দুই একদিন নীরবে পিতার উপদেশ শুনিল। তারপর বলিল: আমি গৃহেই থাকিব—এখানকার জমিজমা দেখিবার কথাই আপনি বলিয়াছেন।

শুরু পাটি-পাতা চৌকির উপরে আহ্নিক শেষে পদ্মনাভ তৃপ্ত গম্ভীর মুখে বসিয়াছিলেন। বলিলেন: তাহা বলিয়াছিলাম। এখন অন্য কথা বলিতেছি—এই জমি জমা ত আমিই দেখিতে পারিব।—ততক্ষণ তুমি অন্যত্র কাজ করো।

সনাতন নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকে। শেষে বলে: আমি গৃহেই থাকিব। এখানেই আমাকে কোনো কার্যভার দিন।

পদ্মনাভ বুঝিতেই পারেন না—কি ব্যাপার। সনাতন বিদায় হয়। চৌধুরী কর্ত্রী স্বহস্তে পূজার প্রভাতী ও চৌধুরী কর্তার পানীয় সরবৎ লইয়া অগ্রসর হইয়া আসেন! চৌধুরী কর্তার ঘটে কি এইটুকু বুদ্ধিও নাই—পুত্রকে প্রবাসে পাঠাইতে চাহেন। বধূমাতা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে, তাহার এখন মাতা হইবার মত বয়স। তাঁহাদের কি পৌত্র লাভের দিন হয় নাই?

পদ্মনাভ রহস্য-ভেদ করিতে পারিলেন। তাঁহার কেতাব-পড়া পুত্র বুঝি বয়ঃপ্রাপ্তা বধূকে ছাড়িয়া প্রবাসে থাকিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পদ্মনাভের পক্ষে ইহা হাস্যকর কথা।

ভূমিকা

পদ্মনাভ গম্ভীরভাবে কর্ত্রীর দিকে তাকাইলেন। একটা শব্দ হইল—হুঁ! চোখে হয়ত অবজ্ঞাও ফুটিয়া উঠিল। উহার সম্মুখে কর্ত্রী সঙ্কুচিতা হইলেন, যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হইলেন। প্রতিরক্ষার প্রথম চাল তিনি চালিলেন। পাথরের গ্লাসে মিছরির সরবত আগাইয়া দিলেন। পদ্মনাভ তাহা নিঃশেষ করিলে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী অর্থসূচক ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, কিছুদিন এখন গৃহেই সনাতনের থাকা উচিত—নানা গোলমাল সেই গৃহে। তারপর, সে পণ্ডিত মানুষ। দুই দিনে এখানে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তখন আবার লেখাপড়ার আকর্ষণে নিজেই শহরে যাইবার জন্য পাগল হইবে।

ঘরের স্ত্রী লইয়া মজিয়া থাকিতে চাহে সনাতন? সেই বিধবা যুবতীটাকেই তাহার বোধহয় ভয়। কর্ত্রীও এই ইঙ্গিতই করিলেন বুঝি? পদ্মনাভ মনে মনে কর্ত্রীর বুদ্ধিকে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এমন ভীত, স্ত্রৈণ, পুরুষ পারে কি প্রজাশাসন করিতে?

মনে না হউক, পদ্মনাভের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস ফুটিল: বেশ!

সনাতন চক্ষু মেলিয়া বসিয়া থাকে। প্রথমে আকাশ ছাইয়া মেঘ আসিয়াছিল। বজ্রে বজ্রে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিল। সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া নামিতেছে বর্ষা—মাঠঘাট একাকার হইয়া যাইবে। দক্ষিণ-পূর্ব কোন্ হইতে এক-একবার এক-একটা ঝাপ্‌টা ছুটিয়া আসে—বুনো ঘাস ও আগাছায় ঢাকা শঙ্কর দীঘির উঁচু পাড়ের উপর হইতে এপাড় বাহিয়া নামিয়া আসে, পূর্ব 'ফটকের' মাঠ ও খালের উপর দিয়া একেবারে চৌধুরী গৃহের অঙ্গনে। আকাশের পার হইতে কাহারা যেন কলধ্বনি তুলিয়া আসিতেছে—খালের জলে তাহাদের নৃত্যছন্দে প্রথম বুদ্বুদ ফুটিয়া উঠে

মৃত্তিকায় এবার পদপাতের শব্দ ওঠে। তারপর সিক্ত প্রাঙ্গণের শাদা মাটির উপরে একটু একটু করিয়া জল-কুণ্ডলী দেখা দেয়। তাহার উপরেও দেখা দেয় তেমনি নৃত্য-ছন্দ—বর্ষণপ্লাবিত প্রাঙ্গনের উপর দিয়া জল গড়াইয়া যায় 'জুলির' দিকে। এক-একবার এক-একটি ঝাপটার সঙ্গে যেন সেই ছন্দ পরিবর্তিত হয়। তাল বদল হয়, নূতন তাল আবার জাগে, নূতন নৃত্যের তীব্রতায় আসে দ্রুত লয়ের উন্মাদনা। ক্রমে দশদিক মেদুর আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মেঘ থম-থম আকাশের তলে পৃথিবীর এই অভিষেক,—গাছের পাতায় আর্দ্র গাঢ় শ্যামলিমা, দুর্বাদলের মাথায়-মাথায় টল-টল স্বচ্ছ বারিবিন্দু, কচু-পাতার উপর দিয়া গড়াইয়া পড়া মুক্তার গুটিকা, পৃথিবা-ছাওয়া এই ছায়াঘন বিরাম, প্রকৃতির আপন অন্তরে রহস্য-ঘন এই আত্ম-আলাপন—সনাতন চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে। দিনের পর দিন সে দেখে—বসিয়া বসিয়া দেখিতে থাকে। তারপর দেখিতে দেখিতে আর চোখেও কিছু দেখে না,—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কোণে কোণে এই বর্ষার শ্যামচ্ছায়া এক অচ্ছেদ্য অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে, একটা নিভৃতি আনিয়া দিয়াছে। সনাতনের চেতনার অন্তঃপুরে যে বিরাম, আপনার মধ্যে আপনাকে সংহত করিয়া লইবার যে অবকাশ সে খুঁজিতেছিল—তাহা বুঝি এই চিত্রিসারের শ্রাবণ-ধারা তাহাকে দান করিল। পৃথিবীর নিবিড়তম অবকাশ যেন তাহাকে টানিয়া কোলে লইতেছে—জননীর মমতা, সখীর প্রীতি-আর্দ্রতা, বধূর শান্ত একান্ত নির্ভরময় প্রেম—সবই ঢালিয়া দিয়াছে পল্লী-বর্ষার নিরুদ্বেল স্পর্শ। এই অলস আদরে সনাতন আপনাকে এলাইয়া দেয়।

বর্ষা শহরেও আসে। কিন্তু সেখানে ত বর্ষাকে দেখা যায় না। বাড়িতে বাড়িতে চোখের উপরে সতর্ক পাহারা বসাইয়া জাগিয়া থাকে শহর। সিপাহীর মতই উদ্ধত শ্রীহীন সেই শহরের ইটের পাহারা—

বেতন পায় না, উর্দি জোটে না, বক্সী দপ্তরের দুয়ারে হল্লা করে যে নবাব সিপাহী,—তারপর পথে, দোকানীর দোকানে, নিরীহ গৃহবাসীর গৃহে, চোখ রাঙাইয়া আপনার ক্ষমতা জাহির করে,—শ্রীহীন উদ্ধত সেই জাহাঙ্গীরনগরের নবাব সরকারের সিপাহীর মতই যেন অবহেলিত শ্রীহীন জাহাঙ্গীরানগরের চূণখসা, বালিখসা, পাঁজরা বাহির করা ইঁটের বাড়িঘর। অথবা, তাহা যেন ইঁটের দস্যুদল—দাঁত বাহির করিয়া আছে। আকাশের মুখ দেখিবার উপায় নাই। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা মাথার উপরে বিধাতার নিয়মে বৃথাই চলে। ঋতুচক্রের আবর্তনে দোলাইর খালেও সাড়া জাগে। বুড়ীগঙ্গার কণ্ঠেও কলধ্বনি ফোটে। শালবনের পার্শ্বে, সূফী ফকিরের আস্তানার দিকে শ্যাম ছায়াও বিছায় বর্ষা। কিন্তু শহরের গৃহে গৃহে জমে গুমোট,—সেখানে ছন্দ নাই, অবকাশ নাই। ভগ্ন প্রায় প্রাচীরের মধ্যে কর্মোত্তেজনা নিষ্ফল তেজে গর্জিতে থাকে—কাজী সফর আলীর মত;—বিশ্বের রহস্যময়ী সাকী, প্রেয়সী—বন্দিনীর বিক্ষোভে আপনাকে চিড়িয়া ফেলে—আপনাকে যেমন চিড়িয়া ফেলিতেছে কালিন্দী।

কালিন্দী!

ঝুলনের আসর হইতে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম সনাতনের সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনি মাত্র কীর্তন শেষ হইয়াছে,—রজনী দ্বিপ্রহরের দিকে,—আর কালিন্দী গৃহে ফিরিয়াছেন বণিকবধূ প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে প্রহরীবেষ্টিতা। সনাতনের ভাদ্রবধূ সে সম্পর্কে। তাহাদের বাক্যালাপের সম্পর্ক নয়, অবগুণ্ঠিত সম্ভ্রমের মৌন পরিচয়। বহির্দ্বারে করাঘাত শুনিয়া সনাতন উঠিয়া আসিয়াছে। তাঁহার পার্শ্বস্থ কক্ষের আসনে তখনো হাফিজের দেওয়ানী খোলা, চোখে তখনো তাঁহার শিরাজের গুলবাগ্—শাখ্-ই-নবাতের স্বপ্ন।

ভূমিকা

পিয়ারা শাহ্‌, ইঁহারই নেশায় মউজ্‌ হইয়া আছেন,

আগর আঁ তুর্কে শিরাজী বেদস্ত আরদ্‌ দিলে মারা।

বখালে হিন্দুয়শ্‌ বখ্‌শম্‌ সমরকন্দ্‌ ও বোখারারা॥

কোথায় লাগে বোখারা বা সমরকন্দ্‌ সেই রূপসীর গালের তিলের কাছে?

দ্বার খুলিয়া দিয়া আপন গালিচায় আবার সনাতন বসিয়াছে—কী সেই রহস্য যাহার তুলনায় কোথায় লাগে বোখারা, সমরকন্দ?—

সনাতন চোখ তুলিয়া দেখিল সম্মুখে—কালিন্দী! মুখে অবগুণ্ঠন নাই, আর চোখে একি রহস্য কাঁপিতেছে? ইরাণের সেই মদিরোজ্জ্বল তীব্রতা, 'শাখ-ই-নবাতের' সেই জুলফের রৌশনী, অধরের অগ্নিময় অনুভূতি মানুষের মুখে?

কালিন্দীর সমস্ত অন্তর তখনো কীর্তনের সুরে আকুলি-বিকুলি করিতেছে—

কুলিশ শত শত পাত-মোদিত

ময়ূর নাচত মাতিয়া।

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।

দৃপ্ত আনন, দৃপ্ত নয়ন, দৃপ্ত দেহভঙ্গী লইয়া ইরাণের কোন্‌ শিরাজী কন্যা এই বাঙালী শ্যামা রমণীর দেহে, গুরুকল্প বিধবা যুবতীর মধ্যে দীপ্যমানা?

না, এ কি অকল্পিত বিভ্রান্তি সনাতনের!

কিন্তু এ কি হইল! দুই চক্ষু উথুলাইয়া জল পড়িতেছে সেই দৃপ্ত শিরাজ-সুন্দরীর!

কালিন্দী দ্রুত দৃপ্তপদে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

সেদিন হইতে কালিন্দীর যে ভাবান্তর হইল তাহার রহস্ত সনাতনের পক্ষে গোপন নাই।

কালিন্দী প্রথম প্রথম আপনার মনেই গুন গুন করিত ;

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহকী

ফাটি যাওত ছাতিয়া।

তারপর, আর সময় নাই, অসময় নাই—সনাতন শুনিতে পায় একটা গুমরানো কান্না—'ফাটি যাওত ছাতিয়া—ফাটি যাওত ছাতিয়া।'

কিন্তু সনাতন তাহাকে চোখে দেখিতে পায় না।

আপনার মধ্যে আপনি ক্ষয় হইতে হইতে সনাতনের মনকেও কালিন্দী তখন শিরাজের দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও শাখ-ই-নবাতের স্বপ্ন হইতে টানিয়া আপনার চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবন, সম্পর্ক, পারিবেশ, বিরোধ, বিক্ষোভ, সকলের মধ্যে দাঁড় করাইল—এ কি জটিল নিষ্ঠুর সত্য ঘরে-বাহিরে চারিদিকে। শহরের পথে পথে বিক্ষুব্ধ সিপাহীর হল্লা, দৈন্যভরা নবাবী বিশৃঙ্খলা,পাইক পিয়াদার অস্বচ্ছন্দ্য, ইংরেজকুঠির সিপাহী-গোমস্তার দুঃসহ ঔদ্ধত্য,—বন্ধু সফর আলীর ক্ষুব্ধ, তীব্র ক্রমবর্ধিত উত্তেজনা। ওদিক গৃহাভ্যন্তরে পরিবার-চক্রের তীব্র ভৎর্সনা কালিন্দীর প্রতি ; কৌতুক, কৌতূহল অবজ্ঞা ভাবতন্ময় সনাতনের উদ্দেশ্যে। অসহ্য কঠিন জাহাঙ্গীরনগরের এই মুহূর্তের বায়ুমণ্ডল।

পিয়ারা শাহ্-এর আস্তানায় সেই সুফী-দরবারের মধ্যেও সনাতন আপনার মধ্যেকার স্থির মানুষটিকে আর উদ্ধার করিতে পারে না। চারিদিকেই গুমোট, গুমোট !

চিত্রিসারের বর্ষার দিকে সনাতন চাহিয়া থাকে। পল্লি-প্রকৃতি তাহার জ্বরতপ্ত ললাটের উপরে যেন মমতা-আর্দ্র হাতখানি রাখিয়াছে।

অন্তশ্চক্ষুও মুদিয়া আসিতেছে। বিশ্বের অন্তর্লক্ষ্মী—সেই সুফী-সাধনার রহস্যময়ী সাকী, হাফেজের শাখ্-ই-নবাত্—মেঘ-মেদুর সন্ধ্যায় গৃহ-প্রদীপের সম্মুখস্থিত শ্যাম-সুচিক্বণা ক্ষুদ্র গৃহবধূটির রূপেই যেন তাহার বুকের পার্শ্বে ঘেঁসিয়া আসিয়া শুইয়াছে। তাহার কোনোখানে উদ্বেলতা নাই, কোথাও তাহার দ্বিধা নাই। আপনার সহজ অধিকারেই সে তাহাকে একান্ত করিয়া লয়ঃ সে তাহার বধূ, সংসারসঙ্গিনী। জোর করিয়া নয়, কাড়াকাড়ি করিয়া নয়, বিচার-বিবেচনা কবিয়া নয় ;—ইহাই যেন স্বাভাবিক, ইহাই নিয়ম।—এই আকাশ, এই পল্লি-প্রকৃতি, এই শ্যামল বর্ষণ-স্নিগ্ধ গাছ-পাতা ও জল-টলমল কুমুদ-কেয়া-ফোটা মাঠ-ঘাট—ইহার মধ্যে উহার ব্যতিক্রমই হইতে পারে না। বধূ, সংসারসঙ্গিনী,—সুরা নয়, সাকী নয়, বুক-ফাটা কান্নাও নয় কোনো প্রণয়বিধুরার।

অমনি মনে পড়িল কালিন্দী!

আবার সনাতন নিজের পার্শ্বে তাকাইল। একান্ত-নির্ভরা বধূ অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখখানি সনাতনের বুকের পার্শ্বে গুঁজিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে বর্ষার সেই ঝর-ঝরানি গান—বিরহের সুর বনভূমি ছাইয়া আছে, ছাইয়া আছে পৃথিবীর বক্ষ ;—কিন্তু মিলনের মাধুর্য্য তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রেও এমনি সহজে স্বচ্ছন্দ গৃহশ্রীতে সংসার-যাত্রায় স্বতঃস্ফূর্ত!

তথাপি সনাতন চৌধুরীর মন ক্রমশই চিত্রিসারের পল্লিপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সুরটি হারাইয়া ফেলিতে থাকে। নীল আকাশে ও পৃথিবীর শ্যামলতায় তাহার মনে যে অবকাশ ও আশ্রয় প্রস্তুত করিয়াছিল, কাছারি বাড়িতে বসিতে গেলেই তাহা ভাঙিয়া যায়। সেখানে পদ্মনাভ চৌধুরী দোর্দণ্ড প্রতাপে এখন জমিদারী শাসনে উদ্যোগী।

ভূমিকা

বহুপুরুষ যে-সব আদায় আবওয়াবের কথা শোনে নাই, কিংবা শুনিলেও ভুলিয়া গিয়াছিল, শহর-ফেরতা পদ্মনাভ চৌধুরী এবার সমস্ত প্রজাদের নিকট হইতে সেই সব আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার মুখের ফার্সী বুলি, তাঁহার খানদানী চাল এবং তাঁহার প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়শীলতা—সব মিলাইয়া প্রথমাবধিই প্রজাদের সকলের মনে সম্ভ্রম ও আশঙ্কার উদ্রেক করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার উগ্রতা ক্রমশই বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্বেকার নিষ্কর ও নানকার প্রজাদের প্রত্যেকেরই উপর তিনি এক সূত্রে না একসূত্রে জমিদারী প্রাপ্য ধরিলেন, অথবা তাহা বাড়াইয়া তুলিলেন।

নাপিতেরা চৌধুরীদের কাজ করিবার কথা। তাঁতীদের সঙ্গে কথা ছিল ভুঞাদের কাপড় যোগাইবার। তিলিরা সেদিনও চৌধুরীদের তৈল যোগাইত। কৈবর্ত দাসেরা চৌধুরীদের ক্ষেত চাষ করিত। ঢালীরা অনেক দিনই পেয়াদা-বরকন্দাজের কাজ ছাড়িয়াছে, তথাপি চৌধুরীদেরই তাহারা সর্দার লাঠিয়াল, তাঁহাদের জমিই চাষ করে, আর সেই সর্দারের পরিচয়ে বিনা খাজনায় ও নামমাত্র খাজনায় চিত্রিসারের উৎকৃষ্ট জমি ভোগ করে। কামার, কুমার, সূত্রধর, তেলী, মালী, ঢুলী, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, বণিক,—এই ছত্রিশ জাতি যে ছোট বড় চৌধুরীকর্তাদের ধান, চাল, চিঁড়া, মুড়ি, দা, কুড়াল, হাল, হাঁড়িকুড়ী, ঘট-পট-প্রতিমা, তেল, দুধ-দই, বৎসরের যাবতীয় প্রয়োজন, জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণ জোগাইবার কথা। হাঁ, প্রথমাবধিই তাহাদের গ্রামের দশজনেরও কাজ করিবার কথা, তাহারা গ্রামের পরস্পরের জীবন-যাত্রার উপকরণ জোগাইত! কিন্তু ঐসূত্রেই ক্রমে তাঁহারা বাহিরের হাটবাজারে জিনিস বিক্রয় আরম্ভ করিয়া দেয়। ইদানীং চৌধুরী বাড়ির কাজও আর বিশেষ করিত না, বংশবৃদ্ধির সঙ্গে ভাগেযোগে যতটুকু করিবার তাহাই কখনো কখনো করিত। বেগার

খাটিবার কথা আছে ? ধরিতে পারিলে তাহা খাটিয়া দিত। কিন্তু তাহাতেও শিথিলতা আসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া, গঞ্জে-হাটে এখন জিনিস শুধু কড়িতে নয়, টাকায় বিক্রয়েরও রেওয়াজ হইয়া উঠিতেছে। ধোপা-নাপিতেরাও পর্যন্ত কাছাকাছি গাঁয়ে অন্য লোকদের কাজ করে। এতদিন ফসলে জিনিসে মূল্য গ্রহণ করিত, এখন নগদ দাম গ্রহণ করে। অথচ, যাঁহাদের তাহারা খায় পরে, যাঁহারা তাহাদের জমি দিয়া গ্রামে বসাইয়াছে, তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনা-বাজনা আর যেন বৃদ্ধি পাইবে না !

পদ্মনাভ এই প্রতারণাই বন্ধ করিবেন। তাঁহার খাল বিলের মাছ, তাহার জমির ধান, আখ, গুড়, মুড়ি, চিঁড়া, গাছগাছড়া, শাক-সব্জি, তাহার লাখেরাজভোগী কুমারের হাঁড়ি-কুড়ি, কলু তেলির তেল, গোয়ালার দুগ্ধ-দধি, তাঁহার এ পারের চৌকির মাশুল, খেয়ার মাল্লাহি, কামারের—এই সব তিনি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিবেন। হাঁ, তাঁতীর, ছুইয়ালের, পাটিয়ালের সূত্রধরের সাকরেদদের মুহ্ তরফাই বা তিনি আদায় করিবেন না কেন ? তাহার জমিতে তাঁহার আশ্রয়ে ইহারা বৃত্তি শিখিতেছে, তবে কেন দিবে না জমিদারকে সেলামী ? আড়ংএর গোমস্তারা দুই হাতে দাদনদারদের মারিয়া-পিটিয়া নিজেদের প্রাপ্য কড়াগণ্ডায় বুঝিয়া লয়। গঞ্জের হাটে তাহারা যে-কোনো সস্তা দামে জিনিস ক্রয় করে, চড়াদামে জিনিস বিক্রয় করে। সাধ্য কি ব্যবসায়ী বা কাজীদিগের নায়েব গোমস্তাদের যে তাহা না মানিয়া পারে। ধরিয়া-বাঁধিয়া চাষী, তাঁতী, ফড়িয়াদের কয়েদ করিতেও ছাড়ে না কুঠির দালাল ও সাহেবেরা। তাহাদের আদায় ফাঁকি দিতে সাহস করে না ত এই প্রজারা। কেন দিবে না তবে পদ্মনাভের প্রজারা পদ্মনাভের কাছারির কাজে বেগার ? দিবে না ইদে-দেওয়ালীতে উৎসবের পরবী খরচ—তিনিই কি খরচ কম করেন ? আর দস্তরি, তহশীলদারী কিংবা আদালতের জমিদারের

মুকদ্দমি খরচ ইহাই বা কেহ দিতে না চাহিলে তিনি তাহা শুনিবেন কেন? যদৃচ্ছা তাহা আদায় করে কাজীরা, আদায় করিতেছে এখন কুঠির গোমস্তাও। হাঁ, কি করিয়া জরিমানা আদায় করিতে হয় তিনি পদ্মনাভ চৌধুরীও তাহা জানেন। সাহস কি কেহ বলিবে—দিব না।

সনাতন জানে—ইহা আবওয়াব, ইহা অন্যায়। কিন্তু এই অন্যায়-বোধেরও সমর্থন আর সে বড় কোথাও পায় না। চিত্রিসারের মানুষ পদ্মনাভ চৌধুরীর হাঁক্-ডাক, জাঁক-জমকে তটস্থ। তাঁহার জমিদারী চালে, তাঁহার গর্জনে হুঙ্কারে, দুর্দান্ত শাসনে তাহারা বরং গর্বিত:—চৌধুরী কর্তা ডাক সাইটে জমিদার—এইবার কাজীপাড়া, মধ্যমগ্রামের লোকদের বড়াইএরও যথার্থ উত্তর দিতে পারিবে তাহারা চিত্রিসারের মানুষেরা। সনাতনের মনেই কেবল এক অন্যায়বোধ থাকিয়া-থাকিয়া পল্লি-প্রকৃতির সহজ সুরটিকে আঘাত করে; না হইলে বেশ স্বচ্ছন্দ ত ইহাদের সকলের জীবন।

জমিদারীর আদায়-ওয়াশিলের ভার পদ্মনাভ চৌধুরী সনাতনের হস্তে অর্পণ করিয়া কিছু পরেই নূতন হাট পত্তনের কাজে লাগিতে চাহিয়াছিলেন। পূর্বেকার দিন নাই। নওডাঁড়ার খালে যখন বার মাস নৌকা চলাচল করে, পদ্মার সর্বনাশী স্রোত যখন শুধু দূরের গ্রাম গ্রাস করে নাই, সাধারণ নৌকার যাতায়াত বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে, 'বড়খাল' যখন এখন প্রকাণ্ড একটা নদীতে পরিণত, দিনের পর দিন লোক বৃদ্ধি, যাতায়াত বৃদ্ধি, ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিসপত্র লইয়া যোগীজোলা, কামার, কুম্ভার, কাঁসারী, শাঁখারী হইতে চাষী, বারুই সকলের যখন এত ছুটাছুটি বাড়িতেছে, তখন নওডাঁড়া ও বড়খালের মুখে ওই গোচারণের মাঠটায়

একটা হাট বসাইলে তাহা যে জমিয়া যাইবে ইহাতে পদ্মনাভের সন্দেহ নাই। পদ্মনাভ চৌধুরীর বিশ্বাস আছে, শক্তি আছে। এবং তিনি জানেন—কৌশলও প্রয়োজন। কারণ, ইলশাজারির 'হাজারী হাট' আজ একটা ভালো গঞ্জ। চিত্রিসার কালচিতার চাষী ও পশারীরা জিনিসপত্র লইয়া সেখানে ছোটে। সেই ফজু কাজীর দিন হইতে নবাবী সেরেস্তায় নানা ছলে কাজীরা সেই হাটের অর্ধেকের মালিক। এখন অবশ্য তাহাদেরও অনেক সরিক। তথাপি তাঁহারা স্বার্থনাশের ভয়ে চৌধুরীদের হাটে আপত্তি করিবেন। তাই কৌশলও পদ্মনাভের প্রয়োজন।

কিন্তু হাট বসাইতে হইলে গোচারণের জমিটাও পদ্মনাভের প্রয়োজন। পদ্মনাভ প্রথমে উহার কিয়দংশ জমি ঘিরিয়া গোয়ালাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন—তাহারা জাত গোপ, তাহাদের গরু ওখানে চরিবে। তবে তাহারা নূতন হাটে দধি-দই বিক্রয় করিবে। অবশ্য সেই জন্য রোজানা দিতে হইবে। পরে সেই জমির এক কোণে একঘর মোদক, একঘর কুমার, একঘর কলুও পদ্মনাভ বসাইলেন। ইহাদের না হইলে হাট জমিবে কিরূপে? ঢালীপাড়া ও দাসপাড়ার প্রজারা প্রথমেই আপত্তি জানাইয়াছিল—তাহাদের গরু মহিষ এখন চরিবে কোথায়? পদ্মনাভ বলিলেন: দেখিতেছি। কিন্তু গোয়ালাদের গরু চরানো আরও বেশি প্রয়োজন—তাহাদের হিংসা করো কেন? এবারও পদ্মনাভ আপত্তি উড়াইয়া দিলেন: নিজেদের স্বার্থ নিজেরা বুঝে না এই মূর্খরা। এখন ধান লইয়া, চ'াল লইয়া তাহারা হাজারী হাটে বিক্রয় করিতে গেলে, তাহাদিগের নিকট হইতে চৌকিদার পথে চৌকি আদায় করে। পরে তাহাদিগকে তহ্-ই-বাজারি দিতে হয়। থানাদার, চৌকিদার, পিয়াদার, জুলুম পদে পদে। আর এখানে গ্রামের হাটে গ্রামের চাষী, গৃহস্থ, গোয়ালা, কামার,

তিলি-তাম্বলী, ম্যায়, অনাথা বিধবারা পর্যন্ত চরকার সুতা, শাকসব্জী বিক্রয় করিয়া বাঁচিবে।

ঢালীরা ও দাসেরা সনাতনকে ধরিয়া বসিল : ছোট হুজুর, একটা প্রতিকার করুন্। গরুগুলি কোথায় চরিবে?

সনাতন পদ্মনাভকে বলিলেন : গোচারণ ভূমির জন্য প্রজারা আপত্তি করিতেছে। উহা দখল করা অসঙ্গত হইবে।

পদ্মনাভ বিরক্ত হইলেন। —মাঠের ধারে দল ঘাস জন্মে, উহারা তাহা কাটিয়া গরু বাছুরকে খাওয়ায়। আমি আপত্তি করি? নূতন কোথাও জমি বন্দোবস্ত করিয়া লয় না কেন? আমার কাছে আসুক বজ্জাতরা, দেখিব।

পদ্মনাভ বুঝিলেন সনাতন ক্ষুণ্ন হইতেছে। একবারের মত তাই তিনি তাহাকে সান্ত্বনাও দিলেন : জানি, মাঠটা না জব্‌ত করিলেই ভালো হইত। কিন্তু হাটের পক্ষে উহা প্রয়োজন। আর হাট বসিলে উহাদেরই উপকার হইবে—আমি ত বাজারীদের তিন বৎসরের তহ্‌ মাফ করিয়া দিতেছি।

সনাতন তথাপি সন্তুষ্ট হইল না। পদ্মনাভ চৌধুরী তাই আশ্বস্ত বোধ করেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সনাতন, তাঁহার গর্ব। ফার্সিতে সত্যই আলেমদার। কিন্তু তাহাকে ফকিরী নেশায় পাইলে চলিবে কেন? বিষয় রক্ষা করিবে কিরূপে?

অন্দরে পদ্মনাভ অন্তরালস্থ পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া বলেন : যেমন তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী, বউমা, কেহ মা বলিতেই অজ্ঞান,—তেমনি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র! নামজাদা মুন্সি, কেহ না চাহিতেই মাপ্‌। বিষয় সম্পত্তি তোমাদেরই দেখিতে হইবে। উহাকে দিয়া মক্তব-মাদ্রাসা চালান যাইবে, জমিদারী চলিবে না।

ভূমিকা

কর্ত্রী-ঠাকুরাণী আপত্তি করিয়া উত্তর দেন: দুঃখী গরীবকে দুটি খাওয়াইলে পরাইলে, আর দুই পয়সা খাজনা মাপ দিলেই তোমার বিষয়-সম্পত্তি যাইবে না। ভগবান দিয়াছেন বলিয়াই ত দুই মুষ্টি উহাদেরও তুমি দিতে পারিতেছ।

—আমি আর কি দিই! তবে সারা পরগণার মানুষ বলে বটে—চৌধুরীর মত দেওয়ায় থোয়ায় কোনো মানুষ নাই? কে দেখিয়াছে পূজায় এত বিদায়, প্রণামী; গ্রামের সকল জাতের নিমন্ত্রণ উৎসব? যে আন্‌তে জানে, সে-ই হাত ভরিয়া দিতেও জানে। ইহা ফকিরের কাজ নয়।

নিঃশব্দ শয়ন-কক্ষে দীপ নিবিয়া গিয়াছে। বধূর বা সনাতনের চোখ কাহারও আর দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। কিন্তু দুই জনারই তাহা মনে জাগিতেছে। সনাতন অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার ব্যথিত বিষণ্ণ দৃষ্টি বধূর অন্তরতলে নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

সনাতন ঢাকা পরিত্যাগ করিবার পরে সংবাদ আসে—কালিন্দী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রথম সময়ে-অসময়ে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইত, গোপীনাথজীর মন্দিরে গিয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু এখন সে একেবারে উন্মাদিনী। এবং যাহা সে বলে তাহা শুনিয়া এই দূরে বসিয়াও সনাতন এখনো স্বস্তি বোধ করে না। মনে হয়—তাহার বুঝি নিস্তার নাই। বধূ তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বধূ তাই বলিলেন, —তুমি কেন ভাবিত হও। তুমি ত নিষ্পাপ।

সনাতন বলে: কাহার পাপ কোথায় তাহা ত বুঝি না।

বধূ শান্তস্বরে বলেন: পাপ মনে। বিধবা হইয়া এরূপ কুচিন্তা মনে স্থান দিতে হয়?

ভূমিকা

কোথায় যেন একটা দূরত্বের প্রাচীর দুই জনার মধ্যে। সনাতন ভাবে—কুচিন্তার স্থান ইচ্ছা করিয়া মনে কে দেয়? মানুষ নিজে কি তাহার চিন্তাকে বাধা দিতে পারে? বিধবা বলিয়াই কি কেহ পারে আপনার মনকে শাসন করিতে? শত মুনি-ঋষি পারেন নাই; স্বামী-পুত্রবতীরাও কত জনে পারেন না। বরং বিধবা যে, সে ত আরও অসহায়। একা, নিরলম্ব,—তাহারই যে একটা আশ্রয় চাই—একথা কেন কেহ বুঝিতে চাহে না।

বধূ বলিলেন: বুঝিয়াই বা আমরা কে কি উপায় করিব? তুমিই বা কি উপায় করিতে পার? —ধীরে ধীরে পরে বলিলেন: রাজা রাজবল্লভও পারিলেন না। ইহা যে জন্মজন্মান্তরের লিখন! —তারপর আবার: বিধাতা যেন তাহাকে শাস্তি দেন।

না, সেই দূরত্ব কঠিন নয়। সহিষ্ণু একটি সহৃদয় মনের স্পর্শও সনাতন অনুভব করে। কালিন্দীকে সনাতন অপরাধিনী বলিয়া ভাবিতে না; কিন্তু কালিন্দীকে সে ভয় করে, বিষম ভয় করে। তাহার নিকট হইতে সনাতন আত্মগোপন করিতে চায়। হাঁ, তাহাকে বিস্মৃতও হইতে চায় - কোথায় যেন কোন দুর্বার শক্তি তাহাকে টানিয়া লইবে। কিন্তু অন্তরের সেই ভয়কে সহজ দরদ দিয়া দ্বিতীয় কেহ বুঝিয়া না লইলে সনাতন যে অন্তরেও নিজেকে একাকী বোধ করে।

সনাতন অবশ্য তাহার একান্ত নির্ভর-পরায়ণা বধূর নিকট সেই নিশ্চয়তাবোধ সম্পূর্ণ পায় না। কিন্তু তথাপি আশা ও আশ্বাস পায় এই গৃহ কোণেই। বাহিরের পৃথিবী যে তাহাকে আরও বিভ্রান্ত, আরও দিশাহারা করিয়া তোলে। পদ্মনাভ চৌধুরীর কাছারিবাড়ি তাহার নিকট মনে হয় পররাজ্য, পরদেশ।

বধূ তাহাতে বলেন: তুমি অত লেখাপড়া জানো, আর জমিদারীর কাজ পারিবে না ?

সনাতন বলিল: ভগবান জানেন, আমি চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। কিন্তু এই জমিদারী ব্যবস্থা সম্ভবত আমি বুঝি না। না হইলে কেন মনে হয়—এই সব আদায় আবওয়াব, ইহা অন্যায়।

আবার সে নীরব হয়। আশ্বাস দিয়া বধূ বলিলেন: যাহা অন্যায় তাহা তুমি করিও না। কিন্তু অত ভাবিও না। কেন ভাব তুমি দিনরাত ? বিষয়কর্মে একবার মনোযোগ দাও, অত না ভাবিয়া কাজে ব্যাপৃত হও। দুই দিনেই সব বুঝিতে পারিবে।

নিস্তব্ধ রাত্রিতে মনে হয়, ইহাই সত্য। সে কাজে ব্যাপৃত হইবে, দুই দিনেই সব বুঝিতে পারিবে, কোনো অস্বস্তিই তাহাকে আর পীড়া দিবে না। সংকুচিত মন সত্যই আরাম ফিরিয়া পায়, বধূর একান্ত বিশ্বাসের মধ্য দিয়া সনাতন চারিদিকের পরিবার পরিবেশের সহিত আপনার বন্ধনও যেন স্বীকার করিতে বাধা পায় না। দিনের আলোকে কিন্তু সনাতনের সেই স্বস্তি আর অটুট থাকে না। চারিদিকের লোকজন, জীবন-যাত্রা যেন অন্য সুরে বাঁধা। বেলা বাড়ে, কাছারিবাড়ি যাইবার বেলা হয়, সনাতনের মন দ্বিধায় ভারাক্রান্ত হইতে থাকে। তবু সে কাছারি বাড়িতে গিয়া বসে আবার বিষয় কর্মের কথা শোনে—প্রজা-রায়তের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী—এত ভার তাহারা বহন করিতে পারে না। কেবলই অনুনয় বিনয়, ককুতি-মিনতি, করুণা প্রার্থনা, হতাশা, অসহায়ের আপত্তি। সনাতন নিজেও যেন বোঝে—প্রেম বুঝি পৃথিবীতে আর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এই পৃথিবীতে জোর থাকিলেই মানুষ জুলুম করে। একদিন জুলুমের ভিত্তি সম্ভবত এত বড় ছিল না,

অল্পই ছিল। তারপর যে আসিয়াছে, সে-ই জুলুম বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বাড়িয়া বাড়িয়া আজ তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

পরম অস্বস্তিকর এই চিন্তা।

সনাতন অপরাহ্ণের অপেক্ষায় তাই ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। তখন বাহির হয় মাঠের মধ্য দিয়া ভ্রমণে। আপনার মধ্যে আপনার জিজ্ঞাসা তখনি—সেই মাঠের মধ্যে, ক্ষেতের আলে, বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায়, দূরের মাঠে ডুবিয়া-যাওয়া সূর্যের অভায়,—চলিতে চলিতে একটা শান্ত স্থিরতা লাভ করে। তারপর সনাতন প্রায়ই মাঠ বাহিয়া গিয়া পীরের টিবিতে উঠে। ফুল শাহ্ ফকির সেখানে কয় বৎসর পূর্বে আসিয়া আস্তানা বাঁধিয়াছেন। গরীব হিন্দু মুসলমান কেন, কাজীবাড়ির ও চৌধুরীবাড়ির লোকেরাও তাঁহাকে মান্য করে, তাঁহার দোয়া যাজ্ঞা করে। সম্ভবতঃ তিনি সূফী, কিন্তু তাঁহার পরিচয় জানা যায় না—চিস্তি বা কোনো সম্প্রদায়ের তিনি নামও করেন না। ফার্সিতে তাঁহার দখল অসাধারণ। কিন্তু হিন্দুস্থানের সাধারণ ভাষাতেই তিনি দোহা ও গান আবৃত্তি করেন। খুশীতে মন ভরিয়া উঠিলে কাহাকেও একটি ফুল দেন। উহাতে নাকি সৌভাগ্যের শেষ থাকে না। আর, তাঁহাকে খুশী করিতে চাহিলে মানুষও অন্য যাহা দিক না দিক দেয় ফুল। ফুল শাহ বলেন—প্রেমের দান। এ পৃথিবীতে প্রেমই আসল বস্তু—প্রেমই ভগবানের নিঃশ্বাস, মানুষের একমাত্র জোর।

সনাতন জানিতে চাহে : তবে বেদনা কেন, দুঃখ কেন, জুলুম কেন ?

ফুল শাহ্ হাসিয়া বলেন : আসল জোর নাই বলিয়া।

—জোর নাই বলিয়া ? জোর বাড়িয়া বাড়িয়া চারিদিকে জুলুম হইয়া উঠিয়াছে।

ফুল শাহ্ হাসিয়া বলেন : তাহা হয় না। বীজের জোর বাড়িয়া

ভূমিকা

অঙ্কুর হয়, গাছ হয়, হয় ফুল, তারপর ফল। প্রাণের জোর বাড়িয়া বাড়িয়া আস্থা হয়, আশ্বাস হয়, হয় প্রেম, শেষে মিলন।

ফুল লইয়া ফিরিয়া আসে সনাতন। বীজ কবে ফুল হইবে? কিন্তু তাহার প্রাণে সেই আসল জোর কোথায় যে এই আস্থা সে লাভ করিবে?

কাছারি বাড়িতে বসিয়া বসিয়া সনাতন সমস্ত হদিস আবার হারাইয়া ফেলে। গৃহকোণে মনে হয়—সব স্নিগ্ধ; মাঠে বাহির হইলে তাহার মনে হয়—সমস্ত সুন্দর। হেমন্তের আভাস লাগিয়াছে আকাশের গায়ে—একটু সামান্য কুয়াশার রেখা গ্রাম-সীমান্তে গাছের অগ্রভাগে কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে। বিলের মাঠে এখনো কুমুদকহ্লার ম্লান হইয়া যায় নাই। ঘাসের ডগায় অদৃশ্যপ্রায় মুক্তাবিন্দুর মত জলকণা—এখনো খুবই ক্ষুদ্র। মাঠভরা শস্যের শ্যামল সতেজ আভা দিনে দিনে হিরণ্যহরিতের আভায় পরিণত হইতেছে। পাখীর ঝাঁক এদিক হইতে ওদিকে উড়িয়া যায়—লোকান্তর যাত্রী মানুষের স্বপ্নের মত। সনাতন দেখে, দেখিয়া যেন শান্ত হয় মন, প্রাণ স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু কাছারি বাড়িতে বসিলে সব চিড় খাইতে থাকে।

গদাই দত্ত বলিল: ছোট হুজুরকে নালিশ জানা।

সনাতন চমকিয়া উঠে। কি ভাবিতেছিল সে? মন স্থির করিয়া শুনিতে থাকে—গোরাইর চষা ক্ষেতের ধানে সবে রঙ ধরিতেছে। গোরাই শেখ গরীব, ছোট বিঘা দুই জমির চাষী। বৎসরের খোরাকও হয় না। সেই ক্ষেতে ঘাসু ঢালী তাহার গরু ষাঁড় ছাড়িয়া দিয়াছে—অন্ততঃ দেড় মণ ধান নিঃশেষ!

সনাতন জিজ্ঞাসা করে: ঘাসু দেখিল না?

—দেখে না—ইচ্ছা করিয়া। বলে, মাঠ জলে ভরা। গোচারণের মাঠ জমিদাররা ঘেরাও করিয়া লইয়াছেন। গরুগুলি ঘাস পায় না।

সনাতন চমকিত হইয়া উঠিল। বুঝিল না গোরাইকে কি বলিবে। একবার গদাই দত্তকে জিজ্ঞাসা করিল: নায়েব মশায় কি করা যায়?

গদাই হাসিয়া বলিল: ঘাসুর গরুতে যদি তাহার ক্ষেত উজাড় করে, তাহার নিজের ফসল নিজে সে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে গোরাই গিয়া ঘাস খাউক। ব্যাটা আহাম্মক!

গোরাই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল: হুজুর জানেন, ঘাসুর সঙ্গে কেহ পারে না। ঢালি পাড়ার শেখেরা সব এক দল। শাহ্ ফকিরের শিষ্য।

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে পারিল না। পদ্মনাভ কাছারি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। পিছনে দুই চারিজন অনুগত লোক, হাটের বিষয়ে কথা হইতেছিল।

গদাই নায়েব দাঁড়াইয়া উঠিতে উঠিতে গোরাইকে বলিল: দলকেই যদি অত ডর, তবে তাহাদের নিকটেই যা, হুজুরের কাছারি বাড়িতে নালিশ করিতে আসিস্ কেন?

পদ্মনাভ শুনিয়াছিলেন, বলিলেন: কি ব্যাপার, নায়েব?

গদাই দত্ত হুজুরে ব্যাপারটা নিবেদন করিল। সনাতন সংকুচিত হইয়া পড়িল। তথাপি না বলিয়া পারিল না: চাষীরা গরুবাছুরের ঘাস জোগাইতে এখন আর পারে না। তাই গরু বলদ না বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়।

পদ্মনাভ বলিলেন, হুঁ, হাটের একটা জায়গায় একটা খোঁয়াড় তৈয়ারী করিতে হইবে। না হইলে কাহারও ক্ষেতের ফসল বাঁচিবে না—ইহাদের জুলুমে।

ভূমিকা

পদ্মনাভ বরকন্দাজ পাঠাইলেন : ঘাসুকে ধরিয়া লইয়া আয়। এইমাত্র ব্যাটাকে দেখিয়া আসিয়াছি বিলের ধারে, টঙের উপর বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াও নামে না। অবশ্য শেষে নামিয়া অন্যদিকে গেল— পাছে আদাব দিতে হয় জমিদারকে। জাল ফেলে যানে-জুলিতে, কিন্তু জলকর দেয় কি জমিদারের কাছারিতে ?

—কোথায় আর দেয় ?

দুর্বৃত্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ ঘাসু। গদাই দত্ত ও পদ্মনাভ চৌধুরীতে সেই কথাই হইতেছিল। মাত্র বৎসর খানেক আগে জোয়ান মরদ দেখিয়া বেণী গোমস্তা তাহাকে হাজারী হাটের কোম্পানির কুঠির দরওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিল। কি কথায় কথা কাটাকাটি হইতে বেণীকেই তাড়া করিয়া গিয়াছিল ঘাসু ঢালী। গোমস্তা তখন পালাইয়া বাঁচে। কেহ বলে চড়-চাপড়ও খাইয়াছিল, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। এই ঢালী পাড়া, দাস পাড়ার মানুষগুলি বড় বেশি বদমায়েস হইয়াছে। চৌধুরীদেরই লাখেরাজ খায় এখনো অনেকে, তবু কী উহাদের বেয়াদবী ! —নূতন কাছারির কাজে একটা খড-কুটাও নজর দিবে না। বলে, 'জমিদারের কাছারিতে আমাদের কাজটা কি ?'

সনাতন অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। সে আর বসিয়া থাকিতে চাহে না। কিন্তু উত্থানের চেষ্টা করিতেই পদ্মনাভ বলিলেন : বসো, তোমাকেই প্রয়োজন। তাহার পরে বলিলেন : হাট বসাইব আমার জমিতে আমি। কিন্তু কাজীবাড়ির লাল মিঞা বলিয়া পাঠাইয়াছেন— কাজীরা এখানে হাট বসিতে দিবে না। বলে, 'নবাব সরকারের হুকুম নাই'। কাজী সফর আলী ঢাকায় আছে, তাই উহাদের এত দাপট। কিন্তু নবাব সরকারের জোর কত তাহাও আমি জানি। আমি গুরুপদকে বলিয়াছি, হাজারি হাটের আড়ংএর গোমস্তা বেণী চন্দের সঙ্গেও আমার

কথা হইয়াছে। নিমকের ব্যবসা রস্ সাহেব এক চেটিয়া করিতে চাহে—কাজীদের সঙ্গে তাই তাহার গোলমাল। আমার জমিদারীতে আমি হাট বসাইব, তাহাতে কাজীদেরই বা কি, নবাবেরই বা কি ? তুমি জনার্দনকে লেখো—ভেট লইয়া সরকারে দেখা করিতে ; কুঠির সাহেবদের মুন্সি গোমস্তার সহিতও ঢাকায় কথাবার্তা বলিতে। এদিকে তুমি সফর আলীকেও ফার্সিতে মোলায়েম করিয়া লেখো ত—হাজারী হাটের কোনো ক্ষতি যাহাতে না হয়, আমরা তাহার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

সনাতন শুনিতেছিল, কেমন বিপন্ন বোধ করিল। কাজীরা সহজে ছাড়িবার মত লোক নন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেরই অবস্থা খারাপ। মেয়ে ও দৌহিত্র বংশ জমিদারীতে ভাগ বসাইয়াছে। বাঁদীদের গর্ভের ছেলেরাও এক আধ পাই-এর অধিকার লাভ করিয়াছে। বংশের ছোট বড় সবারই এখন ভয়ানক ক্ষুধা। আমীরী আছে, আমদানী নাই, তাই সকলেই অত্যাচারী। একমাত্র সফর আলী অন্যরূপ মানুষ, কিন্তু তিনিও নিজেদের বিপদ বুঝেন। আর তাহা ছাড়া, নবাব সরকারের অর্থের নিদারুণ টানাটানি। যে-ই নবাব হউক কোম্পানির নিকট তাহার ধার ও কোম্পানিকে প্রদত্ত তাহার ইনাম মিটাইয়া দিতেই সরকারী ভাণ্ডার শূন্য হয়। এই অবস্থায় চৌধুরীরা এখানে হাট বসাইলে সফর আলীও নবাবী পাওনা একটা কিছু নিশ্চয়ই দাবী করিবেন। ইংরেজ কুঠিয়ালরা হাটে গঞ্জে ব্যবসাপত্রে কোনো মাশুলই দেয় না। সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা তাই ক্ষতি হয়। এখন আবার তাহারা তামাক, পান, সুপারি, নিমকের ব্যবসাও হস্তগত করিতেছে। তাই আমদানী রপ্তানীর মাশুল আদায়ের ত কথাই নাই, ক্রয়-বিক্রয়, চুঙ্গি, চৌকি, রাহাদারি হইতে মুহুগুরফা, বলাদস্তি প্রভৃতি আবওয়াব নবাব সরকার বেপরোয়া আদায় করিতেছে। মানুষের সর্বনাশ।

ভূমিকা

সনাতন কি লিখিবেন—কলম লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ঘাসু ঢালী কাছারিবাড়ির প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোলা বরকন্দাজ তাহার হাত ধরিয়া আগে আগে আসিয়াছে—যেন মানুষটাকে জোর করিয়া টানিয়া না আনিলে সে আসিত না। অথচ দেখিলেই বুঝা যায়, ভোলা বরকন্দাজের পক্ষে অন্তত ঘাসু শেখকে টানিয়া আনা সম্ভব নয়। কালো কুচকুচে কাঠিন্য দেহে, পেশল, বলিষ্ঠ, ঋজুতা। মাথায় গামছা বাঁধা, জলকাদা মাখা গা, ভেজা ছোট বস্ত্র শক্ত করিয়া আঁটা। চোখে জিজ্ঞাসার অনিশ্চয়তা, কিন্তু ভীতি-ভাবনা নাই। প্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্ব অনাচ্ছন্ন।

সনাতন চাহিয়া দেখিল—নূতন মানুষ ঠেকিল তাহার চক্ষে।

গোরাই শেখ নালিশ করিল। কিন্তু ঘাসুর চোখের দিকে তাকাইয়া বলিতে পারিল না, যে ঘাসু তাহার গোরু-বলদ ইচ্ছা করিয়াই গোরাইর ক্ষেতে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

নায়েব ধমক দিল: ছোট হজুরকে যে বলি ঘাসু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোর ক্ষেতের ফসল খাওয়াইছে? বলত, হজুরের কাছারিতে ভয় কি —সত্য কথা বলিতে?

কিন্তু ভরসা পাইয়াও গোরাই মিথ্যা বলিতে পারিল না। স্বীকার করিল সে তখন ঘাসুকে দেখিতে পায় নাই, তবে এইরূপই শুনিয়াছে অন্যদের মুখে।

ঘাসু জানাইল—গোরুগুলিকে মাঠের ঘাস দিয়া সে ক্ষেত বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সেই দল-ঘাস উহারা ছুঁইতে চাহে না। ঘাস খাইতে পায় না—চরিবার মত মাঠ কই আর? তাই দড়ি ছিঁড়িয়া এই কাণ্ড করিয়া থাকিবে। বোবা জীব, ক্ষুধার তাড়নায় কি করিবে?

পদ্মনাভ বলিলেন : ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিবে। ঢালীদের গরু—দল ঘাস খায় কি করিয়া ? কাঁচা ধান না হইলে উহাদের রুচিবে কেন ?

ঘাসু কি বলিতে গিয়া আত্মসংবরণ করিল। কিন্তু ভয়ার্ত হইল না। সনাতনের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। কি একটা কিছু ঘটিয়া না গেলে যেন সে বাঁচিয়া যায়।

ঘাসু বলিল : আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, হুজুর। আমি গোরাইকে তাহার ফসল বুঝাইয়া দিব। ফসল পাকুক, আমার ক্ষেতও আছে। দুই জনায় এক সঙ্গে কাজ করিয়া বুঝিয়া পড়িয়া লইব। পঞ্চায়েতে কথা দিবে—আমরা খাইলে গোরাইও না খাইয়া থাকিবে না।

পঞ্চায়েৎ আছে, থাকুক। কিন্তু জমিদারের এজলাসে অন্যায়ের বিচার ত তাই বলিয়া বন্ধ থাকিবে না। পদ্মনাভ বিচার করিলেন—আধমন ধান ঘাসুর জরিমানা। উহার পনের সের পাইবে গোরাই, পাঁচ সের সরকারের গোলায় জমা। গোরাইকে কিন্তু নাক কান মলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—ভবিষ্যতে নিজের ক্ষেতের ধান সে নিজে রক্ষা করিবে।

ঘাসু দাঁড়াইয়া রহিল।

পদ্মনাভ অন্য কাজে মন দিলেন। তাকাইয়া দেখিলেনও না। তারপর উঠিয়া বিষয়ান্তরে চলিলেন।

নায়েব বলিব : কি ঢালীর পো, দাঁড়াইয়া যে ?

—হুজুরেরা বিচার করিলেন। পঞ্চায়েতের কথায় কান দিলেন না। যদি জরিমানাই হয়, জরিমানার ধান গোরাইকেই দিন্। আবার হুজুর কেন তাহাতে ভাগ বসান।

—বজ্জাত ত তুই কম নহিস্। আদালতের খরচ দিবি না ?

—কাজীর আদালত, জমিদারের আদালত, এই সবের ত দরকার

না। ছিল পঞ্চায়েতেই এই ব্যাপার মীমাংসা করিয়া দিত, খরচও চাহিত না।

—বেশ, জমিদারকে খরচ না দিয়া যদি পারিস, ছাখ না তবে না দিয়া। —বিদ্রূপের বক্রস্বর গদাই দত্তের।

একবার ঘাস্থ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার নিজেকে সম্বরণ করিল। কাছারি বাড়িতে উপবিষ্ট সনাতনের দিকে তাকাইল—কি যেন সে বুঝিল। তারপর তাহার মুখেও ব্যঙ্গের হাসি ফুটিল : ওঃ! জোর-জুলুমের কথা বলিতেছেন। তাহাই বলুন। আপনাদের জোর আছে, জুলুম করিবেন। আমাদের জোর যখন কম, তখন আমাদেরই হইবে জরিমানা।

সনাতনের মাথা যেন নুইয়া পড়ে—জোর থাকিলেই দুর্বলের উপর জুলুম করিতে হইবে। দুর্বলের অপরাধ—সে দুর্বল। 'জোর যার মুলুক তার।'

ঘাস্থ চলিয়া গেল। কিন্তু একটা মানুষ যেন সনাতন চৌধুরীর জীবনকে নাড়া দিয়া গেল—শুধু তাহার নির্ভীক দৃষ্টির দ্বারা।

ঘাস্থ ঢালীর নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা কিন্তু সহজসাধ্য হইত না। কাজীপাড়ার কাজীরা পুরুষানুক্রমে এখন নিজেদের এই অঞ্চলের কাজী বলিয়া দাবী করেন—এক কালের নবাব সরকার হইতে তাহাদের একজন এইরূপ সনদ পাইয়াছিল। সেই দাবীতে তাহারাই এই অঞ্চলের সাধারণ বিচারের অধিকারী। চৌধুরী হাটের পত্তন বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে চৌধুরীদের মতান্তর ঘটিয়াছে। তাই লালমিঞা

কাজী জানাইলেন—মামলার বিচার কাজীদের এক্তিয়ার। পদ্মনাভ চৌধুরী যেন ঘাসুর নিকট হইতে জরিমানা আদায়ে বিরত থাকেন। ঢালীপাড়ার পঞ্চায়েতও এই সুযোগে জানাইল—গোরাই ও ঘাসুর নালিশের আপোষ-রফা তাহারাই করিয়া দিয়াছে। গোরাই'র আর নালিশ নাই। —পদ্মনাভ কাহারও কথা গ্রাহ্য করিবেন না।

ঘাসুরা ফুল শাহ্‌এর অনুগত। কাজী সাহেবদের নির্দেশানুযায়ী মসজিদের মোল্লা তাহাদের হুকুম করিয়াছিল—কাজীদের নিকট শরণ লইতে। কিন্তু ফকিরের আস্তানায় ফুল শাহ্‌-এর নিকট পরামর্শ না করিয়া ঢালীরা পারে না। ফুল শাহ তাহাদের সকল সমস্যারই পরামর্শদাতা। অন্তত চাহেন না চাহেন তাঁহাকে 'দোয়া' করিতেই হয়।

সনাতনও তখন ফুলশাহের দরবারে উপস্থিত। ফুল শাহ্‌ ঢালীদের বলিলেন: জমি-জমার ব্যাপার আমি করিব কি? তোমাদের পঞ্চায়েত আছে—কাজী আছে।

কিন্তু ঘাসু ছাড়িবে না। বলিল: করিব আমরাই। কিন্তু কি করিব, তাহা বলুন। আর দোয়া করুন্‌।

— দোয়া করিবার মলিকও তিনিই যিনি আশমান্‌ জমিনের মালিক।

ঘাসু বলিল: আশমানের তিনিই মালিক, তাহা বুঝি। কিন্তু জমিনের মালিক যে আজ তিনি নন, তাহা ত স্পষ্ট দেখিতেছি।

—জমিনের মালিকও তিনিই যিনি জমিন পয়দা করিয়াছেন। আর ফসলের মালিক তাহারা যাহারা তাঁহার মর্জিতে ফসল পয়দা করে।

—তাহা হইলে কে জমিদার কে রাজা? কে রাজা, কে প্রজা?

সনাতন পূর্বেও এই প্রশ্ন শুনিয়াছে। ঢাকায় বসিয়া তখন মুহূর্তে মুহূর্তে দেখিতেছিল—কে প্রজা, কে রায়ত, কে ফসল বুনিল, কে জিনিস গড়িল,

কিছুরই ঠিকানা নাই। কোনো গোমস্তা কাড়িয়া লয়—জমিদারের জন্য, কোনো গোমস্তা কাড়িয়া লয় নবাব সরকারের নামে, আবার কোনো আড়ংএর গোমস্তা আসিয়া তাহা দখল করিতেছে কুঠির দাদনের জোরে —কে যে মালিক তাহা কে বলিবে? পূর্বে পিয়ারা শাহ্‌ও বলিতেন—'দুনিয়াদার এক; তিনি প্রেমিক। কিন্তু তাঁহার গোমস্তার পীড়নেই দুনিয়ার দুর্দশা। মালিককে যদি হাত করিতে পার, তবে এই গোমস্তা ও পিয়াদাদের কি ভয়?'—তখন পর্যন্ত এই উত্তরই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখন এই উত্তর যেন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে না। পরিষ্কার প্রশ্ন —কাহাকে দিবে মালিকের বখরা ঘাসু ঢালী? কেহই ত পয়দা করিয়া মালিক নয়—চৌধুরীরাও নয়, কাজীরাও নয়। তারপর, পঞ্চায়েতের মীমাংসা যদি গোরাই ও ঘাসুর গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে কে ইহারা? হাঁ, কে ই বা সে সনাতন চৌধুরী—পদ্মনাভ চৌধুরীর পুত্র?

ঘাসু ঢালী বুঝিয়া লইয়াছে—মালিক এক। মানুষ তাঁহারই রাজ্যের প্রজা। তাহারা ঢালী, ঢাল-সড়কি লইয়া তাহারা সে রাজার রাজ্যই রক্ষা করিবে,—এই বেইমানের আর বজ্জাতের রাজ্য নয়।

ঢালী পাড়া এক জোটেই ছিল। এবার অন্যেরাও জোট বাঁধিল—জরিমানা ও আব্‌ওয়াবের বিরুদ্ধে আপত্তিতে।

কিন্তু ততক্ষণ দূরের আকাশে ঘনঘটা করিয়াছে। কোম্পানির দস্তকের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কুঠির প্রত্যেকটি সাহেব বিনা মাশুলে আপন-আপন ব্যবসা ফাঁদিয়াছিল; তাহাতে মীর কাশিমের সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। অধিকন্তু পূর্বে যেই সব স্থলে কোম্পানিরও বিনা মাশুলে ব্যবসায়ের কোনো অধিকার ছিল না, এখন সেই সব

স্থলেও প্রত্যেকটি সাহেব পর্যন্ত বিনা মাশুলে ব্যবসা চালাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রত্যেকটি গোমস্তা, দালাল পাইকারও দেশ জুড়িয়া কদর্য উৎপীড়নের জাল ফেলিয়াছে। এখন প্রত্যেকটি অঞ্চলে এইসব কুঠির কর্মচারীরাই নবাবের থানাদার, কাজী, আমিলকে ও জমিদার, ওয়াদাদার-দিগকে ক্ষমতায় ছাড়াইয়া যাইতেছে। যেমন তাহাদের মুনিব সাহেবরা, তেমনি তাহারা—অর্থগৃধ্নু, নৃশংস, জুলুমবাজ। নব-নব উপায়ে প্রতিদিন কুঠির লোকেরা এখানে 'কিছু' ওখানে 'বাজরা' প্রভৃতি আদায় করে, —অর্থগ্রাসে নিরঙ্কুশ, ঔদ্ধত্যে উন্মাদ।

অকস্মাৎ কাজী সফর আলী লক্ষ্মীপুর চট্টগ্রামের পথে হাজারি হাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ডাক-চৌকির দারোগা, কিছুই তাঁহার অগোচর ছিল না। দেওয়ান-ফৌজাদাররাও বুঝিতেছিল—সংকট সন্নিকট। ঢাকার ও লক্ষ্মীপুরের কুঠির জবরদস্তি বিশেষ করিয়া ঢাকার দেওয়ানকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

হাজারি হাটের গঞ্জে কাজীরা সাহস করিয়া বলিয়াছিল—তাহারা বিনা মাশুলে বেলি সাহেবের নৌকা ছাড়িবে না, থাকুক তাহাতে কোম্পানির নিশান। তাহাতে বেলি পাইক পাঠাইয়া কাজীদের সিপাহীকে তাড়াইয়া দেয়। গঞ্জে কোম্পানির গুটি পনের সিপাহী আসিয়া বেলির গুদাম রক্ষায় মোতায়েন হয়। রস ও বেলি সাহেবের গোমস্তা হরনাথ সেন এবং কোম্পানির বেণী চন্দ্‌ গোমস্তা চোখের উপর তূলা, তামাক, লৌহ যত চড়া দরে ইচ্ছা এখন বিক্রয় করিতেছে; অন্যদের সস্তা দামে বিক্রয় করিবার সাহস নাই। গোমস্তরা বাকী দামের জন্য কাহারও মাল জব্দ করিতেছে। ছোট একআধজন ক্রেতাকে কয়েদ করিতেছে। বেণী গোমস্তার কথায় গুরুপদ ও হরনাথ সেন চিত্রিসার-কালচিতার তিন ঘর তাঁতী ও জোলাকে গ্রেপ্তার করিতে গেল। খবর পাইয়া যাদুর নেতৃত্বে দাসেরা ও ঢালীরা

জহিরুদ্দীন পাইকারকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। তখন ক্রুদ্ধ বেলি সিপাহীর সাহায্যে যোগীদের গ্রেপ্তার করিল, গঞ্জের গুদামে তাহাদের আটক রাখিল। তাহাদের পরিবার কাঁদিয়ে পড়িল পদ্মনাভ চৌধুরীর নিকট—'আপনি আমাদের গ্রামের রাজা, আমাদের রক্ষা করুন্।'

পদ্মনাভ চুপ করিয়া শোনেন—ঢালী ও দাসেদের বড় সাহস হইয়াছিল; খুব পঞ্চায়েত করিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্বে। অবশ্য হরনাথ সেনটারও সাহস বাড়িয়াছে—বেলির জোরে তাঁহার প্রজাদের কয়েদ করে। পদ্মনাভ বলেন: তোরা আমার হাটে দোকান খোল,—হাজারি হাটের গঞ্জে যাস না। আমি বেণী চন্দকে বলিয়া এবারকার মত তোদের মুক্তির ব্যবস্থা করিব। দেখি কালচিতার হরনাথের কত সাহস। কিন্তু দাদন মত কাপড় না দিলে, তুলার দাম বাজারে যেরূপ তাহা না দিলে, কুঠির সাহেবরাই বা ছাড়িবে কেন? —অর্থাৎ হরনাথকে পদ্মনাভের শাসন করিতে হইবে, কিন্তু বেলি সাহেবের মনস্তুষ্টি করিয়া। বেণী চন্দ বা গুরুপদকেও তিনি চটাইবেন না।

তাঁতীরা বলিতে চাহিল—তুলার এই দামই যে ন্যায়সঙ্গত নয়। রস সাহেব তুলা জোগায়,—মোগল, আর্মানী প্রভৃতি ব্যবসায়ীদিগকে আর তাহা জোগাইতে দেয় না,—তাই আমাদের মত গরীবের এখন সর্বনাশ।

কিন্তু পদ্মনাভ তাহার কি উপায় করিবেন? বেণী চন্দর সঙ্গে বরং তাহার কথা পাকা হইয়া আছে—তাহাদের পাইকের সহায়তায় এই সুযোগে ঢালীপাড়া ও দাসপাড়াও পদ্মনাভ সুশাসিত করিবেন। অবশ্য কালচিতায় হরনাথ সেন যাহাতে বেলি সাহেবের গোমস্তারূপে আর মাথা না তুলিতে পারে তাহাও পদ্মনাভের দেখিতে হইবে। সেদিকেও তাহার সহায় হইবে বেণী—সে-ই কোম্পানির আসল গোমস্তা; বলিতে গেলে ভাবী জমিদার।

ভূমিকা

এমন সময় সফর আলী সেই গঞ্জে আসিলেন। সনাতনকে পূর্বেই তিনি সংবাদ দিয়াছিলেন। পদ্মনাভ বুঝিলেন হাটের ব্যাপারে তাঁহারও তলব পড়িবে। তাই, সনাতনের সহিত তিনিও স্বয়ং প্রথমেই চলিলেন হাজারি হাটের ঘাটে সফরের বজরায় দেখা করিতে। পদ্মনাভ কিছুই ক্রটী করিলেন না—দরবারি চোগাচাপকান আঁটিয়াছেন, নজরানা আনিয়াছেন, ভেট সঙ্গে লইয়াছেন। কিন্তু ইলশাজারিতে পৌঁছিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন—সরকারি বজরায় সমারোহ নাই। বাজারী, ব্যাপারী, দোকানী-পশারীর ভেট-বক্রী, পেশকাশ, রুখ-শাতানা, ইত্যাদি আদায়ের ব্যস্ততা ও ছুটাছুটি নাই,—চারিদিকে যেন একটা বিস্ময় ও ত্রাস, সিপাহী ও পিয়াদার জমায়েত। রস ও বেলির গোমস্তা হরনাথ সেন একপার্শে সিপাহী পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছে। গুরুপদ দাস বজরার বাহিরে ভেট লইয়া দাঁড়াইয়া, বুঝা যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু তবু হাল ছাড়িতেছে না। জহিরুদ্দীন পাইকার পালাইয়াছে। কুঠির সিপাহীরা কুঠির গুদাম ছাড়িয়া বাহির হয় না,—বেণী গোমস্তা কোম্পানীর সিপাহীদের সাবধান করিয়া দিয়াছে। পদ্মনাভের অবস্থাটা বুঝিতে দেরী হইল না—গেমেস্তা পাইকার দালালদের উপর সফর বরাবরই খড়্গহস্ত। পদ্মনাভ প্রস্তুত হইলেন।

কাজী সফর আলী সনাতন ও পদ্মনাভকে সসম্মানে সম্বর্ধনা করিলেন। বুঝা যায়—সনাতনের সহিত তাঁহার হৃদ্যতার অভাব নাই। পদ্মনাভের প্রতিও সম্মান প্রদর্শনে ক্রটী হইল না, কিন্তু বুঝা যায় কোথাও একটা ব্যবধানও আছে।

সফর আলী কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পদ্মনাভকে বলিলেন—আপনার প্রজা-রায়ৎদের আপনি রক্ষা করিতেছেন না কেন? কোথাকার যত বাণিয়া আর দাগাবাজদের উপর ছাড়িয়া দিতেছেন উহাদের ভার।

পদ্মনাভ অমনি বলিলেন: আমাদের ক্ষমতা কি যে রক্ষা করি?

ভূমিকা

সেদিন কি আর আছে? আমাদের তাঁতী, আমাদের বারুজীবী আজ আমাদের জিনিস জোগায় না; দাদন ও নগদ দামের লোভে আমাদের সঙ্গে দাগাবাজি করিতেছে। আর, পরিণামে নিজেরাও ডুবিতেছে। নবাব সরকার যদি জমিদার, ওয়াদাদারদের ক্ষমতা, মর্যাদা রক্ষা করিতে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে কি করিয়া আমরাই বা নবাব সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখি?—চোখেই ত দেখিতেছেন সব।

কাজী সফর আলী একবার নীরব হইলেন। পরে বলিলেন: নবাব সরকার আপনাদের জমিদারী ও ক্ষমতায় হস্তার্পণ করেন নাই, করিবেনও না। আপনারা সে বিষয়ে আশ্বস্ত হউন। আপনারা সকলে একত্রিত হউন সরকারের অধীনে।

পদ্মনাভ বলিলেন: সত্য কথা বলিয়াছেন। কিন্তু একত্রিত কে হইবে? একটা প্রজাকে বেইমানি বা বেয়াদবির জন্য শাসন করিতে গেলে অমনি সে জমাদার, ডিহিদার, কাজী, ক্রোরী, কাহারও না কাহারও একজনার নিকট আস্কারা পায়। না হয় পঞ্চায়েতের দোহাই পাড়ে। শেষ পর্যন্ত গিয়া কুঠিতে, আড়ংএ ওঠে।

কাজী এবার স্পষ্ট ভাবে বলিলেন: তাই ত বলিতেছি—আপনারা একত্রিত হউন। না হইলে আপনাদেরই দুর্দিন। বাণিয়ার হাতে আপনাদের সকলের মান-সম্পদ খোয়াইতে হইবে।

সফর জানাইল ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া, পাটনা, উড়িষ্যা সর্বত্র কোম্পানির সাহেব ও উহার গোমাস্তারা জমিদার, জায়গীরদারদের বেদখল করিয়া রাজ্যের মুনিব হইয়া বসিতেছে। তাজপুরের জমিদার হীরামনের পেশকারকে মালদহের কুঠির এলিস্ সাহেব সিপাহী দিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে—সোরার রপ্তানি এক চেটিয়া করিয়া ওদিকে যেখানে সেখানে উহারা কুঠি বসাইতেছে। এদিকে শিলেটের কুঠির গোমস্তা চন্দ্রমণি ও

খোজা মস্‌কট অন্য ব্যাপারীদের নিমক বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে, নিমকের দাম বাড়াইয়া কুঠির লোকেরা অত্যাচারের একশেষ করিতেছে। দেখুন, জমিদার দুর্লভরাম পর্যন্ত মালগুজারী দিতে না পারিয়া ইহাদের অত্যাচারে বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়াছেন।

তাহার পর কথাটা একেবারে পরিষ্কার করিতেও সফর আলীর বিলম্ব হইল না।—হাঁ, পদ্মনাভ চৌধুরী হাট বসাইবেন চিত্রিসারে। বেশ, নবাবের আপত্তি নাই। কিন্তু সেই হাটে কুঠির সাহেবদের নৌকারও মাশুল দিতে হইবে, যেমন এখন হইতে হাজারি হাটে দিতে হইবে। নিমক, পান ও সুপারির ব্যবসা করিবার পরোয়ানা কোম্পানির কোনো কালে নাই—সে ব্যবসা তাহাদের বন্ধ করিতে হইবে। সেইজন্যই লক্ষ্মীপুর চলিয়াছেন সফর। আর এই বেলির মত সাহেবদের তুলা লোহার এই একচেটিয়া জবরদস্তি কোথাও বরদাস্ত করা চলিবে না—ইলশাজারিতেও না, চৌধুরীর হাটেও না।

পদ্মনাভ সুচতুর। তিনি কহিলেন: সরকার সাহায্য করিলে তাহা আর বন্ধ করিতে কতক্ষণ? বরং উহাতে জমিদারের ও দোকানী পশারীর সকলেরই লাভ।

সফর আলী কিন্তু ক্রমশ উত্তেজিত হইতেছিলেন। গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বলিবেন: সরকার সাহায্য করিবে। কিন্তু আপনারা নিজেরাও প্রস্তুত হউন। —একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন: মধ্যমগ্রামের কথা জানি না। কিন্তু কাজীপাড়ার সঙ্গে কোনো বিবাদ আপনার থাকিবে না। এই ইলশাজারির গঞ্জ:—সরকারি তুমার দেখিয়াছি—উহা ছিল পাঠান ইলিয়াশ হাজারির জায়গীর। সে জায়গীর মিটাইয়া দিয়া তোডর মল তনখায় জমা ধার্য করিয়াছিলেন। জৌনপুরী হাজারীরা কবেই সব খোয়াইয়াছে। এখন আমরা শিরহিন্দী কাজীরাই গঞ্জের মালিক। তবু এই গঞ্জে কুঠির সাহেবরা

সিপাহী-পাইক বসাইতে সাহস করে—সিরহিন্দী কাজীরা থাকিতে? আমি সফর আলী জীবিত থাকিতে; আপনি পদ্মনাভ চৌধুরী দেশে থাকিতে? সনাতন থাকিতে আপনার পার্শ্বে?

চোখ জলিয়া উঠিয়াছে সফরের। মাথায় পাগড়ী, মেহদি রঞ্জিত শ্মশ্রু-গুম্ফ, করতল। পদ্মনাভ বিস্মিত হইয়াছিলেন—কাজীবংশ তাহাকে এত সহজে অধিকার ছাড়িয়া দিল? এখন তিনি দেখিলেন—কী একটা কঠিন জ্বালায় সফর আলী প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। পদ্মনাভ বুঝিলেন—এত যে আত্মবিস্মৃত, নিজের স্বার্থ পর্যন্ত এত সহজে পরিত্যাগ করিতেছে,—তাহার ভবিষ্যৎ শুভ নয়। কিন্তু তাঁহার পক্ষে ইহা আপাতত সুসংবাদ যে, পদ্মনাভ হাট বসাইতে বাধা পাইবেন না। কাজীরা তাঁহার বিরোধিতা করিবেন না।

সনাতনের সহিত সফরের আলাপ হইল নিভৃতে।

সংকট ঘনাইয়া আসিতেছে। নবাব মীর কাশেম আর যাহাই হউন বানিয়ার বেইমানী সহ্য করিতে পারিবেন না। সফর ডাক-চৌকির দারোগা; সব সংবাদ না-হউক, গুরুতর সংবাদ সবই তিনি পান। পাটনা-মুঙ্গের হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সর্বত্র নবাবের ফৌজের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কাশিমবাজার হইতে লক্ষ্মীপুর-চট্টগ্রাম, এদিকে মালদহ পর্যন্ত সর্বত্র ইংরেজ কুঠিয়ালের ঔদ্ধত্যও অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। সনাতন কি করিতেছে? —সম্মুখে অনেক কাজ।

সনাতন জানায়: জমিদার, জমাদার, কাজী, ক্রোরী, আমিল-মাতসুদ্দি—সকলের অত্যাচারে পীড়নে প্রজা-রায়ৎ অতিষ্ঠ। অবিচার অত্যাচারের হাত হইতে নবাব সরকার প্রজাদের রক্ষা না করিলে তাহাদের পথ কি?

সফর বলিলেন : কাহার অত্যাচারের কথা বলিতেছ ? নবাব সরকার ত প্রজাদের উৎপীড়ন করিতে চাহে না।

—চাহে না ; কিন্তু তবু করে, তাহা সহ্য করে। যে আদায় আবওয়াব বাদশাহের ফরমানে বহুদিন নিষিদ্ধ তাহাও আদায় হইতেছে। বরং তাহা দিনে দিনে বাড়িতেছে।

সফর স্বীকার করিলেন, কিন্তু অক্ষমতার হতাশায় ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন : ঠিক। কিন্তু সরকারের যে আর কোনো রূপ আমদানীর উপায় এখন নাই ; বাণিয়ারা রাজস্ব লুঠিয়া লইতেছে। মুর্শিদাবাদের নবাব ভাণ্ডরের ধনরত্ন মাণিক্য জাহাজবোঝাই বিলাত যাইতেছে। বাণিয়াদের দূর কর। —জমিদার জায়গীরদার আমাদের সকলে একত্র হইতে হইবে এই উদ্দেশ্যে।

—কিন্তু রায়তজন যে জমিদার-জায়গীরদারের আব্ওয়াব-আদায়ে উৎপীড়নেও ধৈর্যহারা—সেই অত্যাচার ও সহিতে পারে না।

সফর বুঝিলেন, কিন্তু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন : বলিয়াছি—তাহাও জানি। কিন্তু প্রজা-রায়তের এই মুর্খতায় আজ কর্ণপাত করিবার সময় নাই। আমীর-ওম্রাহ, রাজা-জায়গীরদার সকলকে চটাইয়া নবাব সিরাজৌদ্দলা নিজের রাজ্য বনিয়াদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। সেই ভুল আবার না করিয়া আজ জমিদার-জায়গীরদার সকলকে একত্র করিয়া বাণিয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের একত্র হইতে হইবে। এখন জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তদের তুমি উৎসাহ দিলে সর্বনাশ হইবে। জমিদাররা কুঠিয়াল আর এই গোমস্তাদের সঙ্গেই যোগ দিবে। মধ্যমগ্রামের গুপ্তদের মতই চৌধুরীরাও তখন ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

সনাতন সফরের কথার ইঙ্গিত বুঝিল। ইহাও বুঝিল, পদ্মনাভ চৌধুরীর মনোভাব সফরের অবিদিত নাই। কেমন লজ্জাবোধ হইল,

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া তাহা অস্বীকার করিতেও পারিল না। না, সনাতন অন্তত সেই অমর্যাদার পথে পা বাড়াইবে না। সে ইজ্জত বোঝে, সে সফর আলীর বন্ধু। সে রহিবে তাহার পার্শ্বে।

সফর আলী তাহাকে জানাইলেন: দেওয়ান আর সহ্য করিতে পারেন না। আমি চলিয়াছি লক্ষ্মীপুরে। কুঠির গোমস্তরা সেখানে তালুকদারদের তালুক জোর করিয়া দখল করিয়াছে, তহশীলদারকে খাজনাও দেয় না। ফিরিঙ্গি ও দেশী সিপাহী দিয়া গ্রামে উৎপাত শুরু করিয়াছে, 'চৌকি' বসাইয়াছে, অন্য রায়তদের ঘরের জিনিসপত্র ক্রোক করিয়া নিলাম করিতেছে। যেখানে সেখানে শিবেলিয়ের সাহেব নূতন কুঠি বসায়, বাজার বাসায়, সিপাহী দিয়া লোকজনকে গ্রেফতার করিয়া আনে, জরিমানা করে। ইহাদের অত্যাচারে মানুষ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইতেছে। হাট, ঘাট, পরগণা উৎসন্ন গেল। ইংরেজের অত্যাচার বন্ধ না করিলে প্রজারায়তের সর্বনাশ। লক্ষ্মীপুর চট্টগ্রাম হইতে আমি ঢাকা ফিরিয়া আসিতেছি; এ অঞ্চলের জমিদার জায়গীরদার সকলকে এইবার একত্রিত করিতে হইবে।

সনাতন বলিল: যে প্রজা-রায়ত এত উৎপীড়িত, তাহাদেরও সেই সঙ্গে একত্র করুন।

সফর আলী আবার বিরক্ত হন: তাহারা কি করিবে? লুঠতরাজ—এইমাত্র। আমাদের লড়াই করা প্রয়োজন। এই সব প্রজা যুদ্ধের কি জানে?

সফর চলিয়া গিয়াছে। পদ্মনাভ সনাতনকে সাবধান করিয়া দিলেন: সফর আলী বিষম পথে পা বাড়াইয়াছে,—হয়ত সে দেওয়ান-

ফৌজদার হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে উন্মাদ—তাহার চোখে-মুখে উন্মাদের লক্ষণ সুস্পষ্ট। তবে যাহাই সে হউক, আমার ক্ষমতায় সে হস্তার্পণ করে নাই, তাহার সহিত আমিও বিবাদ করিব না। কিন্তু তুমি কি মনে করিয়াছ—আমি তাই বলিয়া কুঠির সাহেব বা তাহাদের গোমস্তাদের সঙ্গেই বিবাদ করিব? এত মূর্খও আমি নই। আজ না হয় সফর আলী হাজারি হাটে কুঠির ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া গেল। কিন্তু কাল যে এই তাঁতী, এই বারুই, এই দোকানী-পশারীরাই আবার কুঠির সাহেবদের দাদন চাহিবে, মালপত্র খুঁজিবে।—সাহেবেরা আমদানী-রপ্তানী বন্ধ করিলে এই সব পাইকার দালালরাই শুধু নয়, ব্যবসায়ী, দোকানীরাও কান্নাকাটি জুড়িয়া দিবে।

সনাতন বলিতে চাহিল: কিন্তু সাহেবরা ও তাহাদের গোমস্তারা যে আজ দেশের রাজা হইয়া বসিতেছে।

—তবে তাহাদের সঙ্গে বিরোধ করিব কেন? কুঠির গোমস্তাদের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমার প্রজা-রায়তের, আমার জমিদারীরই দুর্দশার একশেষ হইবে।

—না হইলে যে কোম্পানিই রাজ্য দখল করিবে। কুটির সাহেব ও গোমস্তারা দেশ ছারখার করিবে।

—তুমি 'রাজ্য' 'রাজ্য' বলো; কিন্তু কাহার রাজ্য? দিল্লীর বাদশাহের, না, মুর্শিদাবাদের নবাবের, তাহার ঠিক নাই। আজ কে বাদশাহ, কে কাল নবাব, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। রাজ্য তবে কাহার?

এই সংকটকালে সনাতন এই প্রশ্নের উত্তর নিজের মনে মনে একরূপ বুঝিয়া লইয়াছিল,—ফুল শাহ্ উঁহার পথপ্রদর্শক। সে তাহাই বলিল: সমস্ত রাজ্যই ভগবানের। তিনি যেই দেশে যাঁহাদের পয়দা করিয়াছেন, সেই দেশ তাঁহাদেরই রাজ্য।

পদ্মনাভ কথাটা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন না,—সনাতনেরও নিজের ধারণা নিজের নিকট অস্পষ্ট। পদ্মনাভ তাই এই কথা অনুমোদন করিয়াই কহিলেন ঃ তাহা সত্য। ভগবানের কৃপায় আমরা চৌধুরীরা আমাদের জায়গীর-জমিদারী লাভ করিয়াছি। এই রাজ্য আমাদেরই। এই প্রজা-রায়তকে আমিই রক্ষা করিব, পালন করিব, শাসন করিব। সেই শক্তিও আমার আছে। তারপর সাম, দান, দণ্ড, ভেদ,—অবস্থা-অনুরূপ সব নীতিই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি সাবধানে থাকিও। আমার আদেশ—গোলমালে যাইও না। —বরং, তুমি এখন পড়াশুনা করো। বিদ্যালঙ্কার বলিতেছিলেন—তুমি সংস্কৃতে কাব্য ও অলঙ্কারে নাকি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছ। বেশ, তুমি শাস্ত্র চর্চা করো—এই সময়ে তোমাকে কাছারিবাড়িতে বসিতে হইবে না।

কাছারি বাড়ি হইতে সনাতনের বিসর্জন হইয়া গেল।

বধূ সহজ ভাবে বলিলেন,—তাহাতে আর কি? তিনি পিতা। আর চৌধুরী ঠাকুর—বাঘের মত মানুষ। তিনি বর্তমানে জমিদারীতে তোমরা কথা বলিতে যাইবে কেন? তোমরা বরং তাঁহার কথা মত চলিবে। তোমরাও ত চাণক্য শ্লোকে পড়িয়াছ—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ।

সনাতন পড়িয়াছে। সত্য বলিয়াও তাহা মানে। কিন্তু সত্যই কি ইহাই ধর্ম? —নীরবে প্রজা-রাতের এইরূপ দুর্দশা দেখা। নিশ্চেষ্টভাবে দেখা—বিদেশী, দুর্বৃত্ত বাণিয়ারা রাজ্য অধিকার করে, দেশ ছারখার করে। তবে কেন ভগবান্ কুরুক্ষেত্রে কৌরব-ধ্বংসে উদ্যোগী হইলেন? যদুবংশের ধ্বংসও অনুমোদন করিলেন?

বিদ্যালঙ্কার সনাতনের এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তিনি কাব্য ও

দর্শনের বিচার জানেন, ভক্তিশাস্ত্রের নির্দেশ জানেন—আর জানেন—

ধর্মস্য তত্ত্বঃ নিহিতো গুহায়াং।

সনাতনের চিন্তাভারাক্রান্ত মুখের দিকে চাহিয়া বধূ বলেন:—সব কথাতেই তুমি বড় বেশি ভাবো। কি ভাবিতেছ অত বলো ত? ন্যায়ের কোনো তর্ক বুঝি?

সনাতনের চমক ভাঙিয়া যায়। বলে: ভাবিতেছি—ধর্ম কি?

—বাঃ! তাহাও আবার ভাবিতে হয় নাকি?

—হয় না? বেশ, তুমিই বলো তবে—ধর্ম কি?

—তুমি তোমার কাজ করো—তাহাই তোমার ধর্ম।

সহজ হৃদয়ের সহজ কথা। এই সহজ কথাতেই সনাতন যেন আলোক রেখা দেখিতে পায়—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে।

সনাতন বলিল: তবে সে বলিলে পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ?

—তাহা ত সত্য কথাই। কিন্তু সেদিনও মহাভারত বুঝাইয়া বলিতেছিলেন পাঠক ঠাকুব। ভীষ্মদেব বলিলেন, 'যাহাতে সকল মানুষের প্রভাব বা উন্নতি, সব ভূতের হিত, তাহাই ধর্ম।' তারপর, তুমি জমিদার বংশের ছেলে, তোমাদের ধর্ম দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।

'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'—সনাতন বধূব মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল: জানি না কোথায় শেষ। কিসে সকলের প্রভব তাহা জানি। কিন্তু চারিদিকে দুষ্টেরই আজ জয়।

সহজকণ্ঠে বধূ বলিলেন: সে কি হয়? ভগবান্ তাহা বেশি দিন সহ্য করেন না।

সনাতনের নিজের মনের কথাই যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই আশ্বাসের জন্যই বুঝি সে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার সরল হৃদয়া বধূ না বুঝিয়াও উহাই তাহাকে জোগাইল।

ভূমিকা

রাত্রি প্রভাতেই সনাতন ফুল শাহ-এর নিকট উপস্থিত। দেখিয়া ফুল শাহ্ খুশী হইয়া উঠিলেন। দোহা তৎক্ষণাৎ রচনা করিলেন: রাত ভরিয়া তাহার জন্য কথা গাঁথিলাম পত্রে, আর দুয়ার খুলিতেই এখন দেখি রাজপুত্র দ্বারে।

সনাতন হাসিয়া বলিল: কারণ, রাজপুত্র আজ রাজ্যহারা।

ফুল শাহ্ সব শুনিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। পরে চোখও জ্বলিল: আল্লার দেওয়া নিমক, জানো, তাহাও আজ এ রাজ্যের লোকে পায় না। কোম্পানি তাহাও একচেটিয়া করিয়াছে, দাম চড়াইয়া দিতেছে। এ যে মানুষ মারিবার ব্যবসা বানিয়াদের!

পরে বলিলেন—সফর ইমানদার;—গাজীর মতই কথা সে বলিতেছে। কিন্তু বড় ভুলও সে করিতেছে। কাল যাসু আসিয়াছিল। কাজী বাড়ীর সাহেবরা তাহাদিগকে দাবাইয়া দিতেছে'। কুঠি ও গোমস্তার অত্যাচারে এই মানুষগুলি জর্জর। ইহারা লড়াই না করিলে নসরার বিরুদ্ধে কাহাকে লইয়া লড়াই করিবেন সফর আলী? তুমি সফরের নিকটে যাও।এই কথা তাহাকে বুঝাও।

সনাতন জানে—সফর আলী ইহা বুঝিতে চাহিবে না।

—না বুঝিলে চলিবে না। তুমি তাঁহাকে সৎ পরামর্শ দাও।

ফুল শাহ্ সনাতনকে বিদায় দিলেন: "হাফেজ জানিতেন না— রাত্রি শেষে কাহার মাথা মশানে লুটাইবে, কে হইবে আবার বাদশাহ্। দুনিয়ার এপার-ওপার অন্ধকারে একাকার। কিন্তু পাগল হাফেজ জানিতেন প্রেমই জয়ী হয়। ফকির ফুল শাহ্ বলে ছাখো—রাত্রির গর্ভে জন্ম লয় দিন। বাহিরিয়া আসে নূতন নূর। গোলাপ ফুটিবে, বুলবুল তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

হাজারি হাটের গঞ্জে কাজীরা কিছুদিনের মত কুঠির গুদাম বন্ধ রহিল। কারণ, অন্যত্র তখন গুরুতর ঘটনা ঘটিতেছে। লক্ষ্মীপুর চট্টগ্রামের, প্রত্যেক চৌকিতে কুঠির সাহেবদের মালশুদ্ধ নৌকা আটক হইল। আমিল ও থানাদার কোম্পানির নিশান দেখিয়া আর কাহাকেও ছাড়িয়া দেয় না। সন্দ্বীপের আমিল আব্দুল্লা ঢাকার সরকারের হুকুম মত ইংরেজ ও ইংরেজের অনুচর দেখিলেই তাহাকে বিতাড়িত করিবার আয়োজন করিল। দালাল, পাইকার, পশারীদের উল্টা মুচলিকা দিতে হইল যে, ইংরেজের সহিত তাহারা কারবার করিবে না। সফর ঢাকা ফিরিয়া গেল—ঢাকার ইংরেজ কুঠি সিপাহীরা দখল করিল। কুঠির সাহেব ভয়ে তাহা ছাড়িয়া দিল!

কিন্তু আবার ঘটনার গতিতে একবার রাশ টানিয়া দিলেন নবাব মীর কাশেম। প্রত্যেকটি বড় সাহেব বহু অর্থ উৎকোচ লইয়া নবাবের সহিত সন্ধি করিল। নবাবের হুকুম মত তখন সাহেবদের দেওয়ানকে ঢাকার কুঠি ছাড়িয়া দিতে হইল। ইংরেজ কোম্পানিকে নবাবী সিপাহীরা ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করিতে লাগিল। কাজী সফরও তিরস্কৃত হইলেন। কিন্তু তিনি গর্জিতে লাগিলেন। এইবার হাজারি হাটের গঞ্জ ছাড়িয়া রস সাহেব গুদাম খুলিতে গেল চৌধুরীর হাটে —পদ্মনাভের আহ্বানে।

সনাতন দেখিল বেণী গোমস্তা কাছারি বাড়িতে পদ্মনাভের নিকট বসিয়া আছেন। সনাতন; আসিতেই সে বলিল: আপনার জন্যই বসিয়া আছি, ছোট চৌধুরী।

দেখিলেই বুঝা যায় বেণী গোমস্তা এখন শুধু বিপদমুক্ত নয়, ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু সে বিনয়কুশলও। বলিল: চৌধুরী কর্তা রাজী হইয়াছেন—এখনি আপনি একবার রস ও বেলি

সাহেবের সঙ্গে ঢাকা গিয়া দেখা করিলেই হয়। আপনি তাঁহাদের উকীল নিযুক্ত হইবেন।

সনাতন পূর্বেই পিতার মুখ হইতে শুনিয়াছিল যাহাতে সে এই পদলাভ করে তজ্জন্য তিনি সচেষ্ট। সাহেবদের উকিল-মুন্সির সুখ-সৌভাগ্য আজ কাহার না কাম্য ?

সনাতনও ঢাকা যাইতে আগ্রহান্বিত—পিতার সান্নিধ্য হইতে সে দূরে যাইতে চায়। সেখানে সফর আলী নবাবের দ্বারা তিরস্কৃত, স্বয়ং দেওয়ান মহম্মদ আলীর ওপর কুঠির ম্যানেজার কার্টিয়ার এখন হুমকি দিতেছে। সফর আলী দুঃসাহসিক, কিন্তু অধীর স্বভাব। সনাতনের সে হিতৈষী সুহৃৎ, এই সময়ে সনাতনের পরামর্শ ও সৌহার্দ্যও তাঁহার প্রয়োজন—কোনো হঠকারিতা তিনি না করিয়া বসেন। আর সনাতনেরও প্রয়োজন তাঁহার সান্নিধ্য—তাঁহার সহিত একযোগে কাজ।

কিন্তু ঝড় প্রত্যাসন্ন।

যে আকাশ স্তব্ধ হইয়া ছিল দেখিতে না দেখিতে তাহার কোণে কোণে বিদ্যুৎ ও বজ্র হাঁকিয়া উঠিল। নবাব মীর কাশিমের বাণিজ্য-বিষয়ক সন্ধির একটি শর্তও কোম্পানির কুঠির কোনো সাহেব গ্রাহ্য করিল না। কলিকাতার কাউন্সিলও অচিরেই সমস্ত শর্ত ভঙ্গ করিয়া বিনা মাশুলে সর্ববিধ ব্যবসা চালনা করিবার অধিকার দাবী করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি সাহেবের ব্যক্তিগত অসৎ ব্যবসায়ের ও অত্যাচারের পশ্চাতে ইংরেজ কোম্পানি বন্দুক তুলিয়া দাঁড়াইল। যেখানকার যত সাহেব, নিজ নিজ গোমস্তা, মুন্সি, মুৎসুদ্দি লইয়া হাট-বাজার দেশ গ্রাম লুণ্ঠনে লাগিয়া গেল। চট্টগ্রামের দিকে

ঢাকার দুই কোম্পানি সিপাহী, দুইটি কামান একটি হাউইটজার লইয়া ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট উদিত হইল—বাম্বাপুরের জমিদার ও তাহার কেল্লা নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বিবাদ উপলক্ষ করিয়া শ্রীহট্ট কুঠির সাহেব স্থানীয় জমিদারকে সিপাহী লইয়া আক্রমণ করিল। পদস্থ একজন মুসলমান তালুকদারকে গুলিতে নিহত করিল, স্বয়ং জমিদারকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া কুঠিতে কয়েদ করিয়া রাখিল।

পাটনা হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সর্বত্র কোম্পানির দৌরাত্ম্য :—কোম্পানির সাহেবরা যে জিনিস ইচ্ছা বিনা মাশুলে ব্যবসা করে, অন্যদের উপর মাশুল ধার্য করে, ব্যবসা বন্ধ করিয়া দেয়। হাট-বাজারে তাহাদেরই খুশীমত দামে ক্রয়-বিক্রয় চলে। তাহারাই আবার বিচার করে, জরিমানা করে, কয়েদ করে, খুন করে, যেভাবে খুশী দাম আদায় করে। নবাবের কর্মচারীরা আপত্তি করিয়া গ্রেপ্তার হইল, না হয় কার্যভার ফেলিয়া পলায়ন করিল। অনেকে কুঠির কর্মচারীদের সহিত লুণ্ঠনে যোগদান করিল। বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছিল, বানে সব ভাসাইয়া লইয়া চলিল। পর্তুগীজ, আর্মানী, মুসলমান সওদাগর,—যে কোনো হার্মাদ কোম্পানির নিশান উড়াইয়া নিজ নিজ আড়ংএ, এলেকায় রাজা হইয়া বসিল—ইহা সমসাময়িক ইংরেজ কুঠিয়ালেরই কথা।

ইতিহাস জানে ক্রুদ্ধ হতশ্বাস, নবাব অপমানে বিড়ম্বনায় ক্ষিপ্ত হইয়া মুঙ্গেরে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছিলেন। প্রতিশোধ ইচ্ছায় তিনি অন্তর্বাণিজ্যের উপর সর্ববিধ মাশুল দেশী বিদেশী সকল ব্যবসায়ীর পক্ষে তুলিয়া দিয়া এখন ফরমান জারি করিলেন।

পাটনার ইংরেজ কুঠির উদ্ধত সাহেব ও গোমস্তাদের নবাব গ্রেপ্তার করিলেন। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বাংলায় নবাবী ফৌজ পরাজিত হইল। মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিয়া মীর কাশিম অযোধ্যায় আশ্রয়

লইলেন; অযোধ্যার নবাব নিজাম-উদ্-দৌলা ও বাদশাহ্ শাহ্ আলম তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে ২৬শে অক্টোবর ১৮৬৪-এ মীর কাশিমের সৈন্য নির্মূল হইয়া গেল। ততক্ষণে কোম্পানি আবার মরণোন্মুখ মীর জাফরকে নবাব করিয়াছে। তাহাতে আর এক দফা উৎকোচে কোম্পানির ছোট বড় সাহেবরা লাল হইয়াছে। অন্যদিকে সুজাউদ্দৌলা ও শাহ্ আলমকেও নিজেদের পক্ষভুক্ত হইতে বাধ্য করিয়াছে।

সনাতন ঢাকা পৌঁছিবার পূর্বেই ঢাকায় কুঠির দালাল নেহুলের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পুত্র নাই। নবাবের দেওয়ান নেহুলের সম্পত্তি বায়তুতে জমা করিবেন। সরকারী পিয়দা সেই গৃহে মোতায়েন হইল। কোম্পানির ইঙ্গিতে এক শিশুর নামে নালিস উপস্থিত হইল—সে নেহুলের বংশধর। উহা মিথ্যা দাবী; কিন্তু কুঠিয়াল কার্টিয়ার প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সিপাহী পাঠাইলেন—সরকারের পিয়াদা ও কোম্পানির সিপাহীতে একটা সংঘর্ষ হইল। অপ্রস্তুত সফর আলী কোম্পানির সিপাহীর হাতে বন্দী হইলেন।

সনাতন ঢাকা পৌঁছিতেই তাহা জানিল। সে অমনি তাহার জামিন প্রার্থনা করিয়া কুঠির দুয়ারে উপস্থিত হইল। একদিন কাজীরা চৌধুরীদের জামিন হইয়া তাহাদের বিপদমুক্ত করিয়াছিল। আজ চৌধুরীদের সৌভাগ্য—এই প্রতিদান দিতে পারিবে।

কিন্তু অত সহজে ভুলিবার মত লোক কুঠির সাহেবেরা নয়। বিশেষত, তাহাদেরও হরকরা আছে। ঢাকায় আসিয়া সনাতন কি করিতেছিলেন, সেই সংবাদ তাহাদের সংগ্রহ করিতে অসুবিধা হয় নাই। তবু দেওয়ানের

জোর তাড়নাতেই সফর আলী মুক্তি পাইতেন। কিন্তু কোম্পানির মুন্সি খোজা কমরুদ্দীন বুদ্ধি করিয়া সনাতনকেও এইক্ষণে জামিন করিয়া লইতে ছাড়িল না।—লোকটা আবার সাহেবদের উকীল হইতেও চাহে!

সফর আলী বাহির হইয়া আসিলেন, সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার দুর্বার ঘৃণা এবার কঠিন জ্বালায় পরিণত হইয়াছে—নসরাদের এই মুলুক হইতে তাড়াইতে হইবে।

সনাতনও তাহা মানে, তাহা চাহে। কিন্তু শক্তি কোথায়? এই ত ঢাকা শহরেরই বুকে কুঠির সাহেবেরা নবাবী সিপাহীদের হটাইয়া দিয়া সফরকে পর্যন্ত বন্দী করিতেছে।

—ঢাকাতে উহাদের কুঠি অনেক, সিপাহী অনেক। কিন্তু দেশে উহাদের কয়টা কুঠি আছে? কয়জন উহারা সংখ্যায়? কয় জন উহাদের গোমস্তা, দালাল? কত সিপাহীই বা আছে উহাদের তাঁবে?

সনাতন তাহা বোঝে। কিন্তু বলে: উহাদের অস্ত্র শস্ত্র উন্নত, লড়াইএর কৌশল উন্নত, উহাদের শৃঙ্খলা উন্নত, যুদ্ধ বিদ্যায় উহারা শ্রেষ্ঠ।

সফর জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্ষিপ্ত মানুষের মত কহিলেন: মিথ্যা কথা। বাণিয়ার নিকটে কখনো লড়াইতে পরাস্ত হইব না আমরা—বাহাদুর এই মোগল-পাঠান . শেখ-সৈয়দ—রাজপুত-ব্রাহ্মণ-মারাঠা। আমাদের রাজ্য আমরা এই বাণিয়ার হাতে সমর্পণ করিব?—এতটুকু আমীর-ওমরাহ, রাজা-সামন্তর গর্ব কি আমাদের বুকে নাই?

সনাতন তর্ক করিতে চাহে না। সফরকে শান্তভাবে স্থির চিত্ত নিজ কর্তব্য প্রতিপালনে নিযুক্ত করিতে চাহে। এই সময়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইলে চলিবে না। কিন্তু শান্ত হইবার মত সফরের আর মনোভাব কোথায়? নসরার হাতে তাহাকে বন্দী হইতে হইল—এই অপমান সহিয়া তিনি শান্ত হইয়া রহিবেন? তাঁহার ইমান ইজ্জত কিছু নাই?

শান্ত হইবার মত দেশের অবস্থাও আর রহিল না। নবাবের সঙ্গেও যুদ্ধ বাধিল। দূরের দুই একটা গঞ্জের সাহেবের গোমস্তাদিগকে নবাবের থানাদার জমাদাররাও গ্রেপ্তার করিল। বিনা মাশুলে তাহাদের নিমক, পান-সুপারী, তাঁমাকের ব্যবসা পত্র বন্ধ করিল। কাজী বাড়ির ইঙ্গিতে চিত্রিসারের ঢালী ও দাসেরা এক রাত্রিতে হাজারি হাটের সাহেবি গুদাম লুঠ করিল। চৌধুরীহাটে সাহেবদের গুদামেও তাহারা আগুন ধরাইতে চেষ্টা করিল। গুরুপদ দালালকে কাজীরা আটক করিয়া রাখিল। হরনাথ সেন মধ্যমগ্রামে পালাইয়া গেল। বেণী চন্দ পালাইয়া শহরে সাহেবদের সংবাদ দিতে আসিল। ঢাকার উপকণ্ঠে গ্রামে গঞ্জে ইংরেজদের সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য সফর নিজে ছুটাছুটি করিতেছেন। এদিকে কিন্তু চিত্রিসারের সংবাদ পাইয়া সনাতন চিন্তিত হইল। গুরুপদের প্রাণ সংশয়, চারিদিকে বড় দুর্যোগ—সে উপস্থিত না থাকিলে হয়ত পদ্মনাভেরও বিপদ ঘটিতে পারে। কারণ, উৎপীড়িত রায়ত-প্রজা তাহার উপর অসন্তুষ্ট।

সনাতন চিত্রিসারে ফিরিল। পদ্মনাভ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু চিন্তাভার বৃদ্ধিও পাইল। ঢালী, কৈবর্ত চাষী,-তাঁতী, কাপালি, গোয়ালা, প্রভৃতি মহালের সকলে সনাতনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। ফুল শাহই তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন। কোম্পানির দৌরাত্ম্য, গোমস্তা ও দালালের অত্যাচার উৎপীড়ন শেষ করিয়াও তাহারা সন্তুষ্ট নয়। জমিদারের আদায় ওজন আবওয়াব এই সবও বাতিল করিতে হইবে। সনাতন তাঁহাদের সেই আদেশ দিক্—ঢাকা হইতে নবাবের এই ফরমান্ সে লইয়া আসুক কাজী সফর আলী সাহেবকে লিখুক। *

সনাতন আশ্বাস দেয়—আবওয়াব বাদশাহী ফরমানে বরাবরই ব-আইনী। তবে বরাবরই আদায়ও হয়। তাই তাহা

নূতন করিয়া এখন পরোয়ানা দিয়া বে-আইনী ঘোষণা করা দরকার।

—এতদিন যে আবওয়াব আদায় করিলেন জমিদাররা তাহা ফেরৎ দিক প্রজাদের। না হইলে প্রজারাও খাজনা দিবে না।

অমনি কথা উঠে: খাজনা দিবই বা কাহাকে? কে রাজা তাহার স্থিরতা নাই।

কঠিন, জটিল সংকট। কিন্তু সে জন্য পদ্মনাভ চৌধুরী বিচলিত নন। শূন্য কাছারি বাড়িতে তিনি গম্ভীর মহিমায় মধু খানসামাকে লইয়া একা বসিয়া থাকেন। গদাই ভয়ে গ্রামান্তরে গিয়াছে, আসে না। প্রজা রায়তের চীৎকার, সনাতনকে লইয়া তাহাদের আলোচনা, পদ্মনাভ চৌধুরীর যেন কানে যায় না—উহা কানে যাইবার অযোগ্য। তাহা ছাড়া তিনি সুনিশ্চিত জানেন—দীর্ঘদিন এই মাতামাতি থাকিবে না।

সত্যই তাহা থাকিল না।

পদ্মনাভের ও বেণী চন্দের গোপন আবেদনানুযায়ী এক কোম্পানী সিপাহী লইয়া রস সাহেব আসিয়া হাজারি হাটে নামিলেন। মুহূর্ত মধ্যে অবস্থা ফিরিয়া যাইতে লাগিল। গুরুপদ মুক্ত হইল। কাজী বাড়ি আক্রান্ত হইল, ঘর দুয়ার লুঠ হইল, বৃদ্ধ লালমিঞা বন্দী রহিলেন। ফুল শাহকেও সাহেবেরা অপমান করিতে ছাড়িল না। লোকটা পাকা বদমায়েস, তাঁহার নিকটেই পরামর্শ করিতে আসিত ওই ঢালী ও দাসেরা। সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান আশায় সনাতন হাজারি হাটে গেল। রসের সিপাহী তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাতে পায়ে দড়ি বাঁধিয়া গ্রেপ্তার করিল। গুদামে নয়, একেবারে সিপাহীদের বজরায় সনাতন কয়েদ হইল। সে সেই সফরের দোস্ত; সফরই আসল দুশমন, কোথায় সে? খাসুকেও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহার ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল

রস্। কৈবর্তদের, ঢালীদের, তাঁতীদের, লোহারদের প্রত্যেককে ধরিয়া আনিয়া সে মুচলিকা লইতে লাগিল—কোম্পানির ও সাহেবের ছাড়া আর কাহারও মাল তাহারা ক্রয় করিতে পারিবে না।

তখনো যুদ্ধ শেষ হয় নাই। কিন্তু বাঙলায় মীর কাশিমের আর কোনো আশা নাই। সনাতন ঢাকার কুঠিতে কয়েদ আছে। পাটনার কুঠির সাহেবদের সমরু হত্যা করিয়াছে। হয়ত ঢাকার বন্দীদের উপর কোম্পানি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। সনাতন তাই আপনার মনে প্রস্তুত হইতেছে। সে বুঝিয়াছে দুঃসাহসী সফর আলী আপনার অসহিষ্ণুতায় অধীর হইয়া শুধুই জলিয়া মরিলেন। কোথায় বাঙলার জমিদার, জমাদার, নবাবের ফৌজদার, দেওয়ান ক্রোরী, আমিলরা? কেহই ত বিদ্রোহ করিল না নসরার বিরুদ্ধে? সহজেই তাহারা আজ এক জনকে ছাড়িয়া অন্যকে নবাব মানিয়া লইয়াছে। আসলে কুঠির রাজত্বই সকলে স্বীকার করিয়া লইতেছে।

গ্রামে-গঞ্জেও সাধারণ মানুষ বিশেষ চমকিত হয় নাই। সেই বর্গীর দিন হইতে তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত। তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে, চাষ-আবাদ, স্ত্রীপুত্র লইয়া তৎপূর্বে নির্বিরোধে যে জীবনটুকু কাটাইতেছিল তাহাও আর এখন কাটাইতে পারে নাই। কেহ ত কোনো দিন তাহাদের দুঃখ লাঘব করিল না; যে আসিয়াছে সে-ই অত্যাচার করিয়াছে। একজনার পর একজনা শুধু তাহাদের জুলুমই করিয়াছে—মীরজাফরই বা কি মীরকাশিমই বা কি? সফর আলীই বা কি? কোম্পানীর গোমস্তা বেণী চন্দই বা কি?

দুষ্টেরই জয় হইতেছে। হয়ত এই পাপ ভার হইতে ভগবান্ ছাড়া কেহই

মানুষকে মুক্ত করিতে পারিবে না। তাঁহারই উহা সাধ্য, মানুষের সাধ্য নয়।

সনাতন নিজের ভবিষ্যৎ ভাবে না। ভাবিয়া লাভ নাই। পৃথিবীতে সে আসিয়াছিল, আপনার জীবলীলা যথাসাধ্য সে ধর্মপথে যাপন করিতে চাহিয়াছিল। হয়ত সে ভুল করিয়াছে, নিজের পুরুষাকারে বড় বেশি বিশ্বাস করিয়াছে। বিধাতার ইচ্ছা ছাড়া কি করিতে পারে মানুষ? কিন্তু সনাতন কপটাচার করে নাই—বিধাতার কাছে ইহাই তাহার সাফাই। আর এখন প্রার্থনা: প্রেমের দেবতা, সনাতনকে তুমি আশ্রয় দাও!

কিন্তু সনাতনের আর কোনো কথা আছে কি কাহারও আছে—বধূর নিকটে? অন্য কোনো মানুষের নিকটে—যাহারা তাহাকেই আশ্রয় করিয়াই জীবনে সম্পূর্ণ হইতে চাহিয়াছে?

সনাতন নিজের ভবিষ্যৎ ভাবে না; কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যৎ, তাহাদের কথা তথাপি সে না ভাবিয়া পারে না। ভাবিতে থাকে তাহার শূন্যগৃহের একান্ত নির্ভরশীলা সেই পরিপূর্ণ যৌবনা পত্নীর কথা।—সে-ই ত তাহাকে অন্তরের সহজ বিশ্বাসে ধর্মের পথও প্রদর্শন করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবিতে থাকে সেই গৃহশূন্যা বৈষ্ণবিনী কালিন্দীর কথা। আপনার অন্তরের দুরন্ত আবেগে সে প্রেমের পথ আবিষ্কার করিয়াছে।—সনাতনকেও যেন জানাইয়াছে—বিধাতাই মানুষের পরম আশ্রয়। সনাতন তাহার কথা আর না ভাবিলেও পারে, কিন্তু তথাপি ভাবে।—প্রেমধর্মের পথে কালিন্দী যে পূর্বগামিনী। ইহা ভাবে বলিয়াই আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিণীতা পত্নীর কথাও ভাবে। বিশেষত, সনাতনই তাহার আশ্রয়। স্বামীর সেই আশ্রয় হারাইলে সেই পতিগত প্রাণা যে গৃহপথ, ধর্মপথ, প্রেমের পথ কোনো পথই খুঁজিয়া পাইবে না।

ভূমিকা

হঠাৎ সনাতন মুক্তিলাভ করিল। বেণী গোমস্তা কুঠির সাহেবদের সহিত কুঠির আঙিনায় দাঁড়াইয়া আছে। বেশ মুরুব্বির মত হাসিয়া সে সনাতনকে বাহিরে লইয়া চলিল।

—চলো, চৌধুরী কর্তা তিন দিন ধরিয়া ধর্ণা দিয়া আছেন সাহেবদের কাছে। ধর্ণা দিবেন না? মানী লোক, বুদ্ধিমান্ লোক, কিন্তু করিবেন কি? তুমি ত মুন্সি ফকির, তাঁহার যে ঘরে অন্তঃসত্ত্বা বধূ রহিয়াছে। এতদিন পরে যদি সকলের আশা সফল হইতে চলিল—তুমি থাকিবে গারদখানায়; পৌত্রমুখ কেমন করিয়া দেখিবেন তোমার পিতামাতা? এই সুখের দিনের জন্য কত পূজা-অর্চনা, মানত করিয়াছেন কর্ত্রীঠাকুরাণী; সংযম-নিয়ম পালন করিয়াছেন বউ কর্ত্রী এত বৎসর ধরিয়া—তাহা ত জানো।

আবার সনাতনের নিজের কথা ভাবিতে হয়। বিধাতা যেন তাহাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন তাহার পথ। এই পৃথিবীতে সনাতনের নূতন কর্তব্য উদ্‌যাপনের আহ্বান আসিল—সেই গৃহধর্ম পালন করিতে হইবে। এইত ধর্ম, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার জীবনের স্বচ্ছন্দ সুনিশ্চিত পথ।

বাহিরের সমস্ত ভাবনা ছাপাইয়া সেদিন সনাতনের অন্তরে এক নূতন আনন্দ জন্মলাভ করিল—যেদিন সে পুত্র মুখ প্রথম সন্দর্শন করিল। চারিদিকে উৎসব-আনন্দ। পদ্মনাভ চৌধুরীর অন্তর উৎফুল্ল। আত্মীয়-পরিজন দাসদাসীর মুখে হাসি। গ্রামের কেহই আজ না-হাসিয়া সনাতন কেন, পদ্মনাভ চৌধুরীর সহিতও কথা বলে না। ইহা যেন সমস্ত গ্রামের সৌভাগ্য। তাহাদেরই ভৌমিক মালিক চৌধুরী কর্তাদের গৃহে

আজ নূতন বংশধরের আবির্ভাব হইয়াছে—গ্রামের নূতন মালিক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুধু কি সনাতনই পুত্রলাভ করিয়াছে? সমস্ত গ্রাম যে তাহার ভাবী প্রভুকে লাভ করিয়াছে, তাহাদের আপন জনকে পাইয়াছে।

চিরদিনের প্রেমপ্রীতির সুরে যেন চিত্রিসারের জীবনখানি বাঁধা।

পট্টবস্ত্র পরিয়া কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সহ চৌধুরী ঠাকুরাণী সিংহবাহিনী মন্দিরে পূজা দিতেছেন। জনার্দনকে তিনি পাঠাইয়াছেন হাজারি মসজিদে, নমাজ-শেষে মোসল্লীদের মন্ত্রপূত জল বহিয়া আনিবার জন্য। পদ্মনাভ চৌধুরী তাই সনাতনকেই পাঠাইলেন 'পীরের টিবির' ধূলা ভিক্ষা করিয়া আনিবার জন্য। এই সব শিশুর শিয়রে থাকিবে, চৌধুরী বংশের ইহাই প্রথা। পদ্মনাভ সাবধান করিয়া দেন: দেখিও, অন্য কথায় কর্ণপাত করিও না। চারিদিকে তোমার শত্রুর অভাব নাই।

ফুল শাহ নাই। বাগানে ফুল নাই। সব শ্রীহীন।

সনাতন একবারের মত কেমন বিষাদে অবসন্ন হইল। তাহার পর এক খাবলা ধূলি লইয়া বস্ত্র প্রান্তে বাঁধিল:—তাহার গোলাপ ফুটিয়াছে।

পুরাতন মাঠ ঘাটের উপর দিয়া সনাতন গৃহে ফিরিল। চোখে পড়িল না ঢালীপাড়ার ঘাস্থর পোড়া ঘর-দুয়ার, কৈবর্ত দাসেদের জরাজীর্ণ অবস্থা; যোগীদের জোলাদের অসহায় দৃষ্টি। সে আপনার মধ্যে এই বাণীটিই শুনিতেছে—'গোলাপ ফুটিল, বুল বুল তুমি নিঃশঙ্ক হও।' আপনার মধ্যে যেন সনাতন একটা নিশ্চয়তা পাইতেছে, ব্যাপ্তি অনুভব করিতেছে। সে এই অন্ধকার, কুটিল কাল অতিক্রম করিয়া আর এক কালের সীমানায় পা বাড়াইতেছে—নূতন দেহ লইয়া, প্রাণ লইয়া, আত্মা লইয়া। 'গোলাপ ফুটিবে: বুলবুল তুমি নিঃশঙ্ক হও।' —সনাতন চৌধুরীর মনে আর এই বিষয়ে কোনো সংশয় নাই।

ভূমিকা

নয়া চৌধুরীর জন্মে প্রজারা কাছারিবাড়ির সম্মুখে নজরানা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহাস্যে সকলে তাহাকে সম্বর্ধনা করিল। সকলে মিলিয়া সনাতনকেও কাছারি বাড়িতে আনিয়া বসাইল।

গোলাপ ফুটিয়াছে। বুলবুল এইবার নিঃশঙ্ক।

৪

নীল মাধবের দেউল

সনাতন চৌধুরী কাছারিবাড়িতে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে চাহেন নাই। পদ্মনাভ চৌধুরীই আপনার বুদ্ধিবলে চৌধুরীদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সনাতন চৌধুরী যে তাহা রক্ষা করিবার মত মানুষ ছিলেন না, তাহা সকলেই জানে। ক্রমেই তাহা আরও পরিষ্কার হইয়া গেল।

ঝড়ের শেষে তখন আসিয়াছে শ্রান্তি, অবসাদ। মুর্শিদাবাদে নূতন নবাবকে নাচওয়ালী লইয়া দিন যাপন করিবার মত যথেষ্ট বার্ষিক বৃত্তি দিয়া তাহাকে শাসন কর্ম হইতে বিদায় দিয়াছে কোম্পানি বাহাদুর। মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙলার ও রাজা সিতাব রায় বিহারের 'নায়েব নবাব।' ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে কোম্পানি নিজেদের করায়ত্ত সম্রাট শাহ আলমকে বাষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়া সুবা বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিল। পলাশীর পরিশিষ্টও এইবার সমাপ্ত হইল। আরম্ভ হইল কোম্পানির আমল—রাজস্ববৃদ্ধির নামে রাজ্য লুণ্ঠনের নূতন পর্ব। পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেড় কোটি টাকার ভূমিরাজস্ব সোয়া দুই

কোটি হইয়া উঠিল খাতার হিসাবে—আবওয়াবে উৎপীড়নে উৎকোচে কত কোটি হইল তাহার ঠিকানা নাই। তাহার ফল—'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'। ফকির-সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ; তারপর কোম্পানির 'নূতন শক্তি' সংগ্রহ—কোম্পানির কৃপা বর্ধিত' নূতন' ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর সৃষ্টি; —১৭৮৬তে দশ শালা বন্দোবস্ত,—১৭৯৩তে তাহাই ঘোষিত হয় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলিয়া।—কিন্তু তখন পদ্মনাভ চৌধুরী নাই, সনাতন চৌধুরীও সংসার বিষয়ে প্রায় উদাসীন।

অশান্তি ও বিদ্রোহের সময়ে প্রজা রায়তেরা কাহাকেও বড় খাজনা দেয় না। কে রাজ্যের মালিক তাহা যখন স্থির নাই, তখন কাহাকে খাজনা দিব? পরে অন্য কেহ রাজা হইয়া বসিয়া বলিবেন—খাজনা দাও। বৎসর দুই কেহই তাই খাজনা দেয় নাই। পদ্মনাভ চৌধুরীর হাট এখন জমিতেছে; তিনি উহা লইয়া ব্যস্ত। সনাতন চৌধুরী কাছারিবাড়িতে বসিয়া খাজনা আদায়ে বিশেষ যত্নপর হইলেন না। অবশ্য পদ্মনাভ চৌধুরীও তখন পীড়াপীড়ি করিলেন না—সময় তদুপযোগী নয়। প্রজাদের তিনি মাঝে মাঝে ডাকিয়া বলেন: যে-ই নবাব হউক, তোমাদের মালিক আমরা চৌধুরীরা। তোমরা তাই খাজনা দিবে না কেন? পরে কিন্তু একসঙ্গে বাকী বকেয়া শোধ করিতে বিপদে পড়িবে।

আসিল সেই দিন। কোম্পানির এখন দাবীর অন্ত নাই। নায়েব নবাব রেজা খাঁ তাহাদের হুকুমে যে করিয়া পারে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে—পীড়াপীড়ি না করিলে তাই জমিদারী চলে না।—আবওয়াব, নজরানা, মাথটের হারও বাড়িতেছে। গোমস্তারা যেই হারে খুশী তাঁতীদের দাদন দিয়া মুচলিকা লইতেছে। কুঠিতে কোম্পানির যাচনদার, পাইকার যে-হারে খুশী কাপড়ের, সুপারির, তেলের দাম স্থির করিতেছে —কে আজ আপত্তি করিবে? এদিকে কোম্পানির ভূমি রাজস্ব বৎসরে

বৎসরে ইজারা হয়, দাম চড়ে; বৎসরে বৎসরে ইজারার ডাকে জমিদারী হাত বদল হয়। চড়া হারে জমি ইজারা কে লইবে—কুঠির গোমস্তা, পাইকার, দালাল, যাচনদার, ছাড়া? কেইবা প্রজার ঘরবাড়ি উৎসন্ন করিয়া, রায়তের হাল গরু বিক্রয় করিয়া আরও চড়া হারে সেই খাজনা আদায় করিতে পারিবে কোম্পানির সহায়তা না পাইলে? এবার জমিদারী ইজারা লইল দালালেরা—বেণী গুরুপদ, জাহিরুদ্দীন। আবওয়াবের জন্য ইহাদের পীড়নও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারীর হাত বদলে সেলামি চাই, ব্যবসাপত্রের 'সয়ের' আদায় বাড়িয়া চলিয়াছে। চৌধুরীহাটেও 'তহ' আর ছাড়িয়া দিবেন না পদ্মনাভ চৌধুরী। সরকারই কি তাহা ছাড়ে কোথাও? কামার, কাঁসারি, কুমার, সুতার, তেলী, গেণারি, হালুই, মোদক—কাহারও আর 'সায়ের' না দিয়া হাটে বাজারে বসিবার এখন সাধ্য নাই। তাঁতী, যোগী, বারুইরা কোম্পানির গোমস্তার হুকুম মতই কাপড় জোগায়। পদ্মনাভ চৌধুরীর জমি ভোগ করিয়া তাঁহাকেই ইহারা ফাঁকি দিতে চাহে। জালিয়া, মালা, মাঝি, পাটনি ইহাদের উপরও ঘাটের হার বাড়িয়াছে। নৌকা গড়িলে ত সরকাই ছাড়ে না, পদ্মনাভই বা কেন ছাড়িবেন? না, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—কোনো জিনিসই পদ্মনাভের জমিদারীতে বাস করিয়া এই কোম্পানির দেওয়ানীর আমলে বিনা মাশুলে চলিবে না।

চৌধুরীদের মালগুজারি প্রায় বাকি পড়িতেছিল। সর্বনাশ হইত। পদ্মনাভ চৌধুরীই আবার তাই জমিদারী পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন—জনার্দন রহিল তাহার সঙ্গে। সনাতন? সনাতন যথার্থই পণ্ডিত মানুষ, নিজেও চাহে পড়াশুনা করিতে। পারদ হইতে ফিরিয়া তাহার ধর্মচিন্তা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে,—ভাগবত লইয়া মগ্ন থাকে ভক্তিরত্নের সঙ্গে।

ভূমিকা

সনাতন বহু চেষ্টায় আপনাকে শাস্ত ও সুস্থির করিয়াছিল। বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে ভগবদ্গীতা পড়িতে পড়িতে সনাতন মানিতে বাধ্য হয়—যাহা সফর আলীর পক্ষে ধর্ম তাহা সনাতনের পক্ষে বোধ হয় ধর্ম নয়। ইহা ত গীতারও ইঙ্গিত। তাহাবা মুসলমান, রাজকর্মচারী, রাজ্যশাসক। তাহাদের প্রকৃতি রজোগুণ প্রধান। তাহারা উগ্র, নির্ভয়, নির্দয়ও। কিন্তু সনাতন ব্রাহ্মণ সন্তান, রাজা-রাজ্য লইয়া ভাবনা তাহার প্রকৃতি নয়। সেই প্রকৃতি সাত্ত্বিক—ভক্তি, ভগবৎ-সেবা, দয়া, বিনয় —ইহাই তাঁহার স্বধর্ম। সে সফর আলী নয়, আমীর ওমরাহ কেহ নয়; সে তাই নসরার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ক্ষোভে তাহাদের মত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারে না। এই পৃথিবীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াইবে, এত স্পর্ধাও তাহার আর নাই। ধর্মরাজ্য-স্থাপন করিবার শক্তি ভগবানেরই থাকে। সে, সনাতন, সামান্য মানুষ, কেবলই নিজেকে ভুলের মধ্যে জড়াইয়া ফেলে। সংসার চিনিতে পারে না, বুঝিতে পারে না, তাহার অপেক্ষা জনার্দনও সেদিকে দক্ষ। সে দেখুক এই বিষয়কর্ম। সনাতন বরং ততক্ষণ ভক্তিরত্নের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করুক, ভাগবত পাঠ করুক—গুলিস্তাঁ ও হাফেজের পুরাতন দফ্‌তর খুলিয়া বসুক। জীবনের সেই অপরূপ স্বপ্ন ভগবানের সেই সুমহৎ লীলায় আস্থা লইয়া সে বরং নির্ণীমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে—তাহার নবজাত পুত্রের মুখ, তাহার নব-গরিমায় ভাগ্যবতী পত্নীর সহজ জীবন্ত কল্যাণী মূর্তি।

পদ্মনাভের নব-নব সমারোহের পরিকল্পনাও সনাতন শুনিতে চাহে না। পদ্মনাভের হাট জমিতেছে। নূতন পুকুরের পাড় বাঁধাইয়া এবার পুরাতন কাজীদের মত,—ইব্রাহিম খাঁয়ের মত—ওইখানে চৌধুরীদের একটা 'রংমহাল' গড়িবেন পদ্মনাভ।—সেখানে গান-বাজনার আসর বসিবে। ঢাকা হইতে বায়না দিয়া গানের দল আনিবেন পদ্মনাভ—সাহেবদের জন্য

বাইজী আনিতেও হইতে পারে। না হইলেও মৃগাবতীর কাহিনী, মনোহর মালতীর কথা তিনি রচনা করাইবেন। দেবী-পূজা এখন সমারোহের সহিত করিবেন পদ্মনাভ—আর ভয় নাই। ধামরাইর একঘর কুম্ভকারকে তিনি নূতন আনাইয়াছেন, চমৎকার তাহার হাত। আর, পূজায় তিনি পণ্ডিত ও ঘটক বিদায় এখন দরাজ হাতে করিবেন। পণ্ডিতেরা প্রতি জনে পাইবেন এক মাসের মত ভোজ্য ও একটাকা নগদ দক্ষিণা, ধূতি ও চাদর;—যোগীদেরই তাহা যোগাইতে হইবে। সেই কবেকার কথা—বৎসরে চার জোড়া শাড়ী ধূতি ও আট খানা গামছাতে যোগীরা এখনো চৌধুরীবাড়ির পূজা সারিতে বলে নাকি পদ্মনাভকে? চৌধুরী বাড়ির পূজা,—গ্রামের সকলে খাইবে-পরিবে, উৎসব করিবে, নবমী গাহিবে, মঙ্গল গান গাহিবে—ফাঁকে ফাঁকে মানিক পীরের গানও শুনিবে। তাহাতে গ্রামের কত বড় নাম? গ্রামের লোকদের খরচ জোগাইতে হইবে বই কি উহার জন্য।

রায়ত-জন ভয়ে চমকিত হয়—আরও টাকা—এই দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে? আরও খাজনা, আবওয়াব সায়ের!—'আর কত মারিবেন, হুজুর?'

সনাতন শুনিতে চাহে না চাষীদের মাঝিদের আপত্তি, ঘরামি কাপালি সকলের নালিশ, দোকানী-পশারির আবেদন নিবেদন। আর, তাঁতীদের, যোগীদের, বারুইদের সে কি করিয়া রক্ষা করিবে কুঠি-কোম্পানি, দালাল-গোমস্তা-পাইকার-যাচনদার সকলের হাত হইতে? বিধাতা ছাড়া কে পারে, কাহাকে রক্ষা করিতে এই পৃথিবীতে? ভক্তিরত্নের এই কথা ত মিথ্যা নয়।

সনাতন পারিলে তাহার পিতার সৌভাগ্যে গর্বিত হইত; কিন্তু পারে না। সনাতন পারিলে বাণিয়া গোমস্তার রাজত্ব ঠেকাইয়া রাখিত; কিন্তু সে পারে না। সনাতন পারিলে প্রজা-রায়ৎ,

গরীব-দুঃখীর নালিশ-নিবেদনের প্রতিবিধান করিত; কিন্তু সে পারে না। না, সে পারে না, কিছুই পারে না। সে দুর্বল। যিনি পারেন তিনিই তাঁহাদের সকলের নিবেদন, সকলের নালিশ শুনিবেন। আর সনাতনও আপনার গৃহকোণে তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিয়া অপেক্ষা করিবে।—সেইখানে আছে তাহার শান্তি—তাহার পত্নী; আছে তাহার আশা—তাহার নবজাত শিশু।

ঘাসু ঢালীর খোঁজ নাই। তাহার স্ত্রী আশ্রয় লইয়াছিল ভাই-এর ঘরে। সে মারা গিয়াছে। ছেলে দুইটা চলিয়া গিয়াছে সাহবাজপুরে দক্ষিণ মুলুকে। মধ্যমগ্রামের ভুঞাদের হাওলারাখে সেনেরা, তাহাদের পাইক ইয়াকুব; ঘাসুর মেয়ে আমিনাকে তাহার ছেলে বিবাহ করিয়াছে। আমিনাকে ইয়াকুব নিজের বাড়ি নেওযাইতে চাহে—সেনেদের এলেকায়। এতদিন খোঁজও করে নাই ইয়াকুব। এখন আমিনা বড় হইতেছে, মামুর বাড়ি কাজকর্মে সাহায্য করিতে পারে। এখন তাই ইয়াকুবের গরজ। সে জোর করিতেছে রহমানের উপরে—আমিনাকে ছাড়ো।

সনাতন বুঝিতে পারে না তাহাতে রহমানের আপত্তি হইবে কেন।

রহমান বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়। —ঘাসু যাহা করিয়াছে, করিয়াছে। চিরকালই সে গোঁয়ার। কিন্তু রহমান পুরুষানুক্রমে চৌধুরীদেরই প্রজা। তাহার বাড়ি হইতে ঘাসুর মেয়েকে হরনাথ সেনেদের পিয়াদা ইয়াকুবদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া কি চৌধুরীদের পক্ষে অপমানজনক নয়? তাহা ছাড়া, সম্মুখে খন্দ। রহমানের বাড়িতেও কত কাজ। মেয়েটা কাজ শিখিয়াছে তাহার মামীর কাছে। বরং ইয়াকুবেরা

তালাক দিলে রহমানের ছেলে রমজানই আমিনাকে বিবাহ করিতে পারে—সে এখন কুঠির পাইকার জহিরুদ্দীনের কাজ করে।

সনাতন চমকিত হয়।—সে কি কথা! তালাক!

—না, তাহা দিতে বলিতেছি না। তবে আমিনাকে তাহার মামীও এখন ছাড়িবে না। আর, এই ইয়াকুবরাও ঘাসুর দলেরই লোক ত। ঘাসুই আছে পিছনে। মেয়েটাকে সে-ই আদায় করিতে চায়।

সনাতন তথাপি বুঝিতে পারে না। দিন পনের পরে সে শুনিতে পাইল—পূর্বদিন রাত্রিতে ইয়াকুবের লোকেরা আমিনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। রহমানরাও প্রস্তুত ছিল। চৌধুরীদের পাইক, বরকন্দাজরাও আসিয়া পড়ে। ইয়াকুবেরা বউ পায় নাই, মাথায় পিঠে বাঁশের ডাণ্ডা খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। পদ্মনাভ চৌধুরী রাত্রিতেই গল্পটা শুনিয়াছিলেন। এখন সকালে সমস্ত তথ্য শুনিয়া হাসিতে ছিলেন। স্মৃতিরত্নকে বলিতেছিলেন: সেনেদের ঐ বান্দাটা এবার বুঝিয়াছে বোধহয়—চৌধুরীদের রায়তের মেয়েকে জোর করিয়া লইতে যাওয়া কেমন মজা!

কিন্তু সেই রায়ত ত ঘাসু—যাহার বাড়িঘর পর্যন্ত কোম্পানির গোমস্তারা পোড়াইয়া তাহাকে দেশছাড়া করিয়াছে। চৌধুরীদের তাহার জন্য মায়া কোথায়?

গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠ। সনাতন সেখানে গিয়া মাঝে মাঝে বসে। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ কে আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

—ছোট হুজুর!

—কে!

ভূমিকা

—গিয়াসুদ্দীন।

—গিয়াস,—ঘাসু ঢালী? —সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল সনাতন। হাতে একটা লম্বা সড়কি। মাথায় বাবড়িকাটা চুল, কাঁধ পর্যন্ত তাহা পড়িয়াছে। মুখ দেখা যায় না অন্ধকারে। কিন্তু সেই চোখ ত গোপন থাকিবার মত নয়, তাহা যে জ্বলে। সনাতন চমকিত হইল, ঘাসু নদীতে ডাকাতী করিয়া ফিরে। কাহাকেও মারে,—আবার কাহাকেও নাকি বাঁচায়। কিন্তু জমিদার-গোমস্তাদের কাহাকেও পাইলে নাকি সে আর ছাড়ে না। সনাতনের কি সেই অন্তিম মুহূর্ত আসিল?

কিন্তু ঘাসু শান্তভাবে বলিল: হাঁ, ঘাসু ঢালী। এখন ত ঘাসু ডাকাত।

তারপর সোজা কথা: আপনাকেও ছাড়িতাম না। কিন্তু আপনি দুশ্‌মনের ছেলে হইয়াও দুশ্‌মনের দলে যোগদান করেন নাই, কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে লড়াইও করিয়াছিলেন। বেইমানী করেন নাই কিন্তু সফর সাহেব ত এখনো লড়িতেছেন। ফকির শাহ পর্যন্ত এখানে লড়িতেছেন। তবে আপনি এখন চুপ করিয়া গেলেন কেন, ছোট হুজুর?

সনাতন সত্য কথাই বলিল: খোদাতালার মর্জি না হইলে আমরা কি করিতে পারি, ঘাসু?

—খোদাতালার মর্জি! —ঘাসুও চুপ করিল একবার। —সত্য কথা। দেখি তাঁহার মর্জি কি! —তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। —কিন্তু আমার বেটীকে আমার জামাইর বাড়ি যাইতে দিতেছেন না কেন আপনারা? বেটী বড় হইয়াছে, সে স্বামীর নিকটে যাইবে,—জমিদারের তাহাতে কি? —এও কি খোদাতালার মর্জি?

সনাতন মাথা অবনত করিল।

ঘাসু বলিল: ছোট হুজুর! আপনাদের জমিদার তালুকদার

গোমস্তাদের জবরদস্তিকে আপনি খোদাতালার মর্জি বলিবেন না। আমি তাহা মানিব না। আপনাকে বলিলাম, আমার মেয়েকে ছাড়িয়া দিন—

সনাতন সত্য কথাই বলিল: আমি কি ছাড়িবার মালিক, ঘাসু?

—না। কিন্তু কে সেই মালিক? মেয়ের বাপ না, স্বামী না, শ্বশুর না; তবে কে সে-ই মালিক? জমিদার, তাহার পাইক বরকন্দাজ?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠ। চোখ জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে বুকও।

সনাতন সেই তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠের মধ্যে পুরাতন প্রশ্নও শুনিল—কে মালিক পৃথিবীতে? —দুনিয়ার মালিক, তুমি এই জুলুমবাজদের স্পর্ধা আর কত কাল সহিবে?

ঘাসুই বলিল: ফকির বলেন, মালিক মাত্র একজন, আর সবাই দাগাবাজ ঠগবাজ। জান কবুল, এই দাগাবাজের মালিকানা খতম করিব।—কণ্ঠ এবার গর্জিয়া উঠিল। সফর অলীর কণ্ঠই কি আবার শুনিল সনাতন? আরও ক্ষুব্ধ, আরও গম্ভীর, আরও আত্মপ্রত্যয়ে সুদৃঢ়।

ঘাসু একবার চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল: আমাকে বিশ্বাস হয় না? নিজের ইমানকেই তবে জিজ্ঞাসা করুন। আপনাদের ধর্মই কি ইহা বলে—এমন করিয়া প্রজা-রায়ত সকলের উপর এই পীড়ন? আমার মেয়েকে আমার জামাইর হাত হইতে ছিনাইয়া রাখা—ইহা কি আপনাদের ধর্মেই বলে?

সনাতন কথা বলিতে পারে না।

ঘাসু চলিয়া গেল। নিবেদন জানাইয়াই চলিয়া গেল—আমাদের সঙ্গে আসিলেন না, হুজুর। তবু আপনার ইমান আপনি ঠিক রাখুন।

অন্ধকার আকাশের শত চক্ষু সনাতনকে আবার প্রশ্ন করিতে লাগিল: সনাতন, সনাতন, রাজা-রাজ্যের কথা নয়, নবাবী-বাদশাহীর মামলা নয়, ধর্মরাজ্য স্থাপনের স্পর্ধা নয়। ইহা যে সহজ কথা, তোমার

ভূমিকা

আমার গৃহধর্মের কথা ; স্ত্রী পাইবে না স্বামীর সঙ্গ ? তোমার ইমান তুমি ঠিক রাখিতেছ কি, সনাতন ?

রাত্রিতে সনাতন পত্নীকে বলিল : সেদিন আমিনার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের রহমানরা মারধোর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

শিশুপুত্রকে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্ত্রীও স্বাভাবিকভাবে বলিলেন : শুনিয়াছি। রহমানের স্ত্রী আসিয়া কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর নিকট সেদিন গল্প করিতেছিল। স্পর্ধা কিন্তু কম নয় ইয়াকুবদের।

সনাতন একটু নিরাশ হয়। পরে ধীরে ধীরে বলে : তাহাদের স্পর্ধা কেন ? আমিনাও বড় হইয়াছে, তাহার ব্যাটার বউ, ইয়াকুব আপন গৃহে লইয়া যাইতে চাহিবেই ত।

—হাঁ। কিন্তু এখন ধান-কাটা হইতেছে। রহমানের জায়গা-জমি আছে। চাষের ফসল ঘরে আসিবে। এখন বাডির একটা মেয়েকে সে পরের বাড়ি পাঠাইবে কিরূপে ?

—ইয়াকুবেরও ত ধান আছে। বাড়িতে কাজকর্ম আছে।

—থাকিলই বা। সে কামলা নিক। ব্যাটাকে না হয় আবার বিবাহ দিক, না হয় আমিনাকে তালাক দিক,—ওর মামুর ছেলেকে বিবাহ করিবে। তাহা নয়, ইয়াকুবের ব্যাটার সাহস কত—এই গ্রামে আসে জোর করিয়া মেয়ে কাড়িয়া লইতে। ইহা সেনেদের কারসাজি—

সনাতন বুঝিতে পারিল না—সেনেদের আবার ইহাতে কি কারসাজি।

পত্নী শিশুপুত্রকে সযত্নে শোয়াইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ পরে সনাতন আবার প্রশ্ন করিল :

ভূমিকা

—তোমাকে যদি তোমার পিতা আমাদের বাড়িতে পাঠাইতে না চাহিতেন, তাহা হইলে কি তাহা ভালো কাজ হইত?

তন্দ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বসিলেন পত্নী। কথাটা কি তিনি ঠিক শুনিতে পাইয়াছেন? জিজ্ঞাসা করিলেন: কি বলিতেছিলে?

সনাতন কথাটা পুনর্বার বলিল। বিস্ময়ের অবধি রহিল না বধূর।

—আমার পিতা আমাকে কেন পাঠাইতে চাহিবেন না?

—রহমান চাহে না কেন?

কথাটার অর্থগ্রহণ করিতে সময় লাগিল বধূর। তারপরে তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। হাসির ধ্বনি কানে পৌঁছিতেই মুখে আঁচল গুঁজিয়া নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইলেন। না, তিনি ইদানীং ছেলের মা হইয়া বড় অসাবধান হইয়া পড়িতেছেন।

—তুমি এত হাসাইতে পার! এখনি কেহ হাসির শব্দ শুনিত, লজ্জায় মাথা কাটা যাইত।

—হাঁসি নয়, সত্য বলিতেছি।

—কি?

—রহমান আমিনাকে শ্বশুর গৃহে পাঠাইতে যেমন চাহে না, তোমার পিতাও যদি তোমাকে তেমনি আমাদের গৃহে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইতেন—

বধূ হাসিয়া কহিলেন: তোমার যেমন অদ্ভুত কথা! উহাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয়? উহাদের মেয়ে অর্থ কাজের একটা লোক। আমার বাপের বাড়ি লোকজনের অভাব নাকি? বিবাহ হইয়াছে, গোত্রান্তর হইয়াছে; আমাদের পক্ষে শ্বশুরবাড়িই আপন বাড়ি;—বাপের বাড়ি আর যাইতেও নাই।

বারো তেরো বৎসর পূর্বে বৎসর সাতের এই বালিকা পিতৃগৃহ ত্যাগ

করিয়া চৌধুরীবংশের পুত্রবধূরূপে এই গৃহে আসিয়াছিল। চৌধুরীবংশের বধূর দায়িত্ব ও মর্যাদা তাহার পক্ষে আজ এতই সহজ হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার সেই সাত বৎসরের শৈশব-স্মৃতি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সেই দায়িত্ব ও মর্যাদার অলক্ষিত ছিদ্রপথে অকস্মাৎ এই রাত্রির অন্ধকারে তথাপি সেই অবলুপ্তপ্রায় স্নেহ সজল মায়ের মুখ, পিতামহীর আদর ও স্বর্গগত পিতার আশীর্বাদ বধূর মনের দুয়ারে একবার এখন ছায়াপাত করিল। একবার পার্শ্বস্থ শিশুপুত্রকে সে বুকের নিকটে টানিয়া লইল। পরক্ষণে অনালোকিত স্মৃতির লোক হইতে আবার সুপ্তির শান্ত শীতল অন্ধকারে চৌধুরীবংশের পুত্রবধূ নিমজ্জিতা হইয়া গেলেন।

সনাতন চৌধুরীর মনই শুধু আপনাকে ততক্ষণ খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। এতই কি সহজ এই কথা, সহজ এই মীমাংসা? কেন তবে সে তাহা বুঝিতেছে না, গ্রহণ করিতে পারে না? সবাই যাহা বুঝিতে পারে, সে কেন বুঝিতে পারে না? কেন সে এখনো মানিতে চাহে না—ঘাসু ঢালীর মেয়ের উপরে তাহার শ্বশুর ও স্বামীর দাবী নাই, তাহার পিতারও দাবী নাই—তাহারা পদ্মনাভ চৌধুরীরই প্রজা-রায়ত; পদ্মনাভই তাহাদের ইষ্টানিষ্টের, ইচ্ছানিচ্ছার নিয়ন্তা? কেন সে উত্তর দিতে পারে না ঘাসুর এই অভিযোগের 'নিজের ইমানকে জিজ্ঞাসা করুন! আপনাদের ধর্মই কি ইহা বলে—প্রজা-রায়ত সকলের উপর এমন পীড়ন।'

প্রশ্নে প্রশ্নে রাত্রির অন্ধকারকে আলোড়িত করিয়া তোলে সনাতন। প্রভাতের আলোক বহিয়া আনে মানুষের জীবনের নূতন প্রবাহ—নূতন ঘটনা—নূতন উৎপীড়ন, নূতন বেদনা—নূতন প্রশ্ন।

'মন্বন্তরের' ছায়ায় আচ্ছন্ন রাঢ় বরেন্দ্র। পূর্ব বাঙলায় সে বিভীষিকা তত ঘনায়িত নয়। তথাপি কঠোর। সাধারণ সময়েও এই অঞ্চলে

খাদ্যশস্য যথেষ্ট নয়; দুর্বৎসরে তাই দুর্ভিক্ষ হইবেই। বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ-ভাটির ধান চাউল এখন ঢাকার পথে কলিকাতার দিকে যাইতেছে।

গোরাই শেখ কাঁদিয়া পড়িল—বাঁচান। কুঠির পাইকার জহিরুদ্দীন। গোরাই আগেই তাহাকে বন্ধক দিয়াছে সর্বস্ব। এখন জমিদারের খানা-বাড়িতে কাজ করিয়া খাইত গোরাই ও তাহার স্ত্রী। দুইটা ছেলেমেয়ে মরিয়াও তিনটা বাঁচিয়া আছে। বড় ছেলেটা বড় হইতেছে, কিন্তু হাবা। কর্ত্রীমা যতটা পারেন ছোট দুটিকেও ভাত, চিঁড়া, মুড়ি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জহিরুদ্দীনকে ত গোরাই শুধু জমিই বন্ধক দেয় নাই, সপরিবারে যে বন্ধক দিয়াছে সর্বস্ব। জমির সঙ্গে তাই জহিরুদ্দীনের এখন সেও গোলাম হইতে চলিয়াছে। জহিরুদ্দীন মেঘনায় নূতন চর বন্দোবস্ত লইয়াছে; গোরাইকে সপরিবারে সেইখানে পাঠাইবে।

গোরাই বলিল: হুজুর। আপনাদের চিরদিনই আমরা গোলাম। আমাকে কিনিয়া রাখুন—বউটাও না হইলে বাঁচিবে না।

পদ্মনাভ পারিলে গোরাইকে রক্ষা করিতেন—তিনি জমিদার, তাঁহার প্রজা তাঁহার এলেকা হইতে বিক্রয় হয়। কিন্তু জহিরুদ্দীন কুঠির পাইকার। সনাতনের ব্যাপারে অনেক করিয়া তিনি একবার সাহেবদের ক্রোধ শান্ত করিয়াছেন—এই বেণী গোমস্তা, গুরুপদ দালাল, জহির পাইকাররা তখন সহায়তা করিয়াছে। এখন তিনি উহাদের সহিত কলহ করিতে পারেন নাকি? উহারা কোম্পানির পাইকার। তাহা ছাড়া, গোরাইর মত মুসলমান পরিবারকে হিন্দুরা কেন ক্রয় করিবে? ইহারা ঘরে-দুয়ারে কাজ করে না। আর, দুর্ভিক্ষের দিনে গোলাম কিনিয়া

তাহাদের খাওয়া-পরার ঝক্কি লইবে এমন মূর্খ কোন হিন্দু বা মুসলমান মুনিব ?

সনাতনও ইহা বুঝে। কিন্তু তথাপি যখন গোরাইর চিরদিনের সেই ভীত দুর্বল অসহায় দৃষ্টি দেখে তখন সে বিচলিত হয়। জহিরুদ্দীন এই বউটাকে লইবে, ছেলে দুইটাকে তাড়াইয়া দিবে,—হয়ত মারিয়াই ফেলিবে,—গোরাইর স্ত্রী কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর কাছে তাই কাঁদিয়া পড়িল। তিনি চমকিত হইলেন। বউটা ভালো ; ছেলে দুইটীর উপরও কেমন মায়া হয়।

পদ্মনাভ চৌধুরী পৌত্রের অন্নারম্ভের প্রস্তাবটা গৃহিণীকে সাড়ম্বরে শুনাইতেছিলেন—ব্রাহ্মণ ভোজন, পণ্ডিত বিদায়, ইত্যাদি।

কর্ত্রী হঠাৎ বলিলেন, গোরাই ও তাহার বউকে খালাস করিতে হইবে।

এই কথা এখন কেন ? পদ্মনাভ প্রথম বিস্মিত হইলেন, তারপর বলিলেন : এ বুদ্ধি কে দিল বলিলেন : তোমাকে ? ওই পণ্ডিত পুত্রটি বুঝি।

—যে-ই দিক। ইহা তোমাদের জমিদারীর কাজ নয়। আমার পৌত্রের অন্নারম্ভ। তোমাদের জমিদারী হইতে তোমাদের প্রজা-রায়ত বিক্রয় হইয়া যায়, অথচ তুমি করো ব্রাহ্মণ ভোজন ও পণ্ডিত বিদায়ের বড়াই।

কলহ হইল—যেমন হয়। কিন্তু তাহাতেই বা কি ফল ? পদ্মনাভ জানেন, এখন গোরাইকে মূল্য দিয়াও পাওয়া যাইবে না—জহিরুদ্দীন নূতন চরে গোরাইকে পাঠাইয়াছে, তাহার পাইকদের হেফাজতে উহারা সেখানে চাষবাস করিবে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীও বুঝিলেন, তিনি আর কি করিবেন ? এবং দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি যেন একটু নিঃশ্বাস ছাড়িয়াও বাঁচিলেন।

ভূমিকা

সনাতন কিন্তু ভুলিতে পারে না গোরাইর সেই মুখ। লোকটা সকলকেই ভয় করে, জীবন ভরিয়া সে মারই খাইল।

পুত্রের অন্নারম্ভ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতেছি। পদ্মনাভ মাথট যাহা আদায় করিলেন, ভুরিভোজনে এই দিনে তাহার অপেক্ষা বেশিই ব্যয় করিবেন। সত্যই সাড়ম্বর উৎসব।

কিন্তু সনাতনের শ্বশুরালয় হইতে কেহ তখনো আসিতেছে না। ভাগিনেয়র এই শুভকর্ম মাতুলদেরও প্রথাগত উৎসব। কিন্তু চ্যাটুজ্জেরা যেন তাহাতে আগ্রহহীন। কৌলিন্যের হিসাবে তাঁহারা চৌধুরীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, চৌধুরীদের পূর্ব-পুরুষের শ্রৌত্রেয় সম্পর্ক ঘটিয়াছিল বলিয়া জনশ্রাত আছে। তদুপরি পদ্মনাভ চৌধুরী এখন চ্যাটুজ্জেদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতেও ছাড়েন না। তাঁহারাও এই উপলক্ষেই সম্ভবত তাই চৌধুরীদিগকে নিজেদের কুল-পরিচয় প্রকারান্তরে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলেন। পদ্মনাভের পত্রবাহক যায়, চাটুজ্জেরা বলেন, 'ব্যস্ত কি ? যে হউক মাতুলেরা একজন যাইবে। দেখি কাহাকে পাঠানো সম্ভবপর।' অবশেষে জনার্দন কুটুম্বদের আহ্বান করিয়া আনিতে গেল। তাহাতে চাটুজ্জেদের মর্যাদা হয়ত কতকটা সংরক্ষিত হইল। সাত বৎসরের একটি ছেলেকে তাঁহারা ভাগিনেয়'র অন্নারম্ভে যোগদান করিতে পাঠাইলেন। সামান্য এক টুকরা সোনাও সঙ্গে নাই।

পদ্মনাভের ললাটে ভ্রূকুটি ঘনাইল, কিন্তু কিছুই তিনি বলিলেন না। কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু চৌধুরী বাড়ির সকলেই বুঝিল ঝড় ঘনাইয়া আসিতেছে।

ভূমিকা

ঝড় সনাতনের মনের উপর অন্য দিক হইতে প্রথম ভাঙিয়া পড়িল। অর্ধাহারে-অনাহারে লোক দুই-এক জন করিয়া মরিতেছিল। সে ত দুর্ভিক্ষ হইলে মরেই, মরিবেও। পরিবার গ্রামে ফেলিয়াও কিছু লোক নানা দিকে পলায়ন করিতেছিল। ইহাও বরাবরই ঘটিয়াছে। তাহার জন্য আদায়-উশুল ত জমিদার বন্ধ রাখিতে পারেন না। ষোল আনা রাজস্ব সরকারও ছিয়াত্তরে পাইল। সেদিকে কোনো গোল নাই।

মহী দাস কৈবর্ত তাহার বিধবা শ্যালীকে 'সাঙ্গা' করিয়া স্ত্রী রূপে ঘরে আনিয়াছিল। সে উহারা আনে—উহারা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নয়। বিধবাকে ঐরূপ স্ত্রীরূপে এই সব ছোট জাতি রাখে,—এই বিবাহকে বলে 'সাঙ্গা'। পদ্মনাভ তাহাতে আপত্তি দেখেন না। এমন কি, যখন রাজ রাজবল্লভের সঙ্গে তাঁহাদের বিচার হইয়াছে তখনো তিনি ইহার বিরোধিতা করেন নাই। বরং বৈদ্যদের বিদ্রূপ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আপনারা যদি ছোট জাত হইতেন, কিংবা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সাঙ্গা সাদি যাহা কিছু করিতেন, কিছুই অন্যায় হইত না। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু হইয়া শাস্ত্রবিধি অবজ্ঞা করিবেন কিরূপে?" তবে তখন হইতে তিনি জানাইয়াছিলেন—শূদ্রেরা ইচ্ছা হয় বিধবাকে সাদি করুক, কিন্তু ব্রাহ্মণরা উহাদের সেই বিবাহে যেন মন্ত্র না পড়ায়। অবশ্য এই সব অনেক জাতের ব্রাহ্মণরাও সমাজে পতিত; তাহারা মন্ত্র পড়াইবে কি? জানিবেই বা কি করিয়া? মূর্খদের মধ্যে অনুস্বার-বিসর্গ ছড়ায় মাত্র। তবে, তাহাও এই ক্ষেত্রে চলিবে না। মহীরও তাই মন্ত্র পড়িয়া এই বিবাহ হয় নাই। সে তাহা চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহার পুরোহিত চৌধুরী কর্তার শাসনে সাহসী হয় নাই। মহী দাসও কম নয়। সে বলিল, বেশ ঠাকুর, মন্ত্র যখন পড়িবেন না, পুরোহিত বলিয়া আমিও আপনাকে দক্ষিণা দিব না।—পঞ্চায়েতেও তখন মহীকে কিছু

বলে নাই—তাই সাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পদ্মনাভ তখন শহরে ছিলেন। কালী দত্ত নিজের তহুরি আদায় করিয়াছে, কিন্তু মহীর নিকট হইতে জমিদারের সেলামীও আদায় করে নাই। তখন পদ্মনাভেরও অবশ্য দুর্ভাবনার দিন ছিল। কিন্তু এখন পদ্মনাভ কোম্পানির আশ্রিত জমিদার। এদিকে মহীর সেই শ্যালীর গর্ভে প্রথম ছেলে হইয়াছে। বিধবা স্ত্রীর পুত্রজন্মে জমিদারে 'ধারিচা' দিয়া এখন ব্যবস্থা না করিলে মহীর এই পুত্রকে জমিদার স্বীকার করিবেন না, সেও মহীর বাড়িঘর জমির উত্তরাধিকারী হইবে না। গদাই দত্ত তাই এবার মহীকে বাগে পাইয়াছে—ঢালী পাড়ার ঘাসু, আর এই দাসপাড়ার মহী—ইহারাই আসল বজ্জাত। পদ্মনাভও ছাড়িবেন না—সাঙ্গা উহারা যেভাবে এখন করিতে হয় করুক, কিন্তু জমিদারের সেলামী ও ধারিচা দিবে না—এত দুঃসাহস? সুদে-আসলে এখন মহীর দিতে হইবে ছয় টাকা নগদ—দুই টাকা সেলামীর দুই বৎসরে চক্রবৃদ্ধি সুদ, আর ধারিচার দুই টাকা—তারপর নায়েব পাইক-বরকন্দাজের তহুরি, সেও এক টাকা প্রায়।

মহীও এখন আর উদ্ধত নাই। বংশে তাহার এই একমাত্র ছেলে। পূর্ব স্ত্রী নিঃসন্তানা মরিয়াছে। এই তাহার উত্তরাধিকারী। মহী ধরিয়া পড়িল: হুজুর মাপ করুন।

অন্য কেহ হইলে পদ্মনাভ চৌধুরী কিছু মকুপ করিতেন। কিন্তু মহীকে তিনি ছাড়িবেন না। উহার পিছনে একটা বেয়াদব প্রজার দল আছে। তিনি জমিদারী হাতে লইতেই তাহারা নানা সূত্রে আদায়-ওয়াশিলে বাধা দিতেছিল। ঘাসুটা পালাইয়া গিয়াছে, এখন নাকি ডাকাতি করে মেঘনাতে ও চরে। সেই মেরুদণ্ড'ভাঙিয়া দিতে হইবে। তাই শুধু সেলামী, ধরিচা নয়। শালিয়ানা দিয়াছে কি মহী? দেয় নাই? তিন সাল ধরিয়া মহী এই গ্রামে কাজ করে না; মধ্যমগ্রামের

গুপ্তদের কাজ করে। অথচ চৌধুরীদের পুরাতন লাখেরাজ সে খায়। বেগার দেয় নাই কেন তবে মহী? পদ্মনাভ নূতন কাছারি-বাড়িও তুলিয়াছেন। এখন নাটমণ্ডপের কাজ হইবে। ওদিকে পুকুর কাটিতেছেন; বাগনের গাছ কাটা চলিতেছে। কোনো কাজেই মহীকে পাওয়া যায় নাই—এ মুখই আর মহী হয় না। 'চাল-সেলামী' দিয়াছে কি সে? দেয় নাই। জমিদারকে ঘরের কাজের জামস্তানী বেগার না দিয়া বৎসরে বৎসরে জমি ভোগ করিতেছিল, তাহা মনে নাই? হাঁ, 'পীরের দরগায়' শবেরাতের দস্তুরী দিয়াছে—কারণ, ফুল শাহ্ ফকির উহাদের সাঁই হইয়াছেন। কিন্তু জমিদারের কাছারির দেওয়ালির দস্তুরি দিয়াছে কি মহী?—হিসাব করিতে বসিযা কেবলই তন্খা বাড়িয়া যায়।

মহীদাসের মনে পড়িল—ফুল শাহ্-এর দরবারে সে ছোট চৌধুরীকে কয়েকবার দেখিয়াছে। তিনি একটা উপায় করিবেন না?

সনাতন এবার পিতার নিকটে আসিয়া স্বয়ং দাঁড়াইল। অপরাহ্নে অর্ধশায়িত অবস্থায় পদ্মনাভ সরবৎ পান করিয়া বিদরি টানিতেছিলেন।

সনাতন বলিল: এই শাল প্রজা-রায়তের উপরে মাথট বসাইবেন না।

পদ্মনাভের প্রথম বিশ্বাস হইল না—সনাতন তাঁহার সহিত আদায়-উশুল বিষয়ক কথা বলিতে চাহে। তিনি মুখ তুলিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন: কিছু বলিলে?

—হাঁ। —সাহস বুঝি উবিয়া যায় সনাতনের। কিন্তু তথাপি সে বলিবে। শান্ত কণ্ঠে সনাতন বলিল: হাঁ। তারপর স্থিরভাবে জানাইল: প্রজাদের উপর এই দুঃসময়ে নূতন করিয়া আববওয়াব বসাইবেন না।

পদ্মনাভ বিদরি হাতেই এবার টান হইয়া বসিলেন। সনাতনের চোখের উপর চোখ রাখিলেন—চোখ ত নয় যেন অজগরের গ্রাস।

—কোন্ আবওয়াবের কথা বলিতেছ? —পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করেন।

একবার সনাতন ইতস্তত করিল। তারপর স্পষ্ট বলিল: মহী দাসের ধারিচার কথা বলিতেছিলাম।

পদ্মনাভ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি স্থির জানেন—এই দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইবার মত মেরুদণ্ডের শক্তি সনাতনের কেন, কাহারও নাই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাঁহার বিস্ময় বাড়িয়া চলিল—সনাতন এখনো ভাঙিয়া পড়িতেছে না যে। কেমন অবিশ্বাস হইল সমস্ত দৃশ্যে।

পদ্মনাভ বলিলেন: উহা নূতন আবওয়াব নয়।

—না হউক। মহীর ছেলে হইয়াছে, বংশে ছেলে জন্মিলে সকলেরই আনন্দ হয়; এই দুর্দিনে তাহার জন্য কাহাকেও সর্বস্বান্ত করিলে আমাদেরই কি মঙ্গল হইবে?

—মহীর ছেলে হইল কবে? সে ত একটা জারজ।

সনাতনের মুখ আরক্তিম হইল। এ কি বলিতেছেন তাহার পিতা! সে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। পদ্মনাভই বলিলেন: সেই বিধবা শ্যালীটার ছেলের কথা বলিতেছ ত? সে ত ষাঁঢ়ীর গর্ভের ছেলে!

সনাতন সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল: হাঁ। মহী তাহার শ্যালীকে বিবাহ করিয়াছিল।

পদ্মনাভ স্থির কণ্ঠে বলিলেন: না। বিধবার বিবাহ হয় না।

সনাতন এইবার সহজভাবে বলিল: আমাদের মধ্যে হয় না, শূদ্রদের বিধবা বিবাহ হয়—সাঙ্গা।

আবার সনাতন তাকাইয়া রহিল। পদ্মনাভ টান হইয়া বসিলেন,

বলিলেন : যাহা রাজা রাজবল্লভ আমাকে স্বীকার করাইতে পারেন নাই, তাহা তুমি স্বীকার করাইতে পারিবে না। বিধবার 'বিবাহ' হইবে না। বিধবার হইয়া তুমিও ওকালতি করিও না।

সনাতন মাথা নত করিল, পরে বলিল, বেশ, সাঙ্গাই হোক্। কিন্তু সেই ছেলেও ত ছেলে—

—হাঁ, ছেলে, তবে জারজ!

সনাতন নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বলিল, ইহা ঠিক নয়। শূদ্রদের এইরূপ ছেলে বরাবরই হইত।

—হইত—হইবে। এবং জমির ওয়ারিশ হইতে হইলে তাহারা ধারিচা দিবে, খাজনা দিবে।

সনাতন আশার আলোক দেখিতে পাইল :—এই দুর্দিনে উহাদের ধারিচা বরং মাফ করিয়া দিন্।

এবার পদ্মনাভ বলিলেন : দিতাম। কিন্তু মহীকে দিব না। দাস পাড়ার মানুষগুলিকে সে-ই নষ্ট করিতেছে। আমি তাহাকে ঘাসু ঢালীর মত গ্রাম-ছাড়া করিব। দেখি কে তাহাকে বাঁচায়,—সেনেরা কি করিতে পারে।

সনাতন শেষ চেষ্টা করিল; সেনেরা নয়। ফুল শাহ ফকির বলিতেছিলেন—আপনি রহম করুন্। মহীর ছেলে হইয়াছে, আনন্দের কথা। তাহাতে কেন আপনিই বা খুশী হইবেন না?—আপনারও ত প্রজাবৃদ্ধি হইল। ফুল শাহ বলেন, 'মহী চৌধুরী সাহেবের পুত্রতুল্য, চৌধুরীরাই ত উৎসব করিবে মহীর পুত্রলাভে।'

পদ্মনাভ গম্ভীর হইলেন। বিদরির নল নামাইয়া বলিলেন : ফুল শাহ-এর সঙ্গে আমার কলহ নাই। কোথায় তিনি পলাইয়া ফিরেন জানি না। কিন্তু ঢালীপাড়া, দাসপাড়ার মানুষদের যদি তিনি

পীর, তবে দেশে এই সব কি হইতেছে ? কুঠির সাহেবরা জানাইয়াছেন--'যত বদমায়েস, ডাকাত আজ ফকির-সন্ন্যাসীর পোষাক পরিয়া চারিদিকে জুটিয়া রাজ্য লুঠপাট করিতেছে। এখানে ফুল শাহ্-এর নিকটও যেই সব লোক জুটিত তাহাদের মতিগতি ভালো নয়।' বেণী চন্দ তোমাকেও সাবধান হইতে বলিয়াছেন—ফুল শাহ্-এর সহিত সম্পর্ক তুমি ত্যাগ করো।

সনাতন বলিল: তিনি ফকির, ভগবানের প্রেমিক, সকল মানুষেরই দরদী। তাঁহার নিকট জমিদারই বা কি, রায়তই বা কি ?

—থাকুন তিনি ভগবানের আসক লইয়া। কিন্তু মানুষের হইয়া মাথা ঘামাইতে যান কেন ? জমিদার জায়গীরদার ও প্রজা-রায়ত এক সমান নয়।

—উইঁারা ফকির মানুষ। উইঁাদের কথা এই যে, ভগবানের রাজ্যে সবাই সমান।

—ভগবানের রাজ্যে, কিন্তু মানুষের রাজ্যে নয়। সেই রাজ্যে রাজা উজির জমিদার জায়গীরদারের হুকুমই চলিবে।

ফুল শাহের নামেও সনাতন যখন প্রতিকার পাইল না তখন সে হতাশ হইল। পুরাতন বিক্ষোভও তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, মনে-মনে পিতার সমস্ত কথারই সে প্রতিবাদ করিতে লাগিল।

বিক্ষোভের আবর্ত গভীর হইতে লাগিল। সে আপনার গৃহে আপনার পত্নীর নিকট সান্ত্বনা চাহিল—সে-ই তাহাকে ধর্মের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু শুনিতে শুনিতে পত্নী কেমন এবার শঙ্কিত হইলেন, বলিলেন: তুমি ধার্মিক মানুষ। কিন্তু পাপ কোন্ সূত্রে আসে তাহা

কে বুঝিবে? বিধবাদের বিষয়ে তুমি এইসব কেন ভাবিতেছ, কে জানে।

সনাতন চমকিত হইল। এক মুহূর্তে মনে হইল সুদূর হইতে একটি ছায়া এই গৃহ মধ্যে তাহার ও তাহার চিরপরিচিতা পত্নীর মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গৃহ, এই শান্ত প্রদীপ ভাতি, এই নবজাত শিশু-জীবনের সুন্দর মধুর বন্ধন,—সবই আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে যাহা ছিল না,—যাহা থাকিবার নয়,—সেই এক আবেগতাড়িতা, আশ্রয়হীনা, প্রিয়-প্রণয়-বিধুরা নারীর স্মৃতিচ্ছায়াও উদিত হইয়াছে।—কোথায় কালিন্দী? সনাতন শুনিয়াছে চূড়াদি'র মদন-মোহনের মন্দিরের দেব-বিগ্রহের সেবায়, বিনোদনে সে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে; সে আর গৃহে ফিরে নাই, ফিরিবে না। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-স্বপ্নে সে বিভোর—অগ্নিশুদ্ধ ভক্তিতে সে সুন্দর। চূড়াদি'ত তত দূর নয়। কিন্তু কত দূর-দূরান্তরে সেই তুলনায় সনাতন। আর ইহা কি তাহারই মোহময় বিভ্রান্তি—কালিন্দীকে সে ভুলিয়াও ভোলে নাই? না, সংশয়-সন্দেহ-ভরা সংসারের কুটিল অন্ধকারই কি সনাতনের স্বচ্ছ, সহজ জীবনপথের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে? তাঁহার অমলিন মনের মধ্যে জীয়াইয়া তুলিতেছে এই ছায়ামূর্তি—কালিন্দী?—সেই ছায়া স্মৃতি···স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতা, প্রণয়-বেদনায় আত্মহারা সেই বিরহিণীর ব্যাকুলা মূর্তি—সনাতনও কি তাহাকেই কামনা করিতেছে?

সনাতন কোথায় তাকাইবে—পত্নীর শঙ্কিত ব্যথিত সরল মনের দিকে? না, প্রশ্ন-বিদীর্ণ, আশঙ্কায় আবর্তিত আপনার অন্তরের দিকে?·

ভাগ্যক্রমে সনাতন এই আত্ম-পরীক্ষায় নিমজ্জিত থাকিবার ম একান্ত অবকাশ পাইল না।

ভূমিকা

বাহিরের ঘটনাস্রোত আবর্তিত হইয়া উঠিতেছে : মহী দাস, ঘাসু ঢালী, গোরাই শেখ ; তারপর ঢালীপাড়া ও দাসপাড়া, আর ফুল শাহ ফকির ; এবং তাহার সহিত ফকির বিদ্রোহ, সফর আলীর যোগাযোগের জনশ্রুতি, ধূমকেতুর মত অদৃশ্য সফর আলীর সর্বত্র ধাবমানতা—আর তাহারও পশ্চাতে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, অত্যাচারে-অত্যাচারে দিশাহারা, লক্ষ্যহারা জনতার বিদ্রোহ ;—কোথাও দস্যুতায় তাহার পরিচয়, কোথাও দাঙ্গায়, লুণ্ঠনে, সংঘর্ষে ইহার প্রকাশ। কিন্তু চিত্রিসারের পদ্মনাভ চৌধুরীদের হিসাবে—মূর্খ সনাতনের দুর্বলতার সুযোগ তখনি প্রথম গ্রহণ করিল কালচিতার সেনেরা —তাহারাই প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইল চৌধুরীদের মহালে। প্রথমত, ঘাসু সর্দার তাহার মেয়েটাকে একরাত্রিতে ঢালীপাড়ার প্রজাদের যোগাযোগে চিত্রসার হইতে ডাকাতি করিয়া লইয়া গেল। প্রথম লইয়া গেল ইয়াকুবের গৃহে। তারপর যখন পদ্মনাভ চৌধুরীর পাইক, বরকন্দাজ লইয়া কালচিতা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, সেনেরা ঘাসুর মেয়ে-জামাইকে গোপনে অন্যত্র অপসারণ করিল। ভিটা-ছাড়া মহীদাস তখনই কালচিতা হইতে আসিয়া আবার নিজের ভিটায় দেখা দিল। একযোগে জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল এখন দাসপাড়া ও ঢালীপাড়া। সঙ্গে সঙ্গে, ঘাসু ডাকাতের ও মহী কৈবর্তের নেতৃত্বে মাতিয়া উঠিল এলেকার যত চাঁড়াল, চামার, কাপালি, পাটনি, কোচ, রাজবংশী, কামার, কুমার। বারুই, তিলি, তামলী, যোগী, জোলারা প্রকাশ্যে যোগ না দিলেও গোমস্তা, পাইকার, যাচনদারের বিরুদ্ধে গোপনে-গোপনে উহাদের সহায়তা করিতেছিল। মেঘনার চর হইতে জহিরুদ্দীনের লোকদের তাড়াইয়া দিল ঘাসু ডাকাত। হাটে পাইকারদার মাল লুঠ হইল। গোমস্তাদের গোলা লুঠিতে গিয়া খুনাখুনি হইল। আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল গুরুপদ

দালালের আড়ত। ইহারই নাম ফুল শাহ্ 'ফকিরের জেহাদ'—বেইমানের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে মোল্লা ইমামের ফতোয়া ও বাহির হইল ফুল শাহএর বিরুদ্ধে—তাহাকে ধরিতে পারিলে কুফেরির জন্য কাজী মোল্লারাও প্রাণদণ্ড দিবে। জহিরুদ্দীনের নূতন চরে হইল ডাকাতদিগের আড্ডা। তাহার পাইকারী গোলায় আগুন ধরাইয়া দিল ফুল শাহ্-এর শিষ্যরা। তাহাদের সর্দার হইয়া উঠিল ঘাসু ঢালী ও মহী দাস। তাহারা প্রচার করিয়া দিল—দুনিয়ায় রাজা নাই, জমিদার নাই। আছে দুনিয়ার পয়দাদার খোদাতালা, আর নিম্নস্থ জমিনের ফসলের মালের পয়দাদার কৃষক ও কারিগর। ইহাই ফকিরের ফতোয়া, ফুল শাহ্-এর উপদেশ। তাহা জারী করিতে আসিতেছেন সফর আলী গাজী; নসরার রাজ্য ধ্বংস করিয়া পূর্ণিয়া, রংপুর, ঘোড়াঘাটের পথে তিনি আলাপ সিং দিয়া ফকিরী ফৌজ লইয়া আসিতেছেন—এই অঞ্চলে।

এই দস্যুতায় দাঙ্গা-ফ্যাসাদে ও পদ্মনাভ চৌধুরী বিচলিত হইবার মত মানুষ নহেন। কিন্তু সনাতন তাহার পিতার সমস্ত প্রয়াস বিনষ্ট করিয়া দিল নিজের ইচ্ছায়। কালচিতার সেনেদের চক্রান্তই সার্থক হইল।

তৎপূর্বে পদ্মনাভ চৌধুরীও একটা নূতন রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মহী দাসের ব্যাপারটা লইয়া সনাতন মাতিয়াছে কেন, হঠাৎ তাহা তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন। বিধবার জন্য ওকালতিতে পাইয়াছে তাহার এই মূর্খ 'পণ্ডিত' পুত্রটিকে। কিন্তু কেন? কালিন্দীকে ভুলিতে পারে নাই বুঝি? কেন ভুলিতে পারে নাই? অবশ্য, গৃহে পত্নী ছিল। কিন্তু ঘরে পত্নী থাকিলেও, একাধিক পত্নী থাকিলেও, পুরুষ ত পুরুষই। অবশ্য সনাতন স্ত্রৈণ। তবে হয়ত সে-ও একেবারে

মূর্খ নয়; সে পদ্মনাভ চৌধুরীর পুত্র। পদ্মনাভ ভাবিয়া আশ্বস্ত বোধ করিলেন। অবশ্য সনাতনের সন্তান হইয়াছে। সে পদ্মনাভের ভাবী বংশধর। —তাহা এমন কিছুই নয়। অন্য একটি পুত্রবধূ সংসারে আনিবেন পদ্মনাভ চৌধুরী। পরক্ষণেই মনে পড়িল—হাঁ, চ্যাটুজ্জেদের অপমানটার উত্তরও তাহাতে দেওয়া যাইবে।

মনে পড়িল, হরিহর ঘোষাল কুলীন, তাহার পুত্র মৃত—পৌত্রীই তাহার সম্বল। অবশ্য সেদিনও ছিল সে কাজীদের তহশীলদার—ছাতা মাথায় দিয়াও চৌধুরীবাড়িতে আসিত না। কিন্তু সেই পৌত্রীটিকে জনার্দনের দ্বিতীয় পত্নী করিবার কথাই এতদিন পদ্মনাভ ভাবিতেছিলেন। তাহা হইলে কালচিতার সেনেরা আর কাজীদের ওই মহালটা ইজারা লইয়াও লাভ পাইবে না। হরিহরের অবর্তমানে সেই শিকমি তালুক তখন আসিবে চৌধুরীদেরই হাতে। তালুকটা যে করিয়াই হউক চৌধুরীদের চাই। অধিকন্তু সৎ কুলীন ঘোষালের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে চ্যাটুজ্জেরাও জব্দ হইবে।

পদ্মনাভ চৌধুরী হরিহর ঘোষালের নিকট ঘটক পাঠাইলেন।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি?

পদ্মনাভ একবার দীর্ঘ চক্ষু তুলিয়া বলিলেন: সব কথাই তোমাদের জানাইতে হইবে নাকি? —বড় ক্রুর গম্ভীর স্বামীর কণ্ঠস্বর।

হাতের পাখা নড়িতে লাগিল—চৌধুরী কর্তা আহারে বসিয়াছেন। কর্ত্রীর মুখে আর কৌতূহল ব্যক্ত করিবার সাহস নাই।

একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পদ্মনাভের কানে গেল। রূপার বাটিতে গরম দুধ হাওয়া করিয়া পুত্রবধূ ঠাণ্ডা করিতেছিল। পদ্মনাভ তাহাকে-

উদ্দেশ করিয়া কহিলেন: তোমার ভাইরা কেহ ত ভাগিনেয়র অন্নারম্ভে আসিতে পারেন নাই। ভগ্নীপতির বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিবেন কিনা, ভাবিতেছি।

বধূ নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহিল।

বিস্ময়-মিশ্রিত স্বরে কর্ত্রী এবার বলিলেন: তার অর্থ?

পদ্মনাভ একটু কঠিন হাসি হাসিলেন: কুলীন সন্তান, এক বিবাহ। এমন কুলীনকে কে মানিবে? তাহার শ্যালক সম্বন্ধীরাও মানে না। তাহাদের অন্য ভগ্নীপতি গুটি দশেক বিবাহ করিয়াও এখন পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হন নাই।

কর্ত্রী বলিলেন: তাই বলিয়া তুমি সনাতনের আবার বিবাহ দিবে নাকি? ইহাও একটা কথা!

—কথা নয়, প্রস্তাব প্রায় স্থির। দীয়াতারার হরিহর ঘোষাল দিন সাতেকের মধ্যে আশীর্বাদ করিতে আসিবে।

কর্ত্রী সাহস হারাইতেছিলেন। কিন্তু মুখে না দমিয়া তথাপি একবার বলিতে গেলেন: তাহা হইবে না। কথা নাই বার্তা নাই, তোমার খুশী মত—কিন্তু কথা শেষ হইতে পারিলেন না। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টির তলায় তাঁহার সমস্ত প্রতিবাদ তলাইয়া গেল। দুধের বাটীতে চুমুক দিয়া তাহা শেষ করিতে করিতে খানিকক্ষণ পরে পদ্মনাভ একবার কর্ত্রীকে বলিলেন: বিশ্রামের পরে সনাতনকে একবার পাঠাইয়া দিও।

কর্ত্রী উত্তর দিলেন না।

সনাতন নতশিরে দাঁড়াইয়া সব শুনিল: হাঁ, মিথ্যা নহে ফুল শাহ ফকিরের আস্তানায় দাসপাড়া, ঢালীপাড়ার সকলে যাইত। তাহাদের

বৈঠকও হইত। বিলটির চরে এখন ফুল শাহ আছেন, হয়ত চলিয়া যাইবেন। সনাতন চেষ্টা করিয়াছিল প্রজাদের শান্ত করিতে। কিন্তু শুধু ত মহী বা ঘাসুর কথা নয়। জহিরুদ্দীন পাইকার, গুরুপদ দালাল, বেণী গোমস্তা—ইহারা যে আজ মানুষকে বাঁচিতে দেয় না।

—ফুল শাহ্ তাহাদের বাঁচাইবেন? —পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করেন ব্যঙ্গ ভরে।

—না। তিনি বরং বলেন, বাঁচাইবেন ভগবান। বাঁচিবে উহারা—তাঁহার অনুগ্রহে।

—দেখি কে বাঁচায়, কে বাঁচে। কিন্তু শোনো, তোমার আপাতত এই সব লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না। দিন ক্ষণ ঠিক হইতে দেরী নাই। ঘোষাল মহাশয়রা আশীর্বাদ করিতে আসিবেন—আগামী দ্বাদশীতে। এখন যাও।

সনাতন নড়িল না। পদ্মনাভ কহিল: কি, অন্য কোনো কথা আছে?

—হাঁ।

—বলো।—পদ্মনাভ অত্যন্ত সাধারণ স্বরে বলিলেন।

সনাতন শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। তারপর বলিল: ইহার কোন প্রয়োজন নাই।

পদ্মনাভ গম্ভীরভাবে কহিলেন: প্রয়োজন আছে কি না আছে, তাহা আমি বুঝিব। তোমার ভাবনার কি দরকার?…কি দাঁড়াইয়া রহিলে যে?

—ভাবিতেছি।

—ভাবনার ইহাতে কি?—পদ্মনাভ উঠিয়া বসিলেন: বিবাহ করিবে। পুরুষ মানুষ, বয়সও মাত্র ত্রিশ। কুলীন সন্তান, তথাপি ভাবনা? ইহা আমি শুনিতে চাহি না, দেখিতেও পারি না।

ভূমিকা

বিদরিতে ঘন ঘন কয়েকটি টান দিয়া ধূম উদ্গীরণ করিয়া সনাতনকে তিনি বলিলেন : যাও।—বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

ফুল শাহ্ লিখিলেন—গোলাপের দিন ফুরায় না। গুলবাগের মাটিতে লাগিয়াছে মরুভূমির মড়ক। দিলের রক্ত ঢালিয়া অভিষেক করো প্রিয়ের সেই বাগিচার। গোলাপ ফুটিবে, বুল বুল গান বন্ধ করিও না।

খণ্ড চাঁদের আলো আসিয়া গৃহতলে পড়িয়াছে। বাহিরে বৃক্ষপত্রে তখনো বৃষ্টির জল শুকায় নাই। পাতার উপরে আশ্বিনের আকাশের চন্দ্রকিরণের তরল স্বচ্ছতা। বাতাসে আর্দ্রতার আভাস। স্বামী-স্ত্রী নিঃশব্দ। নিস্পন্দ পাশাপাশি বসিয়া কেহ কাহারও দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতেও পারিতেছে না।

চোখের কোণ মুছিয়া পত্নী বলিলেন : আমার অদৃষ্ট। তুমি তাহা ঠেকাইবে কি করিয়া ?

সনাতন মুখ তুলিল না, কথাও কহিল না। সত্য-সত্যই অদৃষ্ট। জীবন কোথা দিয়া বহিয়া কোন ঘাটে আসিয়া পৌঁছয়, কে বলিতে পারে ? সাফর আলীর সঙ্গে তাহাকে কোথায় সে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। আজ হরিহর ঘোষালের সঙ্গে কোথায় আনিয়া ঠেকাইতে চাহিতেছে। কোথায় তাহাকে টানিয়া লইতে চাহে এখনো ঘাসু ঢালী ও মহী দাস—দুর্ভিক্ষে, অত্যাচারে, উৎপীড়িত এই বিদ্রোহী তাহার প্রিয় প্রজারা। অদৃষ্টই বুঝি। একদিন আপনারই অজ্ঞাতে সে এক বালিকাকে জীবনের মধ্যখানে টানিয়া আনিয়াছিল,—সেদিনও তাহার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন উঠে নাই। আজ আবার কাহার সহিত তাহার জীবন ও ভবিষ্যৎকে জুড়িবার জন্য তাড়না চলিয়াছে ;—আজও কেহ তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার

মর্যাদা দিবে না। ইহাই কি অদৃষ্ট? মানুষের খেয়াল-খুশীর মধ্য দিয়া উৎকট পদক্ষেপে সেই উন্মাদ দেবতা যদৃচ্ছা ফিরিয়া বেড়ায়। অদৃষ্ট! হাঁ, অদৃষ্ট নহে ত কি? জীবনকে কে এমন টানিতেছে, বুনিতেছে, ছিঁড়িতেছে, জুড়িতেছে? রাগ-বিরাগের সন্ধান লয় না; ভালো-মন্দের বালাইও তাহার নাই।

পত্নী তাহার অশ্রুমুক্ত চোখ দুইটি তুলিয়া একবার সনাতনকে দেখিল। তাহার স্কন্ধে নিজের হাতখানি সস্নেহে রাখিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল: তুমি কেন ভাবিয়া দুঃখ পাও। তোমার ত দোষ নাই।

দোষ!—সনাতন তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: দোষ কি তোমারই?

—না, দোষ নয়; তবে ললাটের লিখন। কে খণ্ডাইবে বলো? না হইলে আমার পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে তোমাদের মনান্তর ঘটিল কেন?

—তাহার জন্য তোমাকে পাইতে হইবে শাস্তি? আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে দণ্ড?—ঘোষালের মত নিমকহারামের সঙ্গে করিতে হইবে কুটুম্বিতা! আমায় সমস্ত অন্তরাত্মা ভাবিতেও বেঁকিয়া দাঁড়ায়—

পত্নী বুঝাইলেন: তুমি ওকথাটা অত ভাবো কেন? ঘোষাল মহাশয় পদস্থ লোক, সু-কুলীন। উপযুক্ত ঘর। আর, কর্তাঠাকুর ত মিথ্যা বলেন না—কুলীনের বংশে দ্বিতীয় পরিণয় কে না করে? তোমার ভগ্নীদেরও ত গৃহে সতীন রহিয়াছে। আমার দিদি ত স্বভাব কুলীন ফুলে মেলের মুখুজ্জে মহাশয়কে বৎসরে একবারও দেখিতে পান কিনা সন্দেহ। তাই বলিয়া দিদি কি মরিয়া আছেন? মায়ের অবর্তমানে তিনিই ত আমার পিত্রালয়ের কর্ত্রী। অত বড় সংসার তাঁহার স্কন্ধে।

সনাতন শুনিতেছিল। স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছিল স্থিরস্বভাবা নারীর ব্যথিত-গম্ভীর অন্তর-শ্রী। কথা তাহার কানে যাইতেছিল; সুপরিচিত

কথা—কিন্তু তবু যেন মনে হয় আর-এক জন্মের কথা। এ জন্মের যে মানসিক লোক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে যেন এই সব সচরাচর সত্য তাহার অজ্ঞাত, অপরিচিত, অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয়। সে কি করিয়া বুঝাইবে এই স্থিরস্বভাবা নারীকে—ইহা সবই সত্য, অতি সত্য; কিন্তু তথাপি তাহার চক্ষে এই যুক্তির মর্যাদা নাই, তাহার পক্ষে ইহা অবাস্তব।

—তুমি ভাবিতেছ কেন?—পত্নী জোর করিয়া হাসিয়া বলিতেছেন—যে-ই আসুক, দেখিবে আমি এই সংসারে তাহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিব। তোমার কোনো বেগ পাইতে হইবে না। এসো,—এবার নিদ্রা যাও শান্ত মনে—

স্বামীর হাত ধরিয়া সে তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। তাহার কথায় জোর-করা স্বচ্ছন্দতা, অশ্রু-ধৌত মুখখানিতে হাসির আভাস।

সনাতন সেই মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া নিঃশব্দ হইয়া গেল। বেদনার উপরে হাসির রেখা, এই চন্দ্রকিরণচর্চিত ধরণীর মত স্নেহময়ী, বেদনা-নিলয়া নারীমূর্তি,—তাহার মমতাভরা হৃদয়খানি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।—কিতাবের গুলবাগ ছাড়িয়া, গুলাবের মায়া কাটাইয়া, তাহার অন্তরের বুলবুল বুঝি আর-একটা অমৃতের সন্ধান পাইল—সাকীর সরাব নয়, সর্বংসহা এই সখীর মমতাই বুঝি এই বিশ্বের পরম রস।···

দিন যত ঘনাইয়া আসিল, বিস্ময়ের ভাবও ততই সকলের মনে লঘু হইয়া গেল। তথাপি কর্ত্রী ঠাকুর'ণীর আবার কথাটা পাড়িতে হইল: আমি বলি উহাতে কাজ নাই। তোমার বিষয়-আশয়, দাস-দাসীর অভাব নাই। কেন ঘোষালের নাত্‌নিকে বিবাহ করিবে সনাতন ওই দুই-চরিটা মোজার জন্য? আমারও ভাল লাগে না, 'তাহারও অমত।

ভূমিকা

—তাহার মতামত কে জানিতে চাহিয়াছে? তুমি?—এই রুষ্ট কঠিন কণ্ঠস্বরে কর্ত্রী তৎক্ষণাৎ সাবধান হইলেন।

—শোনো কথা। আমি চাহিব কেন? সে নিজেই বলিয়াছে। আর যদি না ই বা বলিত, কে না জানে কাজীদের তহশীলদার এই হরিহর ঘোষাল, তাহাদের খাইয়া-পরিয়া মানুষ। কাজীদের সম্পত্তি হাত করিয়াছে। সফর আলীকে সে ধরাইয়া দিবার ফিকিরে ছিল। এমন নিমকহারামের বাড়িতে সনাতন পদার্পণও করিবে না।

পদ্মনাভের নিরুদ্ধ ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল: থামো। তুমি এবং তোমার ছেলে,—আর যদি ঐ বউটারও তেমন দুর্মতি থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও বলিতেছি সে-ও যেন জানিয়া রাখে,—আমার কথার নড়চড় হয় না। এই বিবাহ সনাতনকে করিতেই হইবে। সফর আলী ত রাজদ্রোহী। ফুলশাহ্-এর মতই ডাকাতের দল চালায়। কালচিতার সেনেরা আমার প্রজাদের আমার শত্রু করিতেছে—আমাকে ফাঁকি দিয়া মৌজাটাও গ্রাস করিতে চায়। আমি থাকিতে তাহা হইবে না।

এই উদ্দীপ্ত রোষের সম্মুখে কর্ত্রী আর মুখ খুলিতে সাহসী হইলেন না। পদ্মনাভ টান হইয়া বসিলেন। অন্তরালস্থিতা বধূকে বলিলেন: —তোমার শাশুড়ী বলিতেছিলেন, সনাতন নাকি ঘোষলের নাতনিকে বিবাহ করিতে চাহে না। শুনিলাম দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণেই তাহার অমত। যাহাই হউক, ইহাতে তোমার কতটা হাত আছে, জানি না। তোমাকে অতটা মন্দ বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু সনাতন যদি অবাধ্য হয় তাহাকে জানাইও,—আমি পদ্মনাভ চৌধুরী, এ বাড়িটা এখনো আমার। আমার দুশমন আমার প্রজাদের সঙ্গে সে এই বাড়িতে বসিয়া মিতালি করে, আর আমার অবাধ্য হইবে,—এই যদি তাহার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মাথা লইয়া এ বাড়িতে আর তাহার না ঢোকাই ভালো।

বস্ত্রাভ্যন্তরে বধূর দেহ কাঁপিতে লাগিল। পদ্মনাভ বিদরিতে লম্বা লম্বা টান দিলেন। পরে ধীরস্বরে বলিলেন: তুমি বাড়ির বড় বউ, এখন কর্ত্রী-বউ, এই কথা মনে রাখিও। সনাতন না হয় পড়িয়া-পড়িয়া ভূত হইয়াছে; কিন্তু তুমি ঘরের লক্ষ্মী। চৌধুরী গোষ্ঠীর সব ভারই ত আজ বাদে কাল তোমার ঘাড়ে পড়িবে, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? একটু থামিয়া শেষে বলিলেন: যাও।

পদ্মনাভ কাছারিবাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। কর্ত্রী কিন্তু থামিলেন না: বলিলেন, তুমি বউএর সম্মুখে অমন করিয়া তাহার স্বামীর নিন্দা করিলে, উহার মনে কী হইল?

পদ্মনাভ হাসিয়া উঠিলেন: উহার মানে কি হইবে? একটা ছোট, সাত বৎসরের মেয়ে আসিবে। তাহার ভয়েই মায়ের আঁচল ধরিয়াছেন বীরপুরুষ—তিনি আবার সফর আলীর দোস্ত, ঘাসু ডাকাত আর মহী বদমাসের মুরুব্বি। দেখিব তাহাও।

মাঠের ধারে ছোট চৌধুরীর অপেক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া সেদিন ঘাসু ডাকাত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।—সনাতন কি জানে না—ফুল শাহ-এর খবর লইয়া ঘাসু আসিয়াছে? সাবধান হইয়া থাকুন ছোট চৌধুরী! ঘোষালের বেইমানি আর জমিদারের অত্যাচার কিন্তু মহী দাস বা ঘাসু ঢালী ভুলিয়া যায় নাই। — কিন্তু সনাতনের দেখা নাই। কোথা হইতে উল্টা ঘাসুকে ঘিরিয়া আসিল হঠাৎ চৌধুরীদের বরকন্দাজ, সিপাহী। প্রাণের মায়া তাহাদের বেশি;—অথবা ঘাসুকে সত্যই ধরিতেও তাহারা চাহে নাই। আপনার লাঠির জোরে ঘাসু পালাইয়া বাঁচিয়াছে। ধরা পড়িল না।

পদ্মনাভ ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিলেন।

ভূমিকা

পরদিনই চৌধুরী হাটের গোমস্তার গোলায় আগুন লাগিল। উহাই সূচনা।

আকাশে সেদিন চাঁদের খোঁজ নাই। মেঘের ছায়ায় তাহার আলোও মরিয়া গিয়াছে। মাঝে-মাঝে দুই-এক পশলা বৃষ্টি কোথা হইতে ছুটিয়া আসে। আবার, কিছুক্ষণ পরে তেমনি ছুটিয়া পালায়। বাদলা বাতাসের আঙুল যেন রাত্রির দেহ জড়াইয়া ধরিয়াছে।

পত্নী বলিতেছিলেন: তুমি এই সব কথা কেন বলিলে? ইহা বলিবার কি দরকার ছিল, তাহা বুঝি না।

সনাতন সহজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল: কেন বুঝিতেছ না? যাহা হইতে পারে না, তাহা আগেই বলা উচিত।

—হইতে পারে না কিরূপে? কর্তা ঠাকুর বিবাহ স্থির করিয়াছেন, ঘোষাল মহাশয়কে তিনি কথা দিয়াছেন। তুমি তাঁহার কথা অমান্য করিবে কিরূপে?—ম্লান দীপালোকে বিস্ময়বিহ্বলা নারী শঙ্কিত চক্ষে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল।

—যিনিই স্থির করুন, যিনিই কথা দিন্, যাহা অসম্ভব তাহা অসম্ভবই। চিরদিনকার মত শান্ত কণ্ঠ সনাতনের। কাঠিন্যও নাই, দ্বিধাও নাই। দৃঢ় সংকল্পেই যেন শান্ত।

নির্বাক-বিস্ময়ে স্বামীর দিকে পত্নী তাকাইয়া রহিলেন। অনেক দিন তাঁহার মুখে অনেক কথা তিনি শুনিয়াছেন। সেই সব কথা এতই অদ্ভুত যে তাহার তিনি কূল-কিনারা পান নাই। শুনিলে অনেক সময় হাসি পায়। কেহ কেহ নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার স্বামীর বুদ্ধি ও আচরণে নানা মত প্রকাশ করিত। গৃহের দাস-দাসীরা 'ছোট চৌধুরীর' দয়া-অনুগ্রহ অজস্র লাভ করিয়াও হাসিয়া বলিত, তাঁহার স্বামী পণ্ডিত প্রকৃতির অর্থাৎ

মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত। শ্বশুরের আশা ও গর্ব যে কি করিয়া ক্রমে নৈরাশ্য ও বিরাগে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি কথা বধূর মনে আছে। কিন্তু তাঁহার আপন মর্মমূলে এই ভীতু প্রকৃতির স্বপ্নাতুর মানুষটির জন্য শ্রদ্ধা তাহাতে এক কণাও হ্রাস পায় নাই। দুর্জ্ঞেয়-পথযাত্রী মানুষটির জন্য স্নেহ ও ভালবাসা বরং বেশি করিয়াই সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সে স্ত্রী—বাহিরের পৃথিবীতে স্বামীর বিপদ আপদ সে ঠেকাইতে পারে নাই। সে নিজেও বোঝে—লোকে মিথ্যা বলে না; শ্বশুরেরও নিরাশ হইবার কারণ আছে। কিন্তু ইহাও সে বোঝে—না হয় তাহার স্বামী দশ জনের মত নয়; না হয় সে একটু 'অদ্ভুত ধরণের'; একটু 'কেমনতর',—শুধু ইহাই ত। কিন্তু তিনি অধার্মিক নন, নিষ্ঠুর নন, তাঁহার হৃদয় মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যে গলিয়া যায়। তাই ত তিনি বিষয়-কর্ম বোঝেন না; নানা বিপদে জড়িত হইয়া পড়েন। সত্য কথা, চৌধুরী গোষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের এইরূপ হইলে চলিবে কেন?—ইহাও বধূ বোঝে। তিনি চতুর হইবেন, বিচক্ষণ হইবেন, জবরদস্ত হইবেন,—ইহাই ত চাই। কিন্তু বিধাতা যাহাকে সেইরূপ করিয়া গড়েন নাই, তাহাকে কি এইজন্য দোষ দেওয়া যায়?' সেই অপরাধে তাহাকে পরিহাস করা কেন? পরিহাসের দিকেও যাহার দৃষ্টি নাই তাহাকে পরিহাস করিতে ইহাদের বাধে না? স্বামীর ভীত দৃষ্টি, নীরব শঙ্কিত যাতায়াত, সঙ্গিহীন একান্তে দিন-যাপনা—মাঠে, বিলের ধারে, নদীর তীরে,—অনির্দেশ্য অপরাধের আশঙ্কায় সতত ত্রস্ত হইয়া উঠা; সেই করুণ সুন্দর মুখের উপর বিষাদের ছায়া লাগিয়া থাকা;—এই সব দেখিতে দেখিতে একটা সরল সহজ মমতায় তাহার বধূ-হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। না হউন তিনি চতুর, কর্মকুশল, চৌধুরীদের 'বড় কর্তা'; না হয় একটু 'অদ্ভুত মানুষই' এই ফার্সি-সংস্কৃত পড়া মানুষটি। সে কাহাকেও

তিরস্কার করে না; কাহাকেও শাসন করিতে পারে না; কাহারও উপর জোর খাটাইতে চাহে না;—সতাই শান্ত, স্বতন্ত্র, 'অদ্ভুত'! ইহাকে কথা বুঝাইয়াও বুঝানো যায় না—এমনি অদ্ভুত মানুষ। ইহার কথাও —বুঝা সত্ত্বেও—আবার বুঝিয়া উঠা যায় না;—এমনি অদ্ভুত সেই কথা। তাহা শুনিলে সময়ে সময়ে বধূরও হাসি পায়। কিন্তু তখনি এই মানুষটির চোখে ত্রস্ত সঙ্কোচের দৃষ্টি ফোটে, তাহাতে এই তরুণী বধূর অন্তর কাতর হইয়া উঠিত। এই ভাগ্যবতী যুবতীর মন অমনি মমতায় সন্নত হইয়া আসে—পথভোলা ছোট ছেলের মত ভীত-চকিত চাহনি তাহার চোখে—নিরীহ শিশুর মনে অজ্ঞাত অপরাধে যেমন বিমূঢ় জিজ্ঞাসা জাগে, ইহাও যেন সেইরূপ। পত্নী তখন হাসিয়া ফেলিতেন।

স্তিমিত দীপালোকে আজ সেই চোখ, সেই মুখ যেন স্ত্রী দেখিতে পাইলেন না। কোনো শান্ত বিষণ্ণ চোখ, তাঁহার মনকে মায়ায় সিক্ত করিতে পারিল না। সনাতনের এই স্থির, উত্তেজনাহীন কঠিন দৃঢ় সংকল্প যেন কঠিন, ভীতিকর রহস্যের মত আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। পিতার আদেশ সে ব্যর্থ করিবে:—পদ্মনাভ চৌধুরীর আদেশ—সফর আলীর প্রতি দুর্জ্ঞেয় সেই মোহে—ঘোষালের প্রতি দুরপনেয় ঘৃণায়। এ কোন্ সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত কথা? বিবাহ: পুরুষের পক্ষে তাহা আবার ভয়-ভাবনার জিনিস কী? ঘোষালের কৌলিন্য, তাহার সম্পর্কে নূতন বিত্তলাভ, ইহাতে অগৌরব কোথায়? অন্য রূপ দ্বিধা, আপত্তি আসে কোথা হইতে? আসে সেই ফুল শাহ ফকিরের প্ররোচনায়—কালচিতার সেনেদের ষড়যন্ত্রে; আর জমিদার গোমস্তা সকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ওই প্রজাদের আকর্ষণে বুঝি? এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস চৌধুরীদের সহিত অদৃষ্টের! চিত্রিসারের পদ্মনাভ চৌধুরী—তাহার সংকল্প ব্যর্থ করিবে তাঁহারই পুত্র, চৌধুরী গোষ্ঠীর ভাবী বড় কর্তা?

স্বামীর সুবুদ্ধিতে পত্নীর কোনো দিন আস্থা ছিল না। কিন্তু আজ তাঁহার মনে হইল—না, তাঁহার স্বামী শুধু অদ্ভুত নহে,—সে ত শিশুর মত অদ্ভুত নয়—সে উন্মাদ। সম্ভব ও অসম্ভবের ভেদরেখা তাহার নিকট অস্পষ্ট, হিত ও অহিতের পার্থক্যও তাহার অপরিণত বোধশক্তিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। সে রহস্যময় নয়, দুরপনেয় বিভীষিকা! এই স্বামীকে সে কোনদিন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সে অদ্ভুত, সত্য ; ভয়ঙ্কররূপে অদ্ভুত, উন্মাদের মত অদ্ভুত।

স্নেহাবেগে আজ আর সেই পত্নী-মন ভরিয়া উঠিল না, অন্ধকারে আপনার মধ্যে সে কাঁপিতে লাগিল।

ত্রাস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পত্নী বলিলেন : ছিঃ! ছিঃ! চৌধুরী কর্তা কথা দিয়াছেন, আর তুমি তাহা ব্যর্থ করিবে? মানুষে বলিবে কি? চৌধুরীদের মুখ থাকিবে কোথায়? আমরা মুখ দেখাইব কি করিয়া?

সনাতন চমকিত হইল, উত্তর দিল না। অন্ধকারে পত্নীকে দেখা যায় না। গবাক্ষপথে নিষ্প্রভ ম্লান দূর বৃক্ষশিরের দিকে সে তাকাইয়া রহিল। 'চিত্রিসারের চৌধুরী', 'পদ্মনাভ চৌধুরীর পুত্র সনাতন চৌধুরী' :—কোথায়, এই পরিচয়ের দুর্মদ মহিমা ত তাহার অন্তর হইতে অভ্রংলিহ মহিমায় জাগিয়া উঠিল না! পৃথিবীর উপর তাহার একমাত্র সত্য, একমাত্র পরিচয় বলিয়া এই মন্ত্রটিকে ত সনাতন আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিতেছে না। অথচ চৌধুরীদের সেই গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার দায়িত্ব লইয়া সে-ই আসিয়াছে এই বংশে এই পর্যায়ের অগ্রে অগ্রে। তাহারই হাতে সেই জন্ম-নিমেষে চৌধুরীদের পিতৃপুরুষেরা তাঁহাদের সেই দর্পের দানও গচ্ছিত করিয়া গিয়াছেন। কোথায় সে দান, কোথায় সে দর্প, কোথায় সে গরিমা-বোধ? বাহিরে সে তাকাইতে পারিবে না, তাহা সে জানে—ঘাস্থ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, মহীর

শূন্য ভিটা ধূ ধূ করিয়া উঠিবে, চতুর্দিকে অত্যাচার-জর্জরিত মানুষের বিদ্রোহমুখী তাড়না তাহাকেও টানিয়া লইতে চাহিবে। না, বাহিরে সে তাকাইবে না। কিন্তু আপনার অন্তস্তলে তাকাইয়াও যে সে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না—কোথায় সেই চৌধুরী মহিমা? কী মূল্য এই পরিচয়ের?

পত্নী আবার বলিলেন: না, না, তুমি চৌধুরীদের নাম ডুবাইয়া দিতে পারিবে না। তোমার মাতা, তোমার পিতা—আর তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র—উহার পরে পৃথিবীতে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

পরগৃহে পরগোষ্ঠীতে জন্মিয়াছে এই রমণী। চিত্রিসারের চৌধুরীদের সহিত তাহার না আছে রক্তের সম্পর্ক, না থাকিবে সেই বংশ-পীঠিকায় তাহার নাম। তথাপি ইহার নিকট চৌধুরীদের নাম আজ এমন অপরিত্যাজ্য সত্য হইয়া গিয়াছে! তাহার জন্ম, তাহার কৈশোর, তাহার আপনার সুখ, সৌভাগ্য, একান্ত নির্ভর ভালোবাসার উপরও জাগ্রত হইয়া আছে এই সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী গরিমা-বোধ। সে আর সনাতনের জন্য মুখ দেখাইতে পারিবে না। শুধু সে নয়, তাহার সন্তানও পারিবে না—মুখ দেখাইতে।···অথচ তেরো চৌদ্দ বৎসর পূর্বে এই নারীর নিকট চৌধুরীদের নামও ছিল অপরিচিত, পৃথিবীর সহস্র জিনিষের মতই সামান্য, সহজ। তেরো চৌদ্দ বৎসর পূর্বে··· সেদিনকার বালিকার ভীত সরল দৃষ্টি সনাতনের মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল লাল পট্টবস্ত্রাবৃত সেই চন্দন-চর্চিত কাঁচা ঢল ঢল মুখ।

সনাতন অন্ধকারে একবার সেই বালিকাকে আবার স্মৃতিপথে খুঁজিতে বাহির হইল। নাই, কাঁচা ঢল-ঢল প্রথম দেখা সেই মুখ আর নাই। সেই হরিণগতি, হরিণনয়না কিশোরী নাই। যাহার মঞ্জরীত, পল্লব-সমৃদ্ধ রূপ সনাতনের এবার চোখে পড়িল সে পরিপূর্ণদেহা, সুপ্রতিষ্ঠিতা, মর্যাদা-

অভ্যস্থা; তাহার আচরণে কোথাও অনিশ্চয়তার ছায়া নাই। কণ্ঠে চিত্রিসারের চৌধুরী-কর্ত্রীর চিরদিনকার ঘোষণা, পরিমিত দাক্ষিণ্যময় সেই কঠোর ও অকুণ্ঠিত বিচার···সনাতন, তোমার জন্য পৃথিবীতে মুখ দেখাইতে পারিবে না তোমার পিতা মাতা; তোমার স্ত্রী আর পুত্রও।

সনাতন মুখ ফিরাইয়া লইল—একবার নিজের অন্তরের দিকে তাকাইল। সে, সনাতন, সমাজ ও সংসারের জীবনযাত্রার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে পারে নাই। সকলের মতই উহা সে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু তথাপি সে স্বতন্ত্র হইয়া রহিল; চৌধুরী কর্তা হইয়া উঠে নাই; আত্মবিস্মৃত হইতে সে পারে নাই; আপনার স্বপ্নলোকে সে স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়া গিয়াছে। সত্য, তাহার অভ্যস্ত সাধারণ গৃহ-জীবনের মধ্যেই এই পত্নীকে সে পত্নীরূপে পাইয়াছে—গৃহিণীরূপে পাইয়াছে। কোনোদিন তাহার অন্তর্লোকের সেই পত্নী তাহার স্বপ্নের বধূ হইয়া উঠিবার কথা নয়, উঠিতে চাহেও নাই। নির্জন আত্মার সেই লীলাবাসর তেমনি নির্জন।···শূন্য সেই গর্ভমন্দির!

'শূন্য মন্দির মোর'···কাহার এই বুকভাঙা ক্রন্দন সেইখানে? সনাতনের আপন অন্তরের তলে? সনাতনের বাহিরের ঐ পৃথিবীতে? কাহার?···কাহার?···

সনাতন বুঝিল—তাহার অন্তরে আযৌবন এই সুর ধ্বনিত করিয়াছে—কালিন্দী।

হেমন্তের স্বল্পায়ু দিন চোখের জল লইয়া দেখা দিতে না দিতেই চোখের জলে বিদায় লয়। শুধু রজনী সেই তাহার ক্ষুব্ধ ক্লান্ত দেহটিকে বুকে জড়াইয়া বসিয়া থাকে, তাহার চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

সহস্র চক্ষু আকাশ বেদনাতুর দৃষ্টি মেলিয়া দেখে এই অশ্রুর অভিষেক, এই মৌন ক্রন্দন। শিশির ধোয়া গাছের শিয়রে, ঘাসের উপরে, মেঠো ফুলের শয্যায় হেমন্তের কুয়াসা লুটাইয়া পড়িয়া থাকে; শাদা, হাল্কা, বেধ-বন্ধহীন,—মৃত্যুলোকের ছায়াদেহীর মত সেই কুয়াসা।

সনাতন শুনিয়াও শোনে না—খাল ছেঁচা লইয়া জেলেদের সঙ্গে চৌধুরীদের লোকজনের সঙ্গে মারামারি হইয়াছে; খোঁজও রাখে না—বেণী গোমস্তার নূতন মহালের প্রজারা বড খালের জলকর বন্ধ করিয়া একটা দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়াছে; জহিরুদ্দীনের নূতন চরে গোরাই শেখকে খালাস করিয়া ঘাসু ঢালী নিজের আস্তানা বাঁধিতেছে—ফুল শাহ সেইখানে চলিয়া গিয়াছেন। সনাতন শোনে নাই—চারিদিকে জনরব সফর আলী আসিতেছে। চৌধুরী বাড়িতে অবশ্য এই সব আলোচনার অবকাশ নাই। সেখানে এবার পদ্মনাভ চৌধুরী সমারোহ একটু বেশি করিয়াই করিবেন—বৈবাহিক চ্যাটুজ্যেরা বুঝিবেন তিনি পদ্মনাভ চৌধুরী,—সনাতনের দ্বিতীয় পরিণয় হইতেছে উচ্চকুলীন ঘোষালের পৌত্রীর সঙ্গে।

হাঙ্গর-মুখো নূতন পাল্কী সাজিতেছে। কাজীপাড়ার কর্তৃত্ব থাকিতে এত সাহস মধ্যমগ্রামের গুপ্তদেরও হইত না যে পাল্কীতে যাতায়াত করে। কিন্তু এখন বেণী গোমস্তাও পাল্কীতে চলে; গুরুপদ দালাল ছাতা মাথায় দিয়া কাছারিতে আসে। ঘোষালের নাতনি, চৌধুরী বাড়ির বউ হইতে আসিবেন; পাল্কীতে আসিবেন না ত কি, এখনও ডুলিতে আসিবেন নাকি? রূপায় বাঁধানো হাঙ্গরের মুখ, বেহারাদের পরনে হরিদ্রাভ ধুতি, পাল্কীর দুয়ারে চারিদিকে কাজ করা পর্দা—কন্যার সঙ্গে যাইবে একদল ঢাকী, এক দল ঢুলী। কালচিতার বুকের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইবে জোর ঢাক-ঢোল বাজাইয়া. পাইক-বরকন্দাজও থাকিবে। [illegible]

বিবাহ ত নয়, এ যে সম্পত্তি দখলেরও মহড়া। তাই কন্যা 'চলন' করিয়া আনিবেন স্বয়ং ছোটবাবু জনার্দন চৌধুরী।

সনাতন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কোলাহলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। কখনো তাহাকে অধ্যাপক-ব্রাহ্মণেরা ডাকান। কখনো অন্তঃপুরে কোনো একটা স্ত্রী-আচারের নামে ডাকান মাতা ও আত্মীয়-কুটুম্বরা; তাঁহারা বুঝাইতে থাকেন, এখন আপত্তি করিয়া আর অমঙ্গল ডাকা কেন? কখনো সনাতন আপত্তি করে, কখনো যন্ত্রচালিতের মত সব সহিয়া যায়—বিধাতা তাহাকে লইয়া একি খেলা খেলিতে চাহেন? এক একবার উৎসব তাহাকে ছাড়িয়া অন্য দিকে বহিয়া যায়—বাজীর পরীক্ষা হইতেছে, বাজনার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, পাঁচালীর আসার জমিয়াছে। সনাতন মুক্তি পায়—কোথায়, কে সে, এই নিয়ম-বন্ধহীন, ন্যায়-অন্যায়হীন বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে?

শঙ্কর দীঘির পাড়ের ঝোপে-ঝাড়েও আর তিষ্ঠিবার স্থান নাই। সনাতন চৌধুরী মনে হয়—সব অর্থহীন, যুক্তিহীন। বায়ুহীন এক বিস্ময় শূন্যতা তাহার চারিদিকে—তাহার অন্তরে শূন্যতা, এক কদাকার বিকৃতি বাহিরে। ওই তো কাছাড়িবাড়ির প্রাঙ্গণে মশালের আলো জ্বলিতেছে। তাহার আলোকিত পরিমণ্ডলের মধ্যে মাঝে মাঝে ছায়ামূর্তির মত মানুষগুলিকে দেখা যায়। কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে; কেহ দাঁড়াইয়া অপর কাহারও সহিত হাত-পা নাড়িয়া কথা বলিতেছে। মানুষ নয়—যেন মানুষের বিকৃতি। সম্মিলিত কোলাহলের মধ্যে তাহাদের কথা আপনার স্বরূপ হারাইয়া ফেলিতেছে। কথা ত নয়, কথার বিকৃতি, অর্থহীন, ঐক্যহীন, ছন্দোহীন—কতকগুলি আওয়াজের আবর্ত। কান পাতিয়া শোনা যায় না, কান পাতিলেও তাহার মর্মগ্রহণ করিবার উপায় নাই। মর্মহীন শব্দের ওলট-পালট, ধ্বনির বিকৃত তাণ্ডব।

ভূমিকা

মানুষের কথার জ্যোতির্ময় রূপ কোথায়? কোথায় মানব-চিত্তের শান্তোজ্জ্বল সেই জ্যোৎস্না? পরিচ্ছন্ন চেতনার সেই রসঘন বিকাশ?

ছুটিয়া একটা লোক বাড়ির দিকে আসিল। দেহের প্রকাণ্ড ছায়াটা প্রাঙ্গণ-শেষের অন্দর মহলের বেড়ায় পড়িয়া নাচিতেছে। বহ্ন্যুৎসবে আকৃষ্ট যেন একটি পতঙ্গের ছায়া। কাহারা বাহির হইয়া আসিল। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া হাত-পা নাড়িয়া লোকটা কি বলিতেছে। সরু সরু হাত ও আঙুলের লম্বা লম্বা ছায়াগুলি বাড়ি ঘরের গায়ে যেন আঁচড় কাটিতেছে।

—ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে সকলে—কালচিতার মাঠে।

—ডাকাত? না, সেনেদের লাঠিয়াল?

—ডাকাত। ঘাসুকে ত সকলেই চিনে। আর মহীকেও তাহারা দেখিয়াছে। ঘাসু বলিয়াছে, 'ছোট চৌধুরী, আমি তোমার লাঠির ওস্তাদ ঘাসু ঢালী। কিন্তু তোমাকে চাই না। চাই হুজুরকে (পদ্মনাভ চৌধুরীকে)। জিজ্ঞাসা করিতাম—আমাদের মেয়ে আটকান, আমাদের বউ বাতিল করেন জমিদারের কোন্ নিয়মে? দেখুন, আমরা তোমাদের ছেলেকে আটকাইয়া রাখিলে কেমন হয়? আমাদের বাড়িঘর কুঠিয়ালরা পোড়াইল; গোমস্তা-দালাল পাইকারের হাতে তুলিয়া দিলে তোমরা তোমাদের দশপুরুষের প্রজা-রায়ত। কোন্ বেইমানি করিয়াছিলাম আমরা?' ছোট চৌধুরী বলিলেন, 'তোমরা ডাকাত।' 'হুঁ, ডাকাত হইলাম আমরা? —বলো, কুঠিয়াল-জমিদারের এই ডাকাতি খতম না করিয়া আমাদের ডাকাতি থামাই কি করিয়া?'

পদ্মনাভ অধীর কণ্ঠে বলিলেন: থামা তোর গল্প। বল পাত্রী কোথায়? ছোটবাবু কোথায়?

—পাত্রী ঘোষালের বাড়িতে। পথেই ডাকাত পড়িল। ঘাস্থ বলিয়াছে—'ফুল শাহ্-ফকিরের হুকুম—বড়বাবুর বিবাহ এই বেইমান হরিহর ঘোষালের মেয়ের সঙ্গে হইবে না। বড়বাবু বেইমান নন।'

পদ্মনাভ চীৎকার করিয়া উঠিলেন: সেই সেনেদের চক্রান্ত ডাকাতের সর্দার ফুল শাহের সঙ্গে। আমার ছেলের বিবাহ আমি দিব। তাহাতে কি ফুল শাহের হুকুম চাই?

পদ্মনাভ তারপর গর্জন করিয়া উঠিলেন: বিবাহ এইখানেই হইবে, এই দিন। এই ডাকাতি নিশ্চয়ই সেনেদের কাজ। ছোটবাবুকে এখনই উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে—আমি পদ্মনাভ চৌধুরী থাকিতে কে তাহাকে ধরিয়া রাখে দেখিব। মশাল জ্বালা। থানাবাড়ির মাঝি মাল্লাদের খবর দে—ছোটবাবুকে খুঁজিয়া আনিতে হইবে। তারপর—বিবাহ শেষ হউক।—তিন দিনের মধ্যে ঘাস্থর কয়টা ঘাড় দেখিব। দুর্লভ সেনের রক্ত দেখিব আমি—

মশালের আলো, বিকট শব্দ, মানুষের বিকৃত ছায়ামূর্তি: সয়তানের অজানা সৃষ্টির একটা খণ্ড যেন হঠাৎ ছিটকাইয়া বিধাতার এই আকাশের তলে পড়িয়াছে। ইহারই টানে সনাতন পুড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু সনাতন এইবার নক্ষত্রসভার আহ্বান যেন শুনিল—ফুল শাহ্ ফকিরের ডাক! সনাতন তুমি বেইমান নও। সনাতন, সনাতন—ওঠো, ওঠো। জনার্দনও তোমাকে ডাকিতেছে।—তোমাকে ডাকিতেছেন ফুল শাহ্ ফকির—"গোলাপ ফুটিবে। বুলবুল বন্ধ করিও না তোমার গান।"

রাত্রি শেষে জনার্দন আসিয়া পৌছিল। ফুল শাহ ঘাস্থদের তিরস্কার

করিয়া জনার্দনকে স্বগৃহে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। এমন সময় সনাতন গিয়া 'ফকিরের ঝোপে' পৌছিল—ফুল শাহের দরবারে। 'তাহারা আর দাদাকে ছাড়িবে না। দাদাও জানাইয়াছেন—তিনি আর গৃহে ফিরিবেন না।'

পদ্মনাভ যেন ইহাই আশঙ্কা করিতেছিলেন। সনাতনকে সন্ধ্যা হইতে পাওয়া যায় নাই শুনিয়াই তাহার মনে হইল—এইবার, এইবার তিনি পরাজিত হইলেন। কিন্তু না, পদ্মনাভ চৌধুরী পরাজয় মানিবেন না। জনার্দন আসিয়াছে—সামান্য আহত সে; এখন সনাতনকেও তাঁহার খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে।

বেলা গড়াইয়া গেল। নদীপারের সেই ঝোপ শূন্য। হেমন্তের নিষ্প্রাণ দিন অবসন্ন হইয়া আসে; সন্ধ্যায় তাহা ঢলিয়া পড়িল। সম্মুখে কৃষ্ণপক্ষের কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি। উৎসব উত্তেজনা ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, কোনোরূপে প্রাঙ্গণে একটা মশাল জ্বালাইয়া দিয়া গেল কে। কাছারিবাড়ি হইতে ঘটক ও পণ্ডিতেরা পূজা-মণ্ডপে গিয়া বসিয়াছেন —মুখে কথা নাই বিশেষ। উদ্বেগ, উত্তেজনায় পদ্মনাভের মুখমণ্ডল ক্রমেই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। সে মুখের দিকে কেহ তাকাইতে সাহস করে না। শোক-বিজড়িত স্তব্ধতার মত অসহ্য দুর্ভেদ্য নিস্তব্ধতা চৌধুরী বাড়িতে চাপিয়া বসিল রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে।

আবার দিন; আবার ছুটাছুটি; তারপর রাত্রি।

মশালের আলোকে দেখা গেল অবগুণ্ঠনবতী কে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতেছেন। পিছনে গঙ্গা দাসী। পদ্মনাভ বুঝিলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন: কে যায়?

গঙ্গা দাঁড়াইল উত্তর দিল: কর্ত্রী মা। হাঁ, মন্দিরে যাইতেছেন। —মূর্তি ততক্ষণ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গঙ্গা প্রদীপ হস্তে অনুসরণ করিল।

ভূমিকা

পদ্মনাভ কি ভাবিলেন, তারপর দ্রুত পশ্চাদনুসরণ করিলেন। দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়া বলিলেন : শোনো—

কিন্তু কথা শেষ হইতে পারিল না। উদ্বেলিত সমুদ্র-তরঙ্গের মত কর্ত্রী তাঁহার চরণে অকস্মাৎ আছড়াইয়া পড়িলেন।

—তোমার মান-মর্যাদা, বিষয়-সম্পত্তি সব থাকুক। এক রাত্রির মত বাধা দিয়ো না, ডাকিয়ো না। আমি দেখিব—মা আমাকে না লইতে আমার ছেলেকে লইবেন কোন্ জোরে।

পদ্মনাভের মুখে কথা সরিল না। এই কণ্ঠ, এই স্বর, এই আর্ত্ত হাহাকার—ইহা ত চৌধুরী কর্ত্রীর নহে; ব্যাকুল মাতৃ-প্রাণের। চল্লিশ বৎসরের পরিচয়ের মধ্যেও এই প্রাণ তাঁহার পরিচয়ের অতীত লোকেই আত্মগোপন করিয়া ছিল। পদ্মনাভ চিরদিন শুধু চৌধুরী কর্ত্রীকেই দেখিয়াছেন। তাহার অতিরিক্ত ইঁহার কোনো পরিচয় আছে, ইহা বুঝিতেন না।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন সেই মূর্তি। এইবার আবার নূতনে-পুরাতনে মিলিত এক নূতনতর রূপ। সেই রূপ বলিল,—তোমার আদেশ কাল শুনিব। ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে বনবাসে দিও, আমি তীর্থের পথে রওনা হইব। কিন্তু আজ নয়, আজ নয়, তোমার পায়ে পড়ি—আজ আমাকে অন্য আদেশ করিয়ো না।

প্রদীপের ক্ষীণালোকে পদ্মনাভ দেখিলেন—এই মুখ, এই চক্ষের আবেদন তাঁহার একেবারে অপরিচিত নয়; ইহাই ত সনাতনের চক্ষেও কতবার, কত মুহূর্তে তিনি দেখিয়াছেন।

গৃহিণী ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বারে খিল দিলেন। গঙ্গা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেল।

ভূমিকা

মশালের আলো পুড়িয়া পুড়িয়া নিবিয়া যাইতেছে। নূতন বেলোয়াড়ি ঝাড়ের আলোটা কেহ আর জ্বালে নাই। কাছারিবাড়ির পিত্তলের প্রদীপ-দানে আলো জ্বলিতেছে। জনার্দন অদূরে নতশিরে বসিয়া আছে। কোথাও সে সনাতনের সন্ধান পায় নাই। পদ্মনাভ শূন্য গৃহে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছেন। গঙ্গা তৃতীয় বার অন্তঃপুরে যাইবার তাগিদ দিতে আসিয়াছে।

—আহারে আসিতে বলিতেছেন।

—কে বলিতেছে ?—পদ্মনাভ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

—কর্ত্রী বউ।

—বউ মা ? তিনি কি করিতেছেন ?

—চৌধুরী ঠাকুরের অপেক্ষায় আহার্য্যাদি সাজাইয়া বসিয়া আছেন।

অন্য সকলকে খাওয়াইয়াছেন, পুত্রকে ঝিএরা ঘুম পাড়াইয়াছে, দেখিয়া আসিয়াছেন।—তিনি কর্ত্রী-বউ চৌধুরী গৃহের—তাঁহার ভাবিতে বসিলে চলিবে না, অশ্রুপাত করা চলিবে না। —সব নিয়মিত, সব ধারাবাহিক, অব্যাহত তিনিই রক্ষা করিবেন।

পদ্মনাভ চৌধুরী উঠিলেন না। ক্লান্ত, চিন্তাভারাক্রান্ত নারীহৃদয় এইবার পরাহত হইল—কর্ত্রী-বউ সেই মেজেয় মুখ লুঠাইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন ভোরের দিকে। গঙ্গা আবার আসিল—জনার্দন বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পদ্মনাভ বলিলেন: কে ?

গঙ্গা বলিল: কর্ত্রী-বউ।

—কর্ত্রী বউ!

পদ্মনাভ চৌধুরী কি স্বপ্ন দেখিতেছেন?—কাছারিবাড়িতেও

কর্ত্রী-বউ! শ্বশুরালয়ে যে অবগুণ্ঠন শ্বাশুড়ীর সম্মুখেও স্থানচ্যুত হয় নাই, তাহাই শির হইতে অপসৃত প্রায়। দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ অস্থির।

পদ্মনাভ বলিলেন: যাও, আসিতেছি। কিন্তু আমি আহার করিব না।

বধূ যেন একবার স্থির হইলেন। নিম্নস্বরে গঙ্গাকে বলিলেন: কর্তা ঠাকুরকে তুমি বলো, গঙ্গাদিদি, চূড়াদি' কত দূর? মন্দির হইতে কর্ত্রী মা আমাকে বলিলেন, সেইখানে আউলিয়া কৃষ্ণদাসের আখড়ায় তিনি।

—কে?

বধূ নীরব! বলিল: আমি ত নাম করিতে পারিব না।

মুহূর্ত মধ্যে পদ্মনাভ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গঙ্গাকে বলিলেন: তুই বউমাকে লইয়া গৃহে যা। আমি চূড়াদি' যাইতেছি—খবর দে কর্ত্রী-মা'কে।

তখন মধ্যাহ্নের প্রথম প্রহর। জনার্দনই পাল্কী লইয়া ফিরিল—পাল্কীতে সনাতন শয়ান, চোখ বন্ধ। দীর্ঘ কেশ ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বারে করাঘাত করিয়া জনার্দন ডাকিতে লাগিল: মা, মা, ছ্যাখো, দাদা আসিয়াছেন।

তথাপি কেহ দ্বার খুলিল না। পদ্মনাভ বলিলেন: ততক্ষণ গৃহে সনাতনকে শয়ান করাইয়া দাও। বৈদ্য ডাকো।

দ্বার তখনো বন্ধ। সনাতন গৃহে ফিরিয়াছে; চৌধুরী কর্ত্রীর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয় নাই। দেবী সনাতনকে স্বগৃহে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সনাতনের মাতা?

অপরাহ্নের আকাশ আর একবার দেখিল সেই নিরাবগুণ্ঠন চৌধুরীদের কুললক্ষ্মীর মুখ। কপাল সিন্দুর প্রলেপে সমুজ্জ্বল, কণ্ঠ বক্ষ পুষ্পাভরণে

সমাবৃত, অধরকোণে হেমন্তের কৃষ্ণা তৃতীয়ার হরিদ্রাভ শশিকলার মত ক্ষীণ তীক্ষ্ণ হাস্যরেখা—সৌভাগ্যবতী চৌধুরী কর্ত্রী মহাযাত্রায় চলিলেন—পুত্রকে তিনি গৃহে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

মাসাধিক পরে জীবন ও মৃত্যুর দ্যূতক্রীড়ার শেষে সনাতন চক্ষু মেলিয়া চাহিল—দূর আকাশের সেই নক্ষত্রটি কি তাহার চোখের সম্মুখে নামিয়া আসিয়াছে? বড় শান্ত এই দীপ্তি! সনাতন আরামে চক্ষু বুজিল। পার্শ্ববর্তিনী পত্নী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন—সত্যই কি সনাতন চোখ খুলিয়াছেন, না, ইহা তাঁহারই অবোধ মনের ভ্রান্তি? আশা ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার বক্ষ আলোড়িত হইতে লাগিল।

আবার চোখ খুলিয়া সনাতন তাকাইল। 'না, বধূর ভুল হয় নাই। সেই দৃষ্টি, কিন্তু সেই আবেগ-আকুল দৃষ্টি ত নয়, শান্ত করুণ দৃষ্টি। কিসে যেন সনাতনের চোখ আবৃত-কোন্ অস্পষ্ট কুয়াসায়, বিস্মৃত বেদনায়। পূর্ব পরিচয়ের আনন্দোজ্জ্বল আলোক তাহাতে এখনো ফুটিয়া উঠিবার পথ পাইতেছে না। কর্ত্রীবউ আবার ঝুঁকিয়া পড়িলেন। স্নিগ্ধ-রহস্যভরা হাসি সনাতনের অধরের কোণে, চোখের তারায়। আবার সে চোখ বুজিল। হাস্যাঙ্কিত অধরে হাফিজের রুবায়েত কাঁপিতে লাগিল:

"রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সব বান্দা তোমার জ্যোতির্মতি!
যেদিন হতে বান্দা হ'ল পেল আঁধার-হারা জ্যোতি।
রাগে অনুরাগে মেশা তোমার রূপের রোশনীতে
চন্দ্র হল স্নিগ্ধ কিরণ সূর্য হল দীপ্ত অতি!"

'চন্দ্র হ'ল স্নিগ্ধ কিরণ':—ক্ষীণ করাঙ্গুলি পত্নীর হাতের উপর আসিয়া পড়িল। সনাতন চোখ মেলিল, সেই শান্ত মমতা-স্নিগ্ধ মুখের দিকে

তাকাইল। আবার অস্ফুটস্বরে আপনা-আপনি বলিল: 'চন্দ্র হ'ল স্নিগ্ধ কিরণ।'

চৈতন্য ফিরিয়া আসিল সেইদিন। তারপর স্মৃতি—ধীরে, অতি ধীরে। তারপর, জীবন-কৌতূহল – সংকুচিত, কিন্তু ব্যগ্র।···

ফুল শাহ-এর গোপন আস্তানা 'ফকিরের ঝোপ' অজ্ঞাত নয়। 'বড় খালের' একটা বাঁকে কাশ বন, আর তাহার পরেই 'ঝোপ',—একটা জঙ্গল। জনার্দনের আকস্মিক অপহরণে সনাতন বুঝিয়াছিল—এই খানেই তাহার স্থান—চৌধুরীদের কাছারিবাড়ি নয়, এই ফকিরের আস্তানাই তাহার আশ্রয়। ইহাই তাহার পথ—ফুল শাহ-এর সেই প্রেম-সাধনা।

কিন্তু ফুল শাহ্ত আর শুধু সেই ফকির নাই। তিনি সফর আলীর মত উদ্দীপ্ত সৈনিক। 'প্রেমই শক্তিরূপে জ্বলিয়া উঠে,'—ফুল শাহেরই এই কথাও। কিন্তু সনাতন শক্তির পথকে, সফর আলীর পথকে, চাহে না। সে ধৃষ্টতা তাহার নাই। প্রেমের দেবতা, সনাতনকে কি তুমি তবে আবার পরীক্ষা করিতেছ?

অস্থির চিত্তে সনাতন বাহির হইয়া আসে—মুক্ত আকাশ, নদী তীরের কাশবন, আর অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলী মাথার উপর। 'রবি শশী জ্যোতিষ্ক সব বান্দা তোমার জ্যোতির্ময়ী!' কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সনাতন আবৃত্তি করিতেছে হাফেজের পদ—কে? কে? এই কাশবনের মধ্য হইতে কে ডাকিতেছে তাহাকে?

সুদীর্ঘ মূর্তি আপাদমস্তক শুভ্র বসনে আবৃত। দেখা যায় শুধু দুইখানি রক্ত পদাম্বুজ; আর তাহাতে জরীর কাজ করা পারস্যদেশীয় মূল্যবান্ পাদুকা, শিশিরস্নাত শষ্পাগ্রে সেই পাদুকা ছোঁয় কি ছোঁয় না। এ ত ফুল শাহ্ নয়! 'কে? কে তুমি?'—সনাতন জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু কথা কহিবার পূর্বেই অবগুণ্ঠনবতী অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া

নিষেধ করিল। তারপর দীর্ঘ বাহুখানি প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া দিল সম্মুখে—শুভ্র মলমলের অন্তরালে গোলাপ শুভ্র বাহুর কমনীয় কান্তি ফুটিয়া উটিল। অঙ্গুলির ইঙ্গিত কহিল—এসো।

সেই শাখ-ই-নবাত ?

প্রান্তর রহিল পশ্চাতে পড়িয়া। অন্ধকার চিড়িয়া জ্যোৎস্নাখণ্ডের মত সম্মুখে চলিল সেই মূর্তি – পা তাহার মাটিও বুঝি স্পর্শ করে না। পিছনে ফেলিয়া গেল হেমন্তের হরিদ্রাভ ক্ষেত্র, বিস্মিত বনরেখার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, সুপ্তিময় অচেনা পল্লিগৃহের নিস্ফল আহ্বান। কোথা দিয়া প্রহর পালাইয়া গেল। শৃগালের চীৎকার রাত্রির শেষ প্রহর ঘোষণা করিল। নিদ্রাহীন নক্ষত্রের সভায় ভাঙন ধরিল। কিন্তু পারস্যের সেই সাকী কোথায় ? এ যে শুভ্র-বসনা রিক্তা বিধবা। সেই শুভ্রাবরণ রহস্য, সেই নির্ভীক ইঙ্গিত, তখন আকাশের তারকার দীপ তুলিয়া প্রভাত আরত্রিক করিতেছে। কে এই শুভ্র-বসনা বৈরাগিণী ? সমস্ত আকাশ তাহার সঙ্গীতেই কাঁপিতেছে :

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।

ভোরের মুখে আউলিয়া কৃষ্ণদাস চূড়াদি'র আখড়ার কুঞ্জবনে পাইল তাহার ক্লান্ত অচেতন দেহ। কে সে, কোনো পরিচয় তাহার জানা নাই। তারপর দুই দিন পরে সন্ধান হইল। তখনো সনাতন অচেতন। জানিতেও পারে নাই কখন আবার সে চিত্রিসারে নিজগৃহে ফিরিয়াছে।···

স্মৃতি জাগিল। কৌতূহলও ক্রমে গম্ভীর বোধশক্তিতে স্থির হইল। মা কোথায় ?—সনাতন বুঝিল মা নাই। সনাতন বাহিরের

ভূমিকা

আকাশের দিকে, স্তব্ধ তরুশিরের দিকে, শীতের বর্ণ-সুষমাহীন লতা পত্রের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া বসিয়া থাকে। বসিয়া বসিয়া বুঝে—বাড়িতে সেই জন-সমাগম নাই, অন্তঃপুরে সেই শ্রীমণ্ডিত স্থির কর্ম-ব্যবস্থা নাই, চৌধুরী বাড়ির সমস্ত জীবনযাত্রার অভ্যন্তর হইতে কোথা দিয়া একটি শ্রান্ত বিষাদ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে।

পদ্মনাভ গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৈদ্যের নিদর্শন ও কুশল প্রশ্নাদির পরে জানাইলেন, ঘোষালের পৌত্রীর সুপাত্রেই বিবাহ হইয়াছে। সেনেদের সঙ্গে ঘোষালের মীমাংসা হইয়া যাইবে, পদ্মনাভই উহার আয়োজন করিবেন। প্রজা-রায়তের মনেও কোনো খেদ আর পদ্মনাভ রাখিবেন না। ফুল শাহ্‌কে তিনি পান নাই। 'ডাকাত ফকিরের' দলকে কোম্পানি ছাড়িবে না। না হইলে ঘাসু ঢালীকে, মহী দাসকেও পদ্মনাভ গ্রামে আবার বসাইতে চাহেন। দাসপাড়াব ঢালীপাড়ার লোকদের তিনি নিজ নিজ পাড়ায় ফিরাইয়া আনিবেন। অবশ্য তাহারা অনেকেই জমির অভাবে দক্ষিণের চরে চলিয়া গিয়াছে। গোরাইও তাহাদের সঙ্গেই গিয়াছে।

সনাতন ভীত দৃষ্টিতে শুনিতে লাগিল। পিতার গর্বিত গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ আর কথা ফোটে না। সে চোখই আর সনাতনের চোখের দিকে তাকায় না—গৃহের এদিকে সেদিকে অনিশ্চিত ভাবে ফিরিতেছে।

একটু পরে পদ্মনাভ উঠিয়া পড়িলেন: আমার কাল গেল। এইবার তোমাদের কাল—'পাঁচশালা বন্দোবস্ত' ও এখন আসিতেছে। সে বুঝিবে তুমি ও জনার্দন। আর বুঝিবেন ভগবান্!

সূর্য তখন উত্তরায়ণে যাত্রা করিয়াছে। পদ্মনাভ পাল্কী হইতে

নামিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া আসিলেন। সকলকে ডাকাইলেন ;— সেনেদের সঙ্গে কলহ তিনি আজ মিটাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। কাজীদের মৌজার আগামী বন্দোবস্ত তাঁহারাই লইবেন। —'তোমরা আর তাহাদের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া পাল্কীতে ফিরিবার সময়ে হাঁক-ডাক করিও না - চুপি চুপিই ফিরিয়ো। তোমাদের কাছারিতে আসিবেন তাঁহারা ;—হাঁটিয়া আসবেন ; কিন্তু ছাতা মাথায় থাকিবে ; তোমরাও সেইভাবেই যাইবে তাঁহাদের বাড়ি। নাও, কর্ত্রীবউ, চাবিটা নাও সিন্ধুকের'—

কেহই তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইল না।

দিন তিনেক পরে শুভ মুহূর্তে পদ্মনাভ নওডাঁড়ার দিকে হাঁটিয়া চলিলেন। আর পাল্কীতে চড়া কেন ? সনাতন ও জনার্দনের পুত্ররা 'দাদা' 'দাদা', বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাঁহার হাটের দোকানী-ব্যবসায়ীরা তীরে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল—একটা মানুষ গেল! পদ্মনাভ নৌকার অভ্যন্তরে শুষ্ক হাস্যে বসিয়া রহিলেন। তিনি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে স্থান গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন।

কাছারিবাড়ি আর পাকা হইল না, ইঁটের পাঁজার আগুনে ইঁট পুড়িতে লাগিল।

দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে কোথা দিয়া যে কি পরিবর্তন ঘটিতেছিল তাহার রেখা চৌধুরীদের স্মৃতিতে নাই, কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। পত্রান্তরালবর্তী চিত্রিসারের দূর পল্লিজীবনে উহার দাগ পড়িতেছিল ; কিন্তু তাহা বুঝিয়া পড়িবার মত দৃষ্টি বা চেতনা তখন কাহার ছিল ? তাহারা দেখিত ঘটনা, চিনিত মানুষ। তাই ফুল শাহ্ ও সফর আলীর নাম মুছিতে মুছিতেও মুছিয়া গেল না চিত্রিসারের স্মৃতি হইতে, সনাতনের অন্তর হইতে। গ্রামের মানুষ যাহার নামে পাঁচালী গাহে,

ফকিরের নামে গীত রচনা করে। ভাগবত হইতে এক একবার মুখ তুলিয়া সনাতন ভাবেন—সত্যই কি ফকির সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বিদ্রোহেই সফর আলীর ও ফকিরের জীবনাবসান হইয়া গিয়াছে? না, তাঁহারা মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সনাতন যেমন আশ্রয়লাভ করিতেছেন নারায়ণের পাদপদ্মে। তাঁহারাও কি তবে বুঝিয়াছেন—দুর্বল, অসহায়, অক্ষম আমরা; পৃথিবীর সামান্য মানুষ। সনাতনের মতই কি দুর্বল, সামান্য মানুষ সেই তেজস্বী বীর সফর আলী? সেই সর্বস্বত্যাগী ফকির ফুল শাহ? হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন বিদ্যালঙ্কার—'তাঁহারা রাজার জাত, রাজার ধর্মী; রাজসিক গুণ তাঁহাদের স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সাত্ত্বিক প্রকৃতির—আমাদের ধর্ম ভক্তি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা।' তথাপি মানুষত তাঁহারাও। আর কি স্পর্ধা মানুষের যে সে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবে? কি তাহার সাধ্য? 'উহা ভগবানের কর্ম, যুগে যুগে তিনিই সেই ভারগ্রহণ করিয়াছেন' ঠিকই বলেন ভক্তিরত্ন। 'কাল পূর্ণ হইলে তিনি কলির ভার হরণ করিতে আবার আসিবেন। ততদিন তিনিই ত দেখাইয়া গিয়াছেন সর্ব অধর্মের মধ্যে মানুষের ধর্মপথ—'ভক্তিধর্ম সর্ব ধর্ম সার।' সেই মহাসারথি জাগিয়া আছেন, সনাতনকে ডাকিতেছেন—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সনাতন নিজের অহঙ্কারে, নিজের মূঢ়তায় একদিন ভাবিয়াছিলেন—বুঝি নিপীড়িত মানুষকে তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিবেন। তাই তিনি সফর আলীর সঙ্গে মাতিয়াছিলেন, তিনি ঘাসু আর মহীর দলের পক্ষ লইয়াও কুঠিয়াল, গোমস্তা, জমিদার, জমাদর, সকলের সঙ্গে বিপদের মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন—পিতাকে দেশান্তরিত করিয়াছেন, মাতাকে অকালে মৃত্যু-কবলিত করিয়াছেন। কি বিষম তাঁহার অহঙ্কার! আর কত তুচ্ছ তিনি। একে একে নিবিয়া গিয়াছে সব। —দাসপাড়া ঢালী

পাড়ার লোকেরা ঘাস্থর নেতৃত্বে বসবাস করিতে গিয়াছিল বিনটির চরে, তাহারাও আজ অনেকে ফিরিয়া আসিয়াছে চিত্রিসারে,—সনাতন তাহাদের সাদরে নিজ নিজ গৃহে জমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহী সর্দারের ছেলেকেও দিয়াছেন তাহাদের জমিজমা।—বেণী চন্দের পাইকের হাতে বিল ধূলিয়ার মাঠে মহী একা একা নিহত হইয়াছে—অকস্মাৎ এক রাত্রিতে। তাহার দেহ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভাসাইয়া দিয়াছে—বেণী গোমস্তার পাইকেরা নয়া গাঙে। কোম্পানি এখন স্বহস্তে রাজ্যভার লইয়াছে। তাই বেণী গোমস্তা এখন শুধু গোমস্তা নয়, সে-ই এখন ইলশাজারির জমিদার। অখণ্ড আজ জমিদার বেণী চন্দের ক্ষমতা। ঘাস্থ ইংরেজের সিপাহীর হাতে ধরা পড়িয়া শেষ পর্যন্ত ঢাকায় ফাঁসি গিয়াছে; তথাপি শেষ দিন পর্যন্তও ছাড়ে নাই গোমস্তা জমিদারের বিরুদ্ধে ডাকাতি! জহিরুদ্দীন পাইকারকে সে-ই খুন করিয়াছে,—গোলা লুটিয়াছে, নৌকা লুটিয়াছে, কোম্পানির পাইকার দালালেরা তাঁহার নামে কাঁপিয়াছে; আর বিনটির চরের বাসিন্দারা তাহার নামে গান বাঁধিয়াছে—সে 'ফকির রাজার ফকির চ্যালা।' নিজে সে কিছুই গ্রহণ করে না; সব বিলাইয়া দেয়। কিন্তু প্রাণে মারিতেও ছাড়ে নাই গোমস্তার চর ও বেইমানদের। দুর্ধর্ষ, তেজীয়ান্ মানুষ! কিন্তু সনাতন ভাবিয়া পান না—কেন এই নিষ্ঠুরতা তাহার? এই নিষ্ফল আক্রোশ? কেন সে বুঝিল না, কেন ফুল শাহ্ও বুঝিলেন না,—মানুষের সাধ্য কোথায় যে সে পৃথিবীকে রক্ষা করিবে? ভগবান ছাড়া কে পারেন এই অধর্ম অকল্যাণ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে? কাল পূর্ণ হইলে তিনিই ধর্মরাজ্যের স্থাপন করিবেন— নমো নমস্তেস্তু সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

হে পার্থসারথি, দ্রৌপদীর সখা, তুমি সনাতনকেও আশ্রয় দাও!

ভূমিকা

সনাতন চৌধুরী কাছারি বাড়িতে আর বসিতে চাহেন না। কখনো ভক্তিরত্নকে লইয়া পুকুরের ঘরে ভক্তি শাস্ত্রের ও ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় বসিয়া যান, কখনো রূপাচকের শ্রীকণ্ঠ গোস্বামীর গৃহে গিয়া বসেন, লীলা-কীর্তনে বিভোর হইয়া যান। পুরাতন ঠাট অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জনার্দন চৌধুরীই কাছারি বাড়িতে সমাসীন হন। অগ্রজের তিনি অনুগত। অনুগত কেন, প্রায় ভক্ত শিষ্য। কিন্তু ভগ্ন-গরিমার বেদনা তাঁহার হৃদয়কে তাই বলিয়া ব্যথিত করিতে ছাড়ে না। গদাই দত্ত গিয়াছে; প্রজাদের পীড়ন করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু সরকারী রাজস্বের হার বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া এখন দেড়গুণ হইয়াছে। সেই হারে প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা ও মাথট আদায় সনাতন চৌধুরী করিবেন না; জনার্দনই বা দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করিবেন? অথচ বাকী খাজনার দায়ে মহাল নিলাম হইয়া যাইতেছে—আর সে মহাল ক্রয় করে হয় কালচিতার সেনেরা, নয় গুরুপদ দালাল। চৌধুরীদের সে নাম ডাক আর শোনা যায় না; পদ্মনাভ চৌধুরীর সঙ্গে তাহা শেষ হইয়াছে। নাম শুনিয়াই মানুষের মাথা আর নুইয়া আসে না। বেণী চন্দের ছেলেরাও পাল্কী চড়িয়া এখন চৌধুরীদেরই গ্রামে—প্রায় তাহাদের চোখের উপর দিয়া—যায়। চৌধুরীদের বিষয় কমিয়াছে। গোলায় ধান আরও কম ওঠে—মাথট, আবওয়াব, জরিমানা সব রেহাই হইয়া গিয়াছে। এখনো দাসদাসীর সংখ্যা কমে নাই। সেই জাঁক নাই, তাই কাজও নাই, কিন্তু মুনিব বাড়িতে উহাদের খাইতে পরিতে না দিলে চলিবে কেন? কেহ বা তাহারা পুরুষানুক্রমে ক্রীতদাস, কেহ বা দাস না হইলেও পুরুষানুক্রমে এ বাড়িতেই মানুষ। লাঠি ও সড়কি আর বুকটান করিয়া পাইকেরা বহন করে না। অন্তপুরে যে বধূরা পুণ্যবতী শাশুড়ীর সেই সমারোহের দিন দেখিয়াছেন তাঁহারা নিঃশ্বাস ফেলেন—তাঁহার সঙ্গেই সব গিয়াছে।

জনার্দনের নিশ্চিন্ত মুখ ক্রমে গম্ভীর হইল ; সবল দেহের স্থিরগতি অকারণে হইল ; কৌতুকপ্রিয় চক্ষুতে ফুটিয়া উঠিল খরধার দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে দ্রুত আকস্মিক তীব্রতা।

পাঁচবৎসর পরে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া, চৌধুরীদের সংসার কনিষ্ঠা জায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া অবশেষে ভাগ্যবতী কর্ত্রীবউও স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আবার শাঁখ বাজিল, খৈ ও তাম্রমুদ্রা ছড়ানো হইল। কপাল তেমনি সিন্দুর রঞ্জিত, কণ্ঠ-বক্ষ তেমনি পুষ্পাবৃত, কিন্তু অধরের কোণে আর সেই বিজয়িনীর হাস্যরেখা নাই, সেই সংযত প্রসন্নতা নাই। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সঙ্গেই তাহা শেষ হইয়াছে। শান্ত বিষণ্ণ পরিম্লান এই মূর্তি।

সনাতন চৌধুরীর দিনরাত্রিতে যে বৈরাগ্যের রঙ লাগিয়াছিল, এই বৈষয়িক ও সাংসারিক বিপাকে তাহা ঘনতর হইয়া উঠিল। ভক্তিরত্ন ও গোস্বামী মহাশয়দের আলোচনার সঙ্গে তাহা আউল-বাউলের সাধনতত্ত্বের দিকেও ঝুঁকিয়া পড়িল। চিশ্‌তি, সুফী, কবীরপন্থী, নানকশাহীদের কথাও তিনি বিস্মৃত হন নাই ;—হাফেজ, সাদীর গুলিস্তান, পিয়ারা শাহ আর জাহাঙ্গীরনগরের দেখা ফকিরেরাই ত তাঁহার প্রথম জীবনের পথকারী। তাঁহার ফারসি কাব্যপ্রীতি ও বিদ্যার্জন-স্পৃহার ইঙ্গিত করিয়া তখন এক কবীর-পন্থী তাহাকে তখন বলিয়াছিলেন : পুথির কথা গোলাপের শুকনা পাতা।

"বন্ধু আমায় ডাকিল। আকাশের অযুত তারার বসন মুখ হইতে সরাইয়া সে আমার চোখের উপর রাখিল তাহার চোখ। চন্দ্রালোক ভরা চুম্বন পাঠাইল আমার উদ্দেশে, আমার অধরে ঠেকিল সেই অধর। কিন্তু আমি ভাবিলাম, ইহা যে আলোকের স্পর্শ। কই, শুকনা গোলাপ পাতার মত ঠেকিল না ত বধূর অধর!"

তথাপি সনাতনের সেই বিদ্যার্জন বাসনা তিরোহিত হয় নাই। সনাতন ভক্তিরত্নের মুখে শ্রীমদভাগবত পাঠ শোনেন—আশ্চর্য কাব্য-তরঙ্গ তাঁহাকে মুগ্ধ করে, তাঁহার মেধাকে জাগ্রত করে। মনে পড়ে 'চৈতন্য চরিতামৃতের' সেই কাহিনী—মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেন নাই। কিন্তু রথাগ্রে নৃত্য-শ্রান্ত মহাপ্রভুর নিকটে যখন রাজা রাসলীলার শ্লোক পাঠ করিলেন

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কলষাপহম্।

শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভুরিদা জনাঃ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তখন উঠিয়া পড়িলেন—চোখে জল, রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভুরিদা, ভুরিদা।"

"তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।"

এই অমূল্য রতন বিদ্যা নয়—ভাগবতের অমৃত কথা। সনাতন তেমন ভাব তন্ময় হইয়া যাইবেন কবে? গোস্বামী-ঠাকুরের গৃহে তিনি শোনেন কীর্তন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাই বান্ধে॥"

সনাতনের চেতনা শুনিতে শুনিতে কেমন অস্থির হয়! যেন লীলা লোকের অন্তঃপুরের একান্ত নিভৃতে তাঁহার ডাক পড়িতেছে।

"সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতুন হোয়॥
জনম অবধি সোরূপ নেহারিল নয়ন তিরপিত ভেল।
সোহি মধুরপথ শ্রবণহি শুনল শ্মৃতিপথ পরশ না গেল।

কত মধু যামিনী রভসে গমাওল কে না বুঝলে কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল তইও হিয় জুড়ন না গেল॥"

সনাতন ডুবিয়া যান। চমক ভাঙিলে ভাবেন—ইহাতে ফারসী কাব্যের সেই মার্জিত প্রাঞ্জলতা কোথায়? সেই ইরাণী দ্রাক্ষার সরাব? দূর গুলবাগের রঙীন গোলাপ?—কিন্তু এই মেঘ-মেদুর আকাশের তলে এই সুর, এই কথা, এই বাণীই বুঝি সার্থক। ইহাই বুঝি সনাতনের আপনার বাণী।

সনাতন নূতন নূতন সাধক সন্তদের সন্ধান করিতে থাকেন। চতাই বাউলের সঙ্গে তাঁহার আবার দেখা হইল। ফুল শাহ এর দরবারে একবার দেখা হইয়াছিল; আর দেখা হয় নাই। চতাই কি বুঝিল, গান ধরিল একতারা বাজাইয়া সনাতনকে উপলক্ষ করিয়া:

মন তুই নাই বা হলি বৃহস্পতি নাই বা গেলি টোলের ধার।
তোর দেহের তরী আপনি বইবে—আইবে যখন প্রেম জোয়ার।
কি কাজ তোর শুদ্ধ কথায়, কি কাজ তোর পুঁথির পাতায়?
ব্যাকারণের বাঁকা পথে ভবের হাটে পাবি কি তার পার?
সহজ প্রাণের উজান বাইয়া আপনি তোরে লইবে নাইয়া!
গুরুর কৃপায় শ্বাসে শ্বাসে চ তাই হবে পার।

সহজের 'কথা' শাস্ত্রের কথা নয়। তাই উহাতে কথাই কম, আছে গান। চতাই বাউলও গানেই কথা বলে। বড় খালের ধারে তাহার ছোট একটি আখড়া। পরিছন্ন কুটীর। খেয়াল হইলে চতাই একতারা লইয়া গান শুরু করে, উঠিয়া নাচিতে শুরু করে, নিজের আনন্দে দুই একপদ গাহিয়া আবার বসিয়া পড়ে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার চোখের সম্মুখে একটি শ্যাম-সুচিক্কণ রূপ ধরিয়া আছে। একতারা বাজাইয়া সে নাচিয়া বিভোর:

চতাইরে তোর বন্ধু কোথায়, বন্ধু কোথায়, শুধাস্ তোরা কে ?
বন্ধু আমার অন্দর ঘরে, বন্ধু বাহিরে।
বন্ধুর সাথে গহন রাতে নিত্য আমার মুখ-চন্দ্রিকা।
বন্ধুর সাথে বিহান রাতে বদল করি কণ্ঠ-মালিকা।
বন্ধুর সাথে আমার দেখা নদীর বাঁকে বাঁকে।
বন্ধু আমায় ডাকে 'চতাই' দিনে রাতের ফাঁকে ॥

সনাতনের মন দুলিয়া উঠে। ইহা সেই মার্জিত হীরকের হার নয়; ইহা যে সত্যই বনমালীর বনমালা, তাজা বর্ণ রস গন্ধময় পুষ্পহার।

সনাতন ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসেন। চতাই গাহিয়াছে :

বাসি ফুলের গাঁথা মালা তাতে কি তোর ঠাকুর ভোলে ?
রোজ বিহানে ফুলের ডালি ঝরে যে তার চরণ মূলে।
পরের ফুলে সাজাস্ থালি,
আপন মনের শাখা খালি,
বন্ধু যে চায় তাহার ফুলে।
সহজ গানটি গা না 'চতাই', বন্ধু লইবে দু হাত তুলে।

সত্যই ত, সেই মালাইত প্রভু কামনা করিবেন। ভাগবতের দিব্য-সুধা তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হাতে পান করিলেন। মহাজনের পদাবলী মকরন্দও তাঁহার আস্বাদিত। কিন্তু তিনি শুধু তাহাতেই ত তৃপ্ত নহেন। সকলের প্রাণের মধু লইবার জন্য যে তিনি দুই হাত পাতিয়া আছেন—তিনি শাদা ফুলের মালা চাহেন। সনাতনের বন্ধুও সনাতনের গাঁথা মালা চাহিবেন—তাঁহার আপন মনের ফুল।

সনাতন মালা-গাঁথিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আঙুল বাহিয়া সহজে বাহির হইয়া আসে ফারসির কাব্য-সুষমা। এই কুঞ্জবনের অভিসার বাট তাঁহার চেনা নাই, সংকেত-গৃহ তাঁহার অজ্ঞাত। তথাপি প্রাণের

মধ্যে সুর জমে, ক্রমে তাহা গান ভরিয়া উঠে, কথা যেন নাগাল পাইয়াও পায় না। কিন্তু সনাতন প্রয়াস ছাড়ে না। সেই পুকুরের ধারে, খড়ের ঘরে একান্তে তাঁহার গীতের মালা-গাঁথা আরম্ভ হয়।

চিত্রিসারের চৌধুরী-কর্তা—পদ্মনাভ চৌধুরীর পুত্র সনাতন চৌধুরী, শঙ্কর চৌধুরীর বংশধর—তুলট কাগজে পদ লিখিয়া আনন্দে বিভোর। কোথাকার যত বাউল ফকিরের সঙ্গে তাঁহার আসর। আর ততক্ষণে বাকী খাজনার দায়ে মহাল হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে; তাহা যাইতেছে সেকালের কোম্পানির গোমস্তা, দালাল, পুরাতন নায়েব, তহশীলদার ও নূতন পাইকার, ব্যবসায়ীদের হাতে। ভাঙা নাটমন্দিরে তখনো মহাভারতের উপাখ্যান লইয়া কথকতা হয়। তখনো সেখানে চণ্ডী তেমনি পাঠ হয়। কোনদিন ভাগবতের উপাখ্যান ব্যাখ্যা করেন ভক্তিরত্ন। শ্রীকণ্ঠ গোস্বামী আসিয়া কীর্তনের আসর বসান। চৌধুরীদের বড় কর্তার পদও গীত হয় কখনো। সবিস্ময়ে গ্রামবাসী মানিয়া লয়—ইহাই স্বাভাবিক। চৌধুরীরা ভিন্ন, সনাতন চৌধুরী ছাড়া আর কেহ ঠিক এমন করিয়া এমনটি হইতে পারিত না। সমারোহহীন এই আভিজাত্যের দিনে চৌধুরী বংশের এই নূতন রূপ তাহাদিগকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তোলে।

জনার্দন চৌধুরীও সগর্বে অভ্যাগতদের নিকট অগ্রজের প্রশংসা করিয়া বেড়ান। সকলের প্রশংসা ধ্বনিতে তাঁহার মুখও এক-একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিন্তু আবার চোখ পড়ে পরিত্যক্ত-প্রায় কাছারি বাড়ির দিকে, অবহেলিত সেই হাঙ্গর-মুখো পাল্কীর উপরে।—সেই পাল্কীতে আর কেহই আরোহণ করে না। মনে পড়ে আর চোখে পড়ে

ভূমিকা

—গৃহে দুয়ারে জীর্ণতার ছাপ, গোলায় ধান্যের অপ্রাচুর্য, সিন্ধুকে অর্থের অভাব।

সেদিন কি একটা উৎসব ছিল। সম্ভবত শ্রীজীব গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব না তিরোভাব উৎসব। শ্রীকণ্ঠ গোস্বামীর গৃহে সনাতন সকলের সঙ্গে কীর্তনানন্দে বিভোর ছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রিতে একা যখন গৃহাভিমুখে বাহির হইলেন তখনো তাঁহার মনে কীর্তনের পদটি ঘুরাফিরি করিতেছে, অন্তর ভাব-নিষিক্ত!

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়—

আকাশ বাহিয়া জ্যোৎস্না ঝরিতেছে—যেন

"... ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।"

সত্যই অবনী বহিয়া যাইতেছে! মাঠে-ঘাটে, গাছের শিয়রে, শুষ্ক খালের ধারে—সব যেন সেই অঙ্গের লাবনীতে মাখা। কাজীপাড়ার মাঠ ছাড়াইয়া সনাতন আসিলেন—ম্রিয়মাণ কাজীবাড়ির উপরেও সেই চাঁদের আলো তেমনি মধুর। 'পীরের ঢিবি' দূরে দেখা যায়—উহার পাশ দিয়াই তাঁহার পথ—শুষ্ক খালের ধারে দিয়া;—কেহ নাই সেই ফকিরের আসনে। বর্ষায় লতাপাতা জঙ্গল ছাইয়া ফেলিতেছে চারিদিক। ঢিবির তলাকার খালের দিকে দুই একটা স্থল বর্ষায় খসিয়া গিয়াছে। ওদিককার দরগার প্রদীপও নিবিয়া গিয়াছে। যাউক, পৃথিবী ভরাই ত তাঁহার আলো—"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়।"—অঙ্গের সেই লাবণী আকাশ হইতে অকূলে ঝরিয়া পড়িতেছে।

সনাতনের মন আবার গুঞ্জরণ করিতে থাকে :

"মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়!

লএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল দয়া যন্থ ন ছোড়বি মোয়।"

"সনাতন!"

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন—কে ডাকল না? আর, এক অর্ধবিস্মৃত পরিচিত কণ্ঠস্বরে? একবার দাঁড়াইয়া তিনি চতুর্দিকে তাকাইলেন—কই? কেহ কোথাও নাই! সনাতন আবার অগ্রসর হইলেন। আবার সেই ডাক—'সনাতন!' আর সেই কণ্ঠস্বর। সন্দেহমাত্র নাই কাহার এই কণ্ঠস্বর। নির্জন সেই খাল-ধার শূন্য,—ওদিকে শুষ্ক মাঠ, এদিকে পীরের ঢিবি। কোথাও কেহ নাই। বুঝি তাঁহাকে ছলনা করিতেছে কোন দুষ্ট প্রেতাত্মা! সনাতন দ্রুত চরণে মাঠের মধ্যে নামিলেন—গৃহাভিমুখে চলিবেন। কিন্তু সাধ্য কি তিনি অগ্রসর হন?

'সনাতন! সনাতন! সনাতন!'

যতই সনাতন অগ্রসর হন ততই স্বর ক্ষীণতর হয়, কিন্তু লুপ্ত হয় না, বেদনাময় মিনতির রূপ ধরে। পিছন ছাড়িয়া তাহা তখন কানের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বুকের মধ্য হইতে প্রিয়-সম্ভাষণের মত আবেগময় হইয়া উঠে।

'সনাতন! সনাতন! সনাতন!'

না, সনাতন আর অগ্রসর হইতে পারেন না। আকাশ হইতে, মাটি হইতে, পিছন হইতে, সম্মুখ হইতে—বাহির হইতে, অন্তর হইতে,—সেই বহু-পরিচিত প্রিয়-কণ্ঠস্বর তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে।

'সনাতন! সনাতন! সনাতন!'

সনাতন বসিয়া পড়িলেন:

"মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।

লয়ে তুলসী তিল দেহ সোঁপলু দয়া যন্থ ন ছোড়বি মোয়॥"

আমাকে ছাড়িয়ো না, ছাড়িয়ো না! আবার সযত্ন আর্তীর কণ্ঠে

ভূমিকা

সেই কুটিল দুরন্ত কর্মপারাবারের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া আমাকে ভাসাইয়া দিয়ো না! আমাকে গ্রহণ করো। গ্রহণ করো! "মাধব, বহুত মিনতি' করি তোয়!"

ক্ষীণ চন্দ্রালোক স্তব্ধ বালুভূমির উপর লুটাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সনাতন উঠিলেন। পিছনের সেই শুষ্ক খাদের পাড়ভাঙা স্থানটিতে ফিরিয়া গেলেন। উপরে ঢিবির পিছনে বন ঝোপ—কেহ এখানে পদার্পণ করে না। সনাতন সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিচেকার বালু ও ভাঙা পাড়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। হাত দিয়া তাহা নাড়িতে-চাড়িতে লাগিলেন। সেই ডাক, সেই ডাক, সেই ডাক! তাঁহার যৌবনের সুহৃদ সফর আলীর কণ্ঠ। সনাতন ব্যগ্রভাবে উৎকণ্ঠার সহিত মাটি সরাইতে লাগিলেন। হঠাৎ কি হাতে লাগিল এবার—ধাতব বস্তু। স্বর স্তব্ধ হইল। সনাতন তাহা তুলিয়া লইলেন। তারপর একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। সনাতনের সর্বদেহ উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছে, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছে। দেহ অসাড় হইয়া আসিতেছে। সনাতন বুকে জড়াইয়া ধরিলেন সেই ধাতব মূর্তি—নীলমাধব!

চিত্রিসারের চৌধুরীদের নীলমাধব মূর্তির ইতিহাস ইহাই। কীর্তনানন্দে বিহ্বল সনাতন চৌধুরীকে স্বয়ং নীলমাধব আহ্বান করিলেন: 'সনাতন! আমি তোমার আশ্রয় চাই।' তারপর বৎসরকাল শেষে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হয় তাহার প্রতিষ্ঠা-উৎসব। নূতন পুকুরের ধারে তখন ক্ষুদ্র এই সুন্দর দেউল উঠিয়াছে—পদ্মনাভ চৌধুরীর সেই কাছারিবাড়ির ইঁটে। সনাতন তাহারই অঙ্গনে 'পঞ্চবটী' গড়িলেন। একপক্ষকাল জুড়িয়া চলিল প্রতিষ্ঠা-উৎসব। ভক্তবৈষ্ণবদের সমাগমে তখন চিত্রিসার কিছুদিনের

মত আবার জমিয়া উঠে। সপ্তাহব্যাপী নামকীর্তন চলিয়াছে। দূরবর্তী গ্রাম হইতেও বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রীলোক সেই বিগ্রহ দেখিতে আসে, কীর্তন শোনে, প্রসাদ গ্রহণ করে। শেষ দিন মহোৎসব—সেদিন পূর্ণিমা। জনার্দন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীকণ্ঠ গোস্বামী কীর্তনীয়াদের ভার-গ্রহণ করিয়াছেন—বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবভক্তদের তিনিই পরিচর্যা করেন। আউল-বাউলেরা আপনারাই আসিয়াছেন আপনাদের রীতিতে। শঙ্করদীঘির পাড়ে তাঁহাদের স্থান তাহারা স্থির করিয়া লইয়াছে। চিত্রিসারের চৌধুরী বাড়ি এই মহোৎসব উপলক্ষে যেন আপনার প্রভাব ও কীর্তি নূতনরূপে ফিরিয়া পাইতেছে। জনার্দন নূতন গর্বে চারিদিকে সকলকে অভ্যর্থনা করেন। এবার লাঠি-সোটার আড়ম্বর নাই; রক্তপাত ও সুরাপানের মত্ততা নাই; কাছারিবাড়ির পথে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে কেহ আসে না চৌধুরী মহিমার অনুগ্রহ ভিক্ষুকরূপে। বরং কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। সকলেই প্রীতি-সম্ভাষণে মুখর, অভিজাতে-অনুগতে নাই সেই দুস্তর অনুগ্রহ-নিগ্রহের অতি-অনিশ্চিত আদান-প্রদান।—সহজ সম্মানের ও সহজ পরিচয়ের আজন্ম-স্বীকৃত বন্ধন যেন আত্মীয়তায় পরিণত হইতেছে—এই কয়দিনে। কোথায় সেই আভিজাত্যের উগ্র ঔদ্ধত্য? এখানে সর্ব-মানবের গোষ্ঠীগত সহজ বন্ধনই স্বীকৃত। কে বা উচ্চ, কে বা নীচ—প্রেমময়ের এই মহোৎসবের ক্ষেত্রে।

কীর্তনে কীর্তনে অঙ্গন মুখরিত। সনাতন প্রায় বিহ্বল, বিভোর। হঠাৎ কি পদ কানে গেল। তাঁহার নিমীলিত নেত্র যেন স্মৃতি-তলে কি খুঁজিতে লাগিল :

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

ভূমিকা

হাঁ, সেই গীত! সেই কণ্ঠস্বর—চূড়াদির সেই রহস্যময়ী স্বপ্নসখীর। স্বপ্নের পার হইতে যেন সনাতন চৌধুরীকে তাহা ডাকিয়া তুলিল :

"বঁধু, কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।"

সনাতন চৌধুরী উঠিলেন না। চক্ষু বুঁজিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সম্বিতহীন দেহ স্থির আসনে বসিয়া রহিল। দেউলে সেই স্নিগ্ধ-সজল কণ্ঠস্বর যেন সমস্ত কামনা বাসনার ঊর্ধ্বলোক হইতে এই জীবনের চরম চরিতার্থতাকে স্বীকার করিয়া যাইতেছে··

জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

চূড়াদি'র কালিন্দী ঠাকুরাণী সেখান হইতেই বৃন্দাবন-ধামে যাত্রা করিলেন।

সনাতন জীবনে এই প্রথম অকুণ্ঠিত চিত্তে মুখ তুলিয়া কালিন্দীর মুখের পানে চাহিলেন। এই প্রথম কথা কহিলেন। প্রণাম নিবেদন করিতে করিতে বলিলেন : ব্রজসখাকে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়ো।

কালিন্দী হাসিলেন : ব্রজসখাকে আমি কি স্মরণ করাইব?—তিনি ত নিজেই তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ঠাকুর।

সনাতনের দুই চক্ষু প্রীতিতে মাধুর্যে স্নিগ্ধ। বলিলেন,—সে তাঁহার সখীরই অনুকম্পায়। তুমিই তাহার প্রথম গুরু, তুমি তাহার জীবনের সখী।

"শোনো রজকিনী রামী!
ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।"

তারপর :

তোমার প্রেমেতে আমারে জীয়ালে
মরণ মাঝারে নামি।
তুমি মোর গুরু, তুমি সখী মোর,
জননী, বনিতা, স্বামী।

কালিন্দীর দুই চক্ষু বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল :

"বাঁধিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি করে ছটফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভনে।"

তারপর :

জানে সে ব্রজের সখা—কি তাপে জ্বলিল,
দহিয়া দহিয়া কত এ সোনা গলিল।
জানে সে ব্রজের বঁধু—যত দূরে যাই।
আমারে তাঁহার করি, তোমারেই চাই।
তোমারেই চাই বঁন্ধু, তোমারেই পাই।
আমার বঁধুয়া হয় ব্রজের কানাই।

সনাতন চৌধুরী সেদিন হইতে পঞ্চবটী তলায় ঘর বাঁধিলেন। কাছারি বাড়ি ক্রমশ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

বৎসর পনের পরে একদিন পঞ্চবটীতলা ছাড়িবারও দিন আসিল। কিন্তু তাহার পূর্বে পনের বৎসর ধরিয়া সেখানে বসিয়া সনাতন চৌধুরী লিখিয়াছেন ও শুনাইয়াছেন 'মাধবমঙ্গল'—ভাগবতের অনুবাদ; লিখিয়াছেন

'সখী-কীর্তন'। অন্যদিকে সেই আউল-বাউল ও কীর্তনিয়ার সমাবেশে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া রহিয়াছে অনুদিন। পনের বৎসরে সনাতনের 'মহোৎসব', তাঁহার 'নীলমাধবের দেউল', 'পঞ্চবটীতলার' আসন—চিত্রিসারের জীবনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া নূতন ঐতিহ্য হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মধ্যে কে খোঁজ রাখিল যে, 'দশশালা বন্দোবস্তে' চৌধুরীদের বহু তালুকও তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে? শাক্ত কুলগুরুর ক্রোধ ও অভিশাপের অধ্যায়টাও ইহার মধ্যেই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে;—চৌধুরীরা ছাড়া চিত্রিসারে কেহ তাহা মনেও রাখে নাই।

বৎসর ঘুরিলেই শারদীয় পূজা আসে। পদ্মনাভ চৌধুরীই নূতন করিয়া রাজোচিত ঐশ্বর্যে অম্বিকা পূজার প্রবর্তন করিয়াছেন; তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। শুধু সনাতন চৌধুরী মহাষ্টমীর জীববলির সময়ে আর এই দুর্গামণ্ডপের দিকে আসেন না; আপনার পঞ্চবটী তলা আশ্রয় করিয়া থাকেন। সস্ত্রীক জনার্দন কুলক্রিয়া নির্বাহ করেন। বধূরা নিয়মিত ব্যবস্থা পালন করে।

বীভৎস সেই মহাবলির কোলাহল। সুরারক্ত উন্মাদ পুরুষদের তাণ্ডব নৃত্য সনাতন পঞ্চবটীতলায় বসিয়াও যেন সহ্য করিতে অক্ষম। মনে পড়ে মহাপ্রভুর জন্মকালে পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা:

মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনো জনে ॥....
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহলে।

হে সখা, এই ভূভার হরণ করিতে তুমি কি আবার আসিবে না?

সেবার কুলগুরু পশুপতি আগমানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধাবংশের সাধক তিনি। কিন্তু কারণের প্রতি তাঁহার আসক্তি মাত্রাতিরিক্ত। পশুপতি সবই জানিতেন; মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় তাই সনাতনকে তিনি বারেবারে ডাকিলেন—কারণ বারি পান করিতে হইবে। সনাতন আসেন না। পশুপতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছেন—এখনি তিনি এই গৃহ ত্যাগ করিবেন। হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন বহিঃপ্রাঙ্গণে।

জনার্দন করজোড়ে বলিলেন : কি হইল, গুরুদেব ?

গুরুদেবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ উত্তেজনায় উগ্র : তোমাদের মরণবুদ্ধিতে পাইয়াছে। না হইলে মূর্খ ইতরটা কারণবারি গ্রহণেও অবজ্ঞা করে।

—কে ?

—কে আবার ? তোমার দাদা ওই ক্লীবটা।

—দাদা ! —এই অপমানকর ইতর গালাগালি তাঁহার প্রতি !

এক মুহূর্তে জনার্দন চৌধুরীরও মাথায় রক্ত চাপিয়া গেল—তিনিও গুরুদেবের প্রদত্ত কারণপ্রসাদ প্রচুরই পান করিয়াছিলেন।

পশুপতি তখন ক্রোধে আত্মহারা। চীৎকার করিয়া বলিলেন : হাঁ, দাদা। পদ্মনাভ চৌধুরীর বংশে জন্মিয়াছে এমন ক্লীব ? কে জন্ম দিয়াছে উহাকে ?

জনার্দন আত্মবিস্মৃত হইলেন : সাবধান, ঠাকুর মশায়।

জনার্দনের চোখে যেন কি দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন পশুপতি। কিন্তু বাক্যসংযম তখন তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। বলিলেন : কি বলিলে ?

জনার্দনেরও আত্মসংযম সম্ভব নয়। বলিলেন : কাহাকে, কি বলিতেছেন, বুঝিয়া বলিবেন।

—বটে !—ফাটিয়া পড়িলেন পশুপতি আগমানন্দ।—উৎসন্ন যাবি, উৎসন্ন যাবি তুই, জনার্দন।

ভূমিকা

ক্রোধোন্মত্ত গুরু অভিশাপ বর্ষণ করিতে কারতে চৌধুরীবাড়ি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। জনার্দন স্তব্ধ প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়াইয়া। স্মৃতিরত্ন তাঁহার পিতার বন্ধু। জনার্দনের হাত ধরিয়া বৃদ্ধ টানাটানি করিতে লাগিলেন: গুরুদেবকে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া আনো, জনার্দন।

জনার্দন এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়াইয়া লইল। —না!

স্মৃতিরত্ন চিনিলেন। সফর আলীর বন্ধু সনাতনকে তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এবার তাহাকেও বুঝিলেন এই প্রৌঢ় জনার্দনকে দেখিয়া। জারি গানের, বাচ খেলার, দাস্থ সর্দারের লাঠী খেলার সাক্‌রেদ সেই দুর্দান্ত যুবক এই প্রৌঢ়ত্বের পাষাণ বন্ধনের মধ্যেও তেমনি দুর্দমনীয়, অগ্নিময। এই চৌধুরী রক্তই নিরভিমান সনাতনের দেহেও প্রবাহিত। তেজই ইহাদের কালও।

বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে জনার্দনের দুই পুত্র সত্যই জ্বরাতিসারে গতাসু হইল। গৃহে বিধবা এক পুত্রবধূ। কনিষ্ঠ পুত্র তখনো বালক।

চৌধুরী কর্ত্রী বলিলেন: আমার শেষ পুত্রকে অন্তত তুমি রক্ষা করো।

জনার্দন বলিলেন: বেশ। তাহাই হইবে। এই গৃহ, এই ভদ্রাসন, এই বিষয়—আমি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। শাপমুক্ত না হইলে আর মুখ দেখাইব না।

জনার্দন চৌধুরী তীর্থে বাহির হইলেন। কালীঘাট, বারাণসী হইযা তিনি কোথায় গেলেন, না-গেলেন কেহই জানে না। কিন্তু ফিরিলেন যখন তখন পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। সনাতন বৃদ্ধ, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণ চৌধুরী বংশের কর্তা। জনার্দনের পুত্র বিরূপাক্ষও তখন বিবাহান্তে সংসারে প্রবেশ করিতেছে। চৌধুরী-বংশ উৎসন্ন যায় নাই, কিন্তু তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বিলুপ্ত-প্রায়। দশশালা বন্দোবস্তে একমাত্র চৌধুরীর হাট

ও তাহার দক্ষিণাংশের নওডাঁড়ার খাল পর্যন্ত জমি তাহারা বন্দোবস্ত পাইয়াছে। কালচিতার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে কালচিতার সেনেরা। নওডাঁড়ার ওপারে সমস্ত জমিই তাহাদের সম্পত্তি। কাজীবাড়ির ও ইলশাজারির হাজারীদের মূল সম্পত্তিও বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল কোম্পানির পুরাতন গোমস্তা বেণী চন্দের পুত্র নকুল মজুমদার;—এখন আর তাহারা চন্দ নয়, মজুমদার,—জহিরুদ্দিন, ও গুরুপদ সরকার—সেও এখন সরকার। আসলে পুরাতন জমিদার গোষ্ঠী সকলেই "উৎসন্ন" গিয়াছিল। যাইতে যাইতেও যায় নাই তথাপি চৌধুরীরাই—সনাতনের পুণ্যে নয়, জনার্দন চৌধুরীরই সাধনায়।

চৌধুরীরা জানে, সত্যসত্যই জনার্দন সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছিলেন। একেবারে মহাপুরুষ, সাধক, যোগী। বিন্ধ্যাচলে তখন তাঁহার আসন। কিছুতেই তিনি জনার্দনকে মন্ত্র দেন না।

জনার্দন বলেন: আমি গৃহ-সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আপনার কৃপালাভ না করিয়া নিরস্ত হইব না।

—আমার অনুমতি লইয়া ত গৃহ-সংসার ত্যাগ করো নাই। এখন তবে আমার কৃপার প্রয়োজন হইবে কেন?

—হইবে। কারণ কুলগুরুর অভিশাপে গৃহত্যাগে বাধ্য হইয়াছি।

—চমৎকার গৃহত্যাগ! যখন অন্নহীন, তখন বলিয়া বেড়াইতেছ 'ক্ষুধা নাই'। বরং যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও, স্ত্রী-পুত্র লইয়া জাগন্মাতার সেবা করো।

—তাহা হইলে গুরুর অভিশাপে আমরা নির্বংশ হইব। তাঁহার অভিশাপে আমার দুই সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে।

—অভিশাপে মরে মানুষ!—মানুষ এত ক্ষুদ্র জীব—জগৎজননীর সৃষ্টি যে। আর, গুরুর অভিশাপে তুমি মরিলে না, মরিল তোমার পুত্র!

ভূমিকা

—তবে মরিল কেন ?

—তুমি আমি যে জন্য মরিব। প্রকৃতির কর্ম প্রকৃতি নির্বাহ করান প্রত্যেকটি জীবকে দিয়া। কর্ম সমাপ্ত হইলে আবার প্রত্যেককে ফিরাইয়া লন।

—গুরু আমার গৃহ-সংসার উৎসন্ন করিয়াছেন।

—মুখের কথায় গাছের একটা পাতাও নড়ে না। আর তুমি উৎসন্ন হইলে গৃহ-সংসার হইতে। আবার, স্ত্রীপুত্র সব ছাড়িয়া কাপুরুষের মত পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে আসিয়াছ—আমার মুখের কথায় রক্ষা পাইবে, ভাবিতেছ !

শেষ কথা গুরুর : 'উৎসন্ন' হইবার ভয়ে সংসার ছাড়িতেছ। কিন্তু সংসারের বাহিরে তুমি যাইবে কোথায় ? স্বয়ং হর-পার্বতী যান নাই সংসার ছাড়িয়া। হর-পার্বতীয় এই মিলন-মায়ায় যে সৃষ্টি—সেই সৃষ্টিকে পাশ কাটাইয়া তুমিই কি যাইতে পারিবে ? শোনো, সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলেও সেই প্রকৃতিরই ইচ্ছায় তুমি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, আর উৎসন্ন গেলেও তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া উৎসন্ন যাইবে। সেই পরমা প্রকৃতিরই শরণ লও।

এমনি কথাই অগ্রজ সনাতনের মুখেও শুনিয়াছে না জনার্দন ? বিরোধ তবে কোথায় ? মহাসাধক হাসিয়া বলিলেন,—বিরোধ অহঙ্কারের, সাধনায় বিরোধ নাই।

জনার্দন দেশে ফিরিলেন। চৌধুরী গৃহে ত্রিরাত্রি যাপন করিলেন। তারপর সস্ত্রীক তিনি বিন্ধ্যধামে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। —চৌধুরীরা ইহাই জানেন।

আসলে কিন্তু জনার্দন চৌধুরী ঢাকা-কলিকাতায় দরবার করিয়া বুঝিয়াছিলেন—দশশালা বন্দোবস্তে চৌধুরীরা যাহা হারাইয়াছে চিরস্থায়ী

বন্দোবস্তের পরে তাহা আর পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। ঢাকা কলিকাতা হইতে কাশীধাম পর্যন্ত পর্যটন করিতে করিতে তিনি বুঝিয়াছেন— ইংরেজের শাসন-নিগড়ে সমস্ত দেশ বাঁধা পড়িয়াছে। সনাতন চৌধুরী বুঝিয়া না বুঝিয়া তাই নীলমাধবকে আশ্রয় করিয়াছেন। জনার্দন চৌধুরী বুঝিয়া না বুঝিয়া পদ্মনাভ চৌধুরীর অবসন্ন মহিমা আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন,—সেই সম্পদ পুনরুদ্ধারের আশাতেই তিনি শহরে ছুটিয়াছিলেন, পরে দেশদেশান্তরে দেবতার কৃপাভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন,—আর শেষে বুঝিয়াছেন—উহা ব্যর্থ। ভৌমিক মহিমার দিন আর ফিরিয়া আসিবে না, বানিয়া-দালালের যুগ আসিয়াছে।

বাহিরের পৃথিবীর বিরাট হৃৎস্পন্দন অবশ্য জনার্দন চৌধুরীর অগোচর রহিয়া গেল। কাশীতে তিনি শুনিলেন যে, ইংরেজ টিপু সুলতান ও মারাঠাদের শক্তিকে চূর্ণ করিতে যাইতেছে; কাশী ছাড়াইয়া আগ্রা, অযোধ্যা পর্যন্ত তাহার বণিক-রাজ্যের সীমা স্পর্শ করিতেছে। কিন্তু জানিলেও তিনি বুঝিতেন না যে, এই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও তখন নূতন প্রজারাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে আমেরিকায়; ফরাসীর রাজশির ও রাজ-মহিমা প্যারিসের বধ্যভূমিতে লুঠাইয়া পড়িতেছে; যখন বাঙলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেছে ফরাসী বিপ্লব ঠিক তখনই পৃথিবীতে ভৌমিকতন্ত্রের রক্তাক্ত অবসান ঘোষণা করিয়াছে। জনার্দন কলিকাতায় বসিয়াও শোনেন নাই,—কয়লায় লৌহ গালাইবার পদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রচলিত হইয়াছে। হারগিব্‌সের আবিষ্কার, ক্রমপটনের উদ্ভাবনা, ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিনের প্রবর্তন ও কার্টরাইটের বাষ্পচালিত তাঁত শুধু ইংরেজের শিল্পযুগের ভিত্তি রচনাই করিবে না, চিত্রিসারের তাঁতাপাড়ার মদন যোগীকে ও কালচিতার জোলাদের হাসু ওস্তাদকেও আর এক পুরুষের মধ্যে ঢাকা-সোনার গাঁয়ের তাঁতীদের মত, বৃত্তিহারা,

বাস্তহারা করিবে। কোম্পানি ও তাহার কুঠিয়াল কলওলাদের এই প্রচণ্ড লুণ্ঠনে বাঙালী প্রজার রুধিরেই হইবে ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মীর অভিষেক। জনার্দন চৌধুরী শুধু বুঝিলেন—জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার প্রভৃতি লইয়া যে শোষণ-যন্ত্র কায়েম হইতেছে তাহার মধ্যে চৌধুরীরা আর স্থানলাভ করিতে পারিবে না, তাহাদের নূতন ভিত্তিভূমির সন্ধান করিতে হইবে। কী সেই ভিত্তিভূমি, জনার্দন তাহা জানেন না। ভাবিলেন—দেবতার অনুগ্রহ নিঃসন্দেহ, নীলমাধবের দয়া। কিন্তু জনার্দন নারায়ণ, পীতাম্বর ও বিরূপাক্ষকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন—কলিকাতায় কেন, সর্বত্রই ইংরেজ বাণকের দালালেরা জমিদারীর অধিকারী, ধনী, রাজা। নূতনকালে ভাগ্যলাভ করিতে হইলে চাই সেই ইংরেজের সহিত সংযোগ—নূতন উদ্যোগ। অথচ এই হীনতা চৌধুরীদের অগ্রাহ্য।

সনাতন চৌধুরী কিন্তু এই সব তথ্যকে গুরুতর মনে করিলেন না, তীর্থের পথও গ্রহণ করিলেন না। বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্রও তিনি যাইতে চাহিলেন না। এই পঞ্চবটী তলা, এই নীল মাধবের মন্দির, সঙ্কীর্তন, আউল-বাউলের সঙ্গ, 'মাধব মঙ্গল' ও 'সখী-কীর্তন'—ইহাতেই তাঁহার দিনরাত্রি শান্ত মাধুর্যে শেষ হইয়া যাইতে লাগিল।

অন্তিম শয্যায় পুত্র নারায়ণ আসিয়া বলিল: বাবা, কাজী গফর আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কাজী গফর—সফর আলীর পুত্র? শীঘ্র লইয়া আস। —নারায়ণ ইতস্তত: করিতেছিল—এই পঞ্চবটী তলায় আনিবে কি না। এই পঞ্চবটী তলায় এই দেউলের আঙিনায় পৃথিবীতে কাহারও আসিতে মানা নাই; আর গফরের মানা হইবে?

ভূমিকা

সনাতন পরম বৈষ্ণব। সদাচার, নিয়ম, সংযম ও ভক্তিশাস্ত্র পাঠেই তাঁহার নিষ্ঠা। মুসলমানী রীতিনীতিতে তাঁহার এখন শ্রদ্ধা নাই।

গফর আসিল। সনাতন তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে আজ গফর। কঠোর নির্যাতনে ধ্বংসপ্রাপ্ত কাজী বাড়ির ধ্বংস-শেষ পুরুষ সে। দর্প নাই, দম্ভ নাই, কিন্তু নালিশও নাই। পিতৃবন্ধুকে অন্তিমশয্যায় শ্রদ্ধা জানাইতে আসিয়াছে। সনাতনকে দেখিয়া সে তাকাইয়া রহিল—মুণ্ডিত কেশ, মুণ্ডিত শ্মশ্রু, এই তাহার পিতৃবন্ধু সেই আলেমদার সনাতন চৌধুরী? সে যেন কি বুঝিল, নিঃশ্বাস ফেলিল—প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে।

কুশল প্রশ্ন হইল। পরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের কথাও হইল। সনাতনই কথা শেষ করিলেন: আমরা শুধু ছুটাছুটিই করি, বাবা,—লীলাময়ের লীলায় আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারি না বলিয়াই 'এই দশা।

গফরও শেষ করিল: সব গিয়াছে, ইমান যেন থাকে এইটুকু আশীর্বাদ করিবেন আমাকেও।

আসলে গফর আশ্চর্য হইয়াছিল—একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না সনাতন চৌধুরী সফর আলীর কথা? জিজ্ঞাসা করিলে গফরও বলিতে পারিত না—পিতার কোনো সংবাদ। সেও জানে না। কিন্তু এই কী রূপ সনাতন চৌধুরীর? এই কি তাঁহার বন্ধুত্ব, তাঁহার ইমানের পরিচয়?

'ইমান—ইমান—ইমান'—সফর আলীকেই যেন সনাতন আবার দেখিতেছেন। কোথায় তাঁহার সেই বন্ধু, কোন্ দেশে,—তিনি আছেন কিংবা নাই,—তাহা আজ সনাতনের পক্ষে জানা নিষ্প্রয়োজন। বিধাতার এই লীলাবাসরে সফর আলী না থাকুন, রহিয়াছে তাঁহার ইমানের সাধনা—সনাতনের প্রেমের সাধনার মতই তাহাও সেই মহালীলারই এক প্রকরণ।

সনাতন মনে মনে তাহা স্বীকার করিলেন। তারপর চক্ষু বুজিয়া আসিল। বিশ্বলীলার মহামহোৎসবে সনাতন তাহার আপন খণ্ড মানব-লীলাকে একবার আদ্যন্ত দেখিলেন—অনন্ত নক্ষত্রময় আকাশের মধ্যে সূর্য চন্দ্র লইয়া এ কি বিরাট সৃষ্টিবাসর! তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র সনাতনের জীবন-মালাটিকে গলায় দোলাইয়া কে তুমি, হে চির লীলাময়, হে লীলা-মাধব, সনাতনের জীবনকে গ্রহণ করিবার অপেক্ষায় আছ? হাফেজের সেই শাখ-ই-নবাতের মোহ ছাড়াইয়া, কালিন্দীর কামনা-আবেগে, পত্নীর সহজ সুস্থির প্রেমে সনাতনকে তুমি জীয়াইয়া দিলে; তাহাকে তুলিয়া দিলে তেজোময়, বীর্যময় তোমার মহাভারতীয় সংগ্রামের একালের আসরে।···

সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইল নীলমাধবের দেউলে।

বুঝি পাঞ্চজন্য বাজিয়া উঠিল তোমার, হে সখা, হে সারথি! একি! কোথায় তুমি? হে নীলমাধব, তুমি যে আবার সেই পুরাতন বন্ধু কণ্ঠে ডাকিতেছ—'সনাতন! সনাতন! সনাতন!'

রাখালিরা বাঁশী নয়, শাঁখ বাজিতেছে।—'সনাতন কোথায় পলায়ন করিলে?'

হে অর্জুনের সখা, এ কি রূপে তুমি আজ এই অন্তিম মুহূর্তে আসিলে সনাতনের সম্মুখে?—তোমার সেই মহৈশ্বর্যময় রূপের তেজ কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়নন্দন অর্জুন সহিতে পারে নাই। কেন তবে এই ক্ষীণপুণ্য কলির ব্রাহ্মণ সনাতনের সম্মুখে তুমি আসিয়াছ এই বীর্যবান্ কল্কি-রূপে?—কোথায় তুমি সনাতনের নীলমাধব,—এ যে দীর্ঘশ্মশ্রু, দীর্ঘকেশ, জ্বলন্তচক্ষু, অমিত-তেজাঃ, যবনরূপী সফর আলী!

বিস্ময়ে নিথর হইয়া রহিল সনাতনের দুই চক্ষু।

শিকস্ত-পয়স্ত

চিত্রিসারের লোকেরা যাহাই বলুক, সনাতন চৌধুরীর পরে চিত্রিসারের কথা আর আসলে চিত্রিসারের কথা নয়, তাহা কালচিতার কথা। চৌধুরীরা আর সেই সমাজ-চূড়ায় অধিষ্ঠিত নাই, সেখানে পূর্বেই স্থান গ্রহণ করিতেছিলেন সেনেরা, এখন তাঁহারা অধিষ্ঠিত হইলেন। চৌধুরীদের ভূমি-সম্পদ বিনষ্ট প্রায়, কালচিতার সেনেরা হইয়াছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূম্যধিকারী। অবশ্য তাঁহারা বড় জমিদার নয়। পূর্বরূপ জমিদারীর দিন শেষ হইয়াছিল। অন্যদিকে চিত্রিসারের কথা ও চৌধুরীদের কথা যখন আপনার খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন নিজস্বতা হারাইয়া ক্রমেই হইয়া উঠিতেছিল রাজা-রাজ্যের কথা,—ইতিহাসের অলক্ষিত এক পাদটীকা,—তখন বহির্জগতের সেই দুকুল-প্লাবী জোয়ারের বাহন রূপেই ক্রমশ চোখের সম্মুখে চিত্রিসারের আপন যৌবন মহিমায় উঠিয়া আসিল পদ্মা। তাই সেই চিত্রিসার চিত্রিসার থাকিবে কি করিয়া, সেই কালচিতাই বা কি করিয়া রহিতে পারিবে আর কালচিতা ?

হয়ত দুই তিন শত বৎসর ধরিয়াই গঙ্গা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতপথ পরিবর্তিত হইতেছিল। ক্ষীণাঙ্গী নয়া গঙ্গা যখন 'ছোট গঙ্গা' হইল, 'বুড়ী গঙ্গার' সহিত পরিচিত মানুষেরা তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিল না। ধীরে ধীরে সেই 'ছোটগাঙ' আগাইয়া আসিল ; তাহার ফলে এক-কালের 'বড় খাল' নদী হইল ; শুষ্ক 'নওডাঁড়া' বারোমাসী 'চিত্রিসারের খাল' হইল ; ক্রমে জলাভাব-গ্রস্ত চিত্রিসার-কালচিতার মাঠ-ঘাট বর্ষার

জলে ডুবিতে লাগিল। তারপরে, ইলশাজারির 'হাজারীর হাট' ভাঙিয়া পিছাইয়া আসে; চিত্রিসারের খলেও দিনে দুইবার করিয়া জোয়ার ভাঁটার টান লাগে; জোয়ারের জল খালের পাড় ছাপাইয়া আসে; শেষে মাঠ ছাপাইয়া বর্ষার জল ছল ছল করে বাড়ি ঘরের চতুর্দিকে। সেই ছোট গাঙ হয় তখন দুকুলপ্লাবী পদ্মা। তাহার এপারে ওপারে একই পরগণার জীবন-গতিও তাই দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে,—পারাপার করিতে নৌকার মাঝি আর নিঃশঙ্ক নয়। একই কালে নদী স্রোতে সেই পল্লিসমাজের পরিবেশ খণ্ডিত; আবার নদীর টানে সেই পল্লি-জীবন বাহিরের দিকে ভাসমান। কিন্তু প্রাকৃতিক এই পট-পরিবর্তন ক্রমিক ও সহজ গতিতে ঘটিয়া যাইতেছে, কেহ তাই তাহা লক্ষ্যও করিতেছে না —যেমন লক্ষ্য করিল না পলাশীর প্রান্তরের একটা মাত্র সংঘর্ষে একটা বিশাল জাতির ভাগ্যপরিবর্তন।

এমন কি, সেই যুগাবর্তনও এই ক্রমবিধ্বংসী পদ্মার ধ্বংসলীলারই আড়ালে চিত্রিসারে অনেকাংশে অপ্রত্যক্ষ রহিয়া গেল।—এই দেশের ধুতি মলমল রপ্তানি করার বদলে এখন বিলাতী বস্ত্র আসিয়া তাঁতীদের অন্নহীন করিল। চিত্রিসারের ও কালচিতার জোলারা মাথায় হাত দিয়া বসিল। কিন্তু কে তাহা লক্ষ্য করে? চোধুরীবংশের মৌজাটি গ্রাস করিতে করিতে পদ্মা যে 'চৌধুরীর হাটের' দিকে আগাইয়া আসিতেছে তাহাই চিন্তিত করিতেছে পীতাম্বর চৌধুরীকে;—চিত্রিসারের সহজ মানুষকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে এই শিকস্ত-পয়স্ত।

বংশবৃদ্ধির সঙ্গে চৌধুরীদের এখন সচ্ছলতা আরও ক্ষয় পাইতেছে। পদ্মনাভ চৌধুরীর উদ্ধত অহঙ্কারের পরে প্রশান্ত আভিজাত্যে স্থির হইতেছিল। সেই দর্পিত উগ্রতার স্থলে চৌধুরীদের চরিত্রে সনাতন চৌধুরীর পর হইতে দেখা দিতেছিল প্রসন্ন উদারতা। লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য যে

ভূমিকা

কমিতে-কমিতে কোথায় কমিয়া আসিয়াছে তাহা যেন তথাপি চোখ মেলিয়া দেখিতে চাহেন না সনাতনের পৌত্র পীতাম্বর চৌধুরী। মান ও সম্ভ্রম আগলাইয়া পিতৃপুরুষের ঠাট যথোচিত বজায় রাখিতেই হইবে। বিশেষত যখন মধ্যমগ্রামের আনুকূল্যে কালচিতার সেনেরাও আজ নূতন প্রতিষ্ঠাপন্ন। চৌধুরীদের কাছারিবাড়ি নাই, উহার খালি ভিটায় আগাছা জন্মিতেছে। পীতাম্বর বহির্বাটিতে কিংবা পঞ্চবটীর বাঁধানো আঙিনায় বসিয়াই নায়েব তহশীলদার ছ'কড়ি দত্তের হিসাব গ্রহণ করেন।

—পূজার খরচপত্রও টানিয়া করিতে হইবে? তাহা হইলে আর মহাল রাখা কেন? —পীতাম্বর চটিয়া যান ছ'কড়ির উপর।

ছ'কড়ি দত্ত জানায়—মহাল নাই। আছে শুধু এই গ্রামটুকুই। তাহাও সম্পূর্ণ নয়। যোগী-পাড়াও নিঝুম। তাঁতবন্ধ—কুঠির রপ্তানী নাই, দাদন নাই। অবশ্য বারুজীবী; তিলী, কামারদের উপর মুরচা আদায় করা যায়। সেনেরা ও সরকারেরা তাহা করিতেছে।

পীতাম্বর গর্জিয়া উঠিলেন: তাহার অর্থ? দালাল-পাইকারের মত জমিদারী করিতে হইবে নাকি—প্রজা-লুণ্ঠন করিয়া?

না, পূজায় খরচ যথাপূর্ব করিতে হইবে—অথচ যোগীরা তুলাও পায় না—বস্ত্রও জোগায় না। ছ'কড়ি কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর বলে: তাহা হইলে ইন্দু পালের গদিতে একবার খোঁজ করি—কিস্তীর টাকাটা।

ইন্দু পালের বিলাতী কাপড়ের বড় গদি ইলশাজারীর হাটে।

আবার গর্জিয়া উঠেন পীতাম্বর: এখনো খালিপায়ে ছাতা বগলে করিয়া আসে দশহরার প্রণাম করিতে ইন্দু পাল; আর তাহার নিকট হাত পাতিবে?

সিন্দুক হইতে সেবারও বাহির হয় কিছু মোহর।

ভূমিকা

চৌধুরীদের কল্পনা আর এই ক্ষেত্রে পক্ষ বিস্তার করিতে পারে না। কারণ, বড় কঠিন রূঢ় সত্য এই জীবন-পট। সেই সিন্ধুকে মোহর মোটেই বেশি নাই। তাহা ছাড়া, সেই জীবন-কাণ্ড যে চৌধুরী কুলের উত্তরকাণ্ড মাত্র,—মাত্র সেদিনের কথা:—অবশ্য শিবপ্রসাদ ও রঘুপতি চৌধুরী তখন যৌবনে পদার্পণ করেন নাই, মহারাণীর রাজ্যভার লইবার হয়ত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। এই কাল ও এই মানুষদিগকে সেই শঙ্কর চৌধুরী-স্থরথ চৌধুরীর মত মহৎ কোনো একটা মহিমার সাজে ঢালাই করা কল্পনারও পক্ষে আর সম্ভব নয়। বড় নিকটের কথা, পরিষ্কার তাহার প্রমাণ এখনো চিত্রিসার গ্রামে, উহার বাড়িঘরে, সর্বত্র।

ভগ্ন-পক্ষ কল্পনা তথাপি উড়িতে চাহে।

সেনেদের সহিত চৌধুরীদের তখনো পাল্লা দেওয়া চলিতেছে—গ্রামের সামান্য জমা ও চৌধুরীর হাটই মাত্র ভরসা। এমনি সময়ে নদীমুখের চৌধুরী হাটকে পদ্মার গ্রাসে বিলোপের অবসর না দিয়াই সেনেরা বাজার বসাইতে গেলেন নিজেদের জমিতে চিত্রিসারের খালের ধারে। দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন গিরিশ সেন। তেমনি দুর্বৃত্ত তাহার পুত্র কালীশ সেন। এক পাল দুর্বৃত্তের সর্দার হইয়া সে ত্রাস সঞ্চার করিয়াছে কালচিতার-চিত্রিসারের দরিদ্র গৃহস্থের মনে - বউ-ঝি লইয়া সসম্মানে থাকিবারও বুঝি উপায় নাই কালীশ সেনের জন্য। অন্যান্য সেন কর্তারা নীরব। গিরিশ সেন বরং পরোক্ষে পুত্রের সমর্থনই করেন—হাঁ কালীশইত জমিদার। প্রজা, রায়ত, দোকানী, ব্যবসায়ী, কেহই তাহার ভয়ে ভুঞাদের প্রাপ্য না মিটাইয়া পারে না। অন্যেরা বুঝেন, আসলে ইহা দাপটের প্রমাণ নয়, প্রমাণ সেনেদের বিস্তৃত পরিবারের আগতপ্রায় অনটনেরও।

ভূমিকা

কল্পনা একটা নূতন সীমানা দেখে—এইখানে।

কোথায় পূজা মানস করিয়াছিলেন পীতাম্বর চৌধুরীর গৃহিণী। পাল্কীতে নিজ গৃহে ফিরিতেছিলেন। মাঠের পথে খানিকটা জল। কালচিতার পথেই বেহারারা পাল্কী লইয়া চলিল—তবে সেনবাড়ির সম্মুখ দিয়া নয়, গ্রামের পার্শ্ব দিয়া। কিন্তু কোথা হইতে দলবল লইয়া সেখানেও কালীশ সেন আসিয়া পড়িল। তাহার মত্তাবস্থা। কালীশ হাঁকিল; থামা পাল্কী।—তারপর: কে যায়?

—চৌধুরীদের কর্ত্রীঠাকুরাণী।

—কাহাদের?

—চৌধুরীদের। পীতাম্বর চৌধুরীর পরিবার।

—কালচিতার উপর দিয়া পাল্কীতে যায় তাহারা কোন সাহসে?

চৌধুরীদের বেহারারা স্তব্ধ। সেই পদ্মনাভ চৌধুরীর আমলের চুক্তি আছে—কালচিতা দিয়া পাল্কীতে আর কেহ যাইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া পাল্কীতে মেয়েরাও যাইবে না?

—পাল্কী রাখ্। হাঁটিয়া যাইতে হয় এই গ্রাম দিয়া চৌধুরীদের।

বেহারাদের একজনই বলিল: হুঁজুর, কর্ত্রীঠাকুরাণী—তাঁহার মান, বয়স ভুলিয়া যাইবেন না।

কালীশ সেন কুৎসিৎ হাস্যে বলিল,—তবে খোল পাল্কী—দেখি, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মুখ, বয়সটা কত বুঝি।

কালীশের মত্তকণ্ঠে হাসির বিকট শব্দ উঠিল। তাহার নীচ জাতীয় সঙ্গীরাও তাহাতে যোগ দিল; কিন্তু তত স্বচ্ছন্দে নয়—কেমন ভয়ে ভয়ে।

পাল্কীর ভিতর কণ্ঠ শোনা গেল। তীব্র কঠোর স্বর: সুবলের মা, বলতো হীরাকে—পাল্কী তুলিবে, না, রসিকতা করিবে দাঁড়াইয়া?

গৃহিণীর দাসী সুবলের মায়ের কণ্ঠস্বরও প্রতিধ্বনিত হইল।

ভূমিকা

সকলে স্তব্ধ। বেহারারা পাল্কী তুলিয়া লইয়া চলিয়াছে। কালীশ সেনও বুঝিল বাড়াবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু এখন কিছু না বলিলেও সেনেদের দর্প থাকে না। কালীশ বলিল: যা, হীরা, যা! ঠাকুরাণীকে না আসিয়া পাল্কীতে আসিতে বলিস চৌধুরীদের—বুঝিব সাহসটা।

পাল্কী আসিয়া চৌধুরীদের প্রাঙ্গণে পৌছিল। কর্ত্রীঠাকুরাণী নামিলেন। হীরুকে বলিলেন: কর্তামশায়কে বল,—কালীশ সেনের রক্ত না দেখিয়া কর্ত্রী-মা ঘরে উঠিবেন না। আমি বসিলাম নাটমন্দিরে।—সেই নাটমন্দিরের চালায় তখন খড়ও নাই।

সেই রাত্রিতেই সেনেদের খালপারের বাজারে আগুন লাগিল। প্রভাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের বিরোধ শেষবারের মত জ্বলিয়া উঠিল।—হাটখোলার পার্শ্বে, চণ্ডীতলার মাঠে—লাঠি, ভাঙা সড়কি বল্লম, কোঁচ বাহির হইল। মাথা ফাটিল, রক্তপাত হইল। অবশ্য দ্বিপ্রহরের পূর্বেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিল দুই পক্ষ। শুধু ফিরিল না কালীশ সেন—নিজের প্রমত্ত অহঙ্কারের ফলে; আর বিরূপাক্ষ চৌধুরীর পুত্র রঘুপতি গৃহে ফিরিল রোধিরাক্ত দেহে—চিরদিনের মত একটি চক্ষু ও বাহু হারাইয়া।

তারপর দুইপক্ষই বুঝিল—শুধু কলিকাতায় রাজা রাজবল্লভের সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থপ্রীম কোর্টে নির্ণীত হয় না। কোম্পানির আমল এই দূর পল্লি-অঞ্চলেও স্থির হইয়া বসিয়াছে। জমিদার ভুঞার দ্বন্দ্ব এখন দারোগা-হাকিমের তদন্তের বিষয়। জয়-পরাজয়ের শেষ নির্ণয় হয় উকিল-মোক্তারের সওয়াল জবাবে; টাকায় কেনা আইন-কানুনের বিচারে। অতএব মাসের পর মাস গেল, দুই গোষ্ঠীরই কর্তৃপক্ষীয় কেহ অবশ্য গ্রেপ্তার হন না—দারোগাকে অর্থ দিয়া উদ্ধার পাইতে হইল।

দারোগার সুরত-হালের ফলে তাই ইন্দুপালের গদিতে এই পক্ষের, রসিক সরকারের গদিতে অন্য পক্ষের গতায়াত বাড়ে। সম্পত্তি ও সোনা-দানা বাঁধা পড়ে। তারপর শহরে মামলা চলে। পীতাম্বর চৌধুরী ইহারই মধ্যে মারা গেলেন—তাঁহার পুত্র সন্তান নাই। অন্যপক্ষে পুত্রহারা গিরিশ সেনও আর গৃহের বাহির হন না।

উভয়েই দাঙ্গার মামলায় নূতন বিপদের মুখে গিয়া পড়িতেছিলেন। সেনেরা খানিকটা জমি নীলকর ওয়াইজ সাহেবকে পত্তনি করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। সেইসূত্রে নূতন করিয়া বাজার জমাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পোড়া বাজারে হাটের দোকানী-পশারী সহজে আসিতে চাহে না; বলে অলক্ষ্মীর বাজার। সেখানে ঘটা করিয়া তখন সেনেরা চণ্ডী প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাভাবেই নানাভাবে পীড়নও করিতে ছাড়ে না ব্যবসায়ীদিগকে জালিয়াদের; বারুজীবীদের বরোজের খাজনা বাড়াইয়া তোলে। এককালে আদায়-ওয়াশিলে যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছিল কোম্পানির গোমস্তা, দালাল, পাইকাররা, সেনেরাও আবার তাহাই আরম্ভ করিয়াছে। পীড়নটা সর্বাধিক হইল কালচিতার জোলাদের উপরে। বিলাতী কাপড়ের চাপে তাহারা তাঁত বেচিয়া চাষী বনিতে চাহে; কিন্তু জমি কোথায়? তাই গ্রাম ছাড়িয়া পালায় নূতন চরে। সেখানেও সেনেরা তাড়া করে। ঠিক তেমনি নীলের দাদন ও সেই চাপ গিয়া পড়িতেছে চিত্রিসারের ঢালীদের উপরে। দুর্ধর্ষ-উদ্ধত কৃষক তাহারা। কিন্তু ফকিরের রাজত্ব ও ঘাসু ডাকাতের লড়াই'র যুগ আর নাই! 'ঘাসু গাজীর' নামই শুধু রহিয়া গিয়াছে বড় খালের দিককার 'গাজীর ঝোপে'। কাজীপাড়ার কাজীদের বা চৌধুরীদের ত আর এই সব প্রজা-রায়তকে রক্ষা করিবার অধিকারও নাই, সাধ্যও নাই। এখন তাহারা সেনেদের ও সরকারদের প্রজা! এই দুঃসময়ে কাহার দিকে তাকাইবে তাহারা—সর্বনাশের সম্মুখস্থ

এই চিত্রিসারের যোগী, কালচিতার জোলারা? নূতন অত্যাচারে উৎপীড়িত ঢালী ও চাষীরা? চৌধুরীরা, কাজীরা তাহাদের চিরদিনের মুরুব্বি। কিছু করিবেন কি তাহারা? —প্রজারা বেশি ভরসা পায় না।

বুঝা গেল না, উহারা তিতুমীরের নাম শুনিল কোথা হইতে, তারপরে কেমন করিয়া যোগাযোগ ঘটিল শরিয়তুল্লা'র সহিত। সেই ফুলশাহ্ ফকির ও ঘাসু ডাকাত এবং দাসু কৈবর্তের স্মৃতিই বুঝি এক সঙ্গে আবার এই কৃষক দরিদ্রদের প্রাণে জাগিয়া উঠিল। ঘাসু ও দাসুর পাঁচালী চলিতেছিল লোকের মুখে; তাহারা এখনো তাহা গাহিত। সে মন্ত্র ত আকাশে-বাতাসে এখনো ফিস ফিস করে।

"আশমান-জমিন যিনি করিলেন পয়দা।
দুনিয়াতে মালিক তিনি একমাত্র খোদা॥
তাহান জমিনে যেবা পয়দা করে যাহা।
মালিক তাহার সে-ই, কহেন ফুল শাহা॥
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, মুনিব আর বান্দা।
গাজী কহে—খতম করো বেইমানের ধান্দা।"

জমিতে ফসল যে পয়দা করে সে-ই মালিক ফসলের।—কে জমিদার? কে রায়ত? কথাটা আবার বাতাসে বাজিয়া উঠিল।

এইদিকে কাজীবাড়ীর বৃদ্ধ মিঞা ইমামুদ্দীনের ভাঙা গৃহে, বৈঠক বসিতে লাগিল ঘন ঘন। সফর কাজীর বংশধর তাঁহারা—যে সফর মহাজরীন হইয়া মক্কায় যান। তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা ও প্রেরণা লইয়াই ফরাজীরা আজ দার-উল-ইসলাম স্থাপনের জন্য ইমামুদ্দীনকে ডাকিতেছে। ইমামুদ্দীন বৃদ্ধ, তিনি ফরাজীদের সঙ্গে একেবারে ভাসিয়া পড়িবেন কিনা, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ইতিপূর্ব্বে নিষ্কর আয়মা মহালের উপর কোম্পানী খাজনা ধার্য্য করায় তিনি

মধ্যমপাড়ার ও অন্যান্য জমিদারের মতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বিপদ বেশি। বরং হিন্দুদেরও অন্য উপার্জন আছে—মধ্যমগ্রামের গুপ্তরা চিরদিনই ইংরেজ সরকারে চাকরি করেন। কিন্তু তিনি মুসলমান, সফর কাজীর বংশধর; তিনি ত নসরার চাকরি করিতে যাইবেন না।

তাহা ছাড়া, মেকলের প্রণীত 'নূতন দণ্ডবিধি আইন' মুসলমানের এত শত বৎসরের শরিয়তি আইন ও কাজীর প্রতিপত্তিকে একেবারে ধ্বংস করিতেছে। হিন্দু চাকুরিয়া ও ইংরেজ শাসকেরা একযোগে মিলিয়া আইন-আদালত হইতে ফারসি বিতাড়িত করিয়া বাংলা ও ইংরেজি প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারকে আবেদন করিতেছে। হিন্দুরা ফার্সি চাহে না; কিন্তু উহা গেলে মুসলমানদের থাকিবে কি? আয়মা মহালে খাজনা হওয়ায় কাজীদের রহিল কি?—কিন্তু করিবেনই বা তিনি কি? সফর আলীর মত জেহাদ? না, এই 'ফরাজীদের' সঙ্গে তাঁহার ধর্ম মতের কোনো মিল নাই। উহারা শরিয়তের নানা নূতন ব্যাখ্যা করে। মোল্লা ও ইমামদের উহারা মসজিদ হইতে তাড়াইতে চাহে। বলে, উহারা গুণাগার। ফরাজীরা ওয়াক্‌ফর জমিদার জায়গীরদারদের সত্বস্বামিত্বও মানে না। ইংরেজের মতই ত এই ফরাজীরাও চাহে কাজীদের শেষ জমিজমা গ্রাস করিতে। ইমানুদ্দীন তাই ঢালীদের সমর্থন করিলেও ঝাঁপাইয়া পড়িবেন না ফরাজীদের সহিত। কাজীরা থাকিতে ইহারা সর্দারি করে মুসলমানদের উপরে?

পীতাম্বর চৌধুরী নাই। তাই শিবপ্রসাদ চৌধুরীর নিকটই আসিল ঢালীপাড়ার সর্দার। সেনেদের সঙ্গে ত তাঁহাদের বিরোধ। তিনি সনাতন চৌধুরীর বংশধর; তাঁহাদের এই কৈবর্ত পাটনি যোগী জোলা ঢালী প্রজাদের পোষকতা করিবেন না তিনি এই সময়ে—সেনেদেব বিরুদ্ধে?

শিবপ্রসাদ কথা দেন—সামর্থ্যানুযায়ী তিনি তাহা করিবেন। কিন্তু

সামর্থ্য তাঁহার কম, সাহসও তাই কম। তাহা ছাড়া তিনি দেখেন—শরিয়তের নামে বড় গোঁড়ামি করে এই ফরাজীরা। তথাপি শিবপ্রসাদ এই ঢালী ও জোলাদর যতটা পারেন সহায়তা করিবেন। তাহারা যে চৌধুরীদেরই প্রজা সেদিনও ছিল। আজই কি পর হইয়া গিয়াছে ?

প্রজাবিদ্রোহে তাই সেনেরা আরও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এমনি সময়ে আবার মোড় ঘুরিয়া গেল পাশার। হিন্দুর দেবদেবীর বিরুদ্ধে ফরাজীরা যদৃচ্ছা প্রচার করে। সেনেদের বাজারের অরক্ষিত কালীমূর্তি তাহারা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে ; সাহস করিয়া সেনেরা তাহা আর প্রতিষ্ঠা করেন না। হাটতলার 'চণ্ডীর ঘট' ফরাজীদের প্ররোচনায় কে রাত্রিতে চুরি করিয়া জলে ফেলিয়া দিয়াছে। অবশ্য মুসলমান ঢালী প্রজারাই তাহাতে রাগ করিয়াছে। 'পীরের ঢিবি' পর্যন্ত ফরাজীরা উপড়াইয়া ফেলিতে গিয়াছিল—সেই ফকিরের যেখানে আস্তানা ছিল। উহাতে ঢালীদের ও কৈবর্তদের সঙ্গে ফরাজীদের কলহ বাধিবার উপক্রম হইল। হিন্দু দাসেরা ক্রমে দল ছাড়িয়া দিতে চাহিল। অন্য দিকে হিন্দু মুসলমান জমিদারেরাও চমকিত হইয়াছিলেন—বড় সঙ্কট। শিবপ্রসাদ চৌধুরী যাহাই করুন্, কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন না। তিনি এক আধটুকু সংবাদপত্র পড়েন। তাই জানেন—দেশে ইংরেজ শান্তি স্থাপিত করিয়াছে। শিক্ষার প্রসার হইতেছে—উহাতেই মঙ্গল।

সমস্ত গ্রাম কিন্তু তবু ফরাজীদের প্রতিপত্তিতে কাঁপিতে লাগিল। চৌধুরীদের অবশ্য ভয়ের কোন কারণ নাই ; তাঁহারা চিরদিনই ফকিরের পক্ষীয়, গাজীর পক্ষীয়। কিন্তু কালচিতার সেন, হাজারীহাটের মজুমদার, বেনাপাড়ার সরকার, এমন কি মধ্যমপাড়ার গুপ্ত—সকলেই ভীত ত্রস্ত ; এইবার ফরাজীরা একটা প্রজাবিদ্রোহ ঘটাইবে। সরকার রক্ষা করুন্ !

ইহারই মধ্যে সংবাদ আসিল—ফরাজীরা রাজনগরের দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয়

রায় স্থাপিত দ্বাদশ শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহার শিবলিঙ্গ নদীজলে ফেলিয়া দিয়াছে। পোড়াগাছার হিন্দুর বাড়ী চড়াও করিয়া সেই গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিতেছে। পাটকোন্দায় এক পূজামণ্ডপে গোহত্যা করিতেছে। হিন্দুরা তটস্থ, জমিদার-মহাজন সকলে চীৎকার জুড়িল—'অরাজকতা, অরাজকতা।'

পুলিশ দারোগা ম্যাজিস্ট্রেটের তখন সুযোগ আসিল।

ইমামুদ্দীন বলিলেন: তিনি হজ-যাত্রা করিতেছেন। শরিয়তুল্লার পুত্র দুধামিঞাও সাবধান হইলেন। বহু ফরাজী কারারুদ্ধ হইল। আর শিবপ্রসাদ চৌধুরী মুসলমান জাতির এই ধর্মান্ধতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন—হিন্দুধর্মের উপরে মুসলমানদের চিরদিনই বিদ্বেষ। বড় অত্যাচারী ও দুর্দান্ত এই জাতি। বরং ইংরেজের আমলেই হিন্দুরা শান্তিলাভ করিয়াছে।

ইংরেজ-শাসনের প্রাচীর চৌধুরী ও কাজীদের সুদীর্ঘ বন্ধুত্বকে আড়াল করিয়া ক্রমশই মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে—কেহই তাহা জানিল না; বুঝিলও না।

দেশ শান্ত হইল। মধ্যমগ্রামের গুপ্তরা এইবার এই অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে দেশের লোককে জাগ্রত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা বিদেশে কাজকর্ম করেন। কেহ থাকেন বাখরগঞ্জে, কৃষ্ণনগরে কেহ, কেহ বা কলিকাতায়। সেখানে তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজি বিদ্যালয়েও পড়া আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকায় বসিয়াও 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকার' বাদানুবাদে কেহ কেহ আগ্রহ বোধ করেন। তাই সংবাদ পত্রে শরিয়তুল্লার ও ফরাজীদের অত্যাচারের সংবাদ যথানিয়মে প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় কেহ আবার আত্মীয় সভার ও ধর্মসভার দ্বন্দ্বে রামমোহনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহা না হইলেও গুপ্তরা সতীদাহ বিরোধী এবং ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী। এই 'ফরাজীদের' মত ধর্মান্ধরাই না হইলে আবার

দেশে নবাবী আমলের মত অত্যাচার অনাচার চালাইবে। ইংরেজি শিক্ষার অর্থকরী ও বিত্তকরী মহিমা এখন উচ্চবর্গের অন্যদের নিকটও সুবিদিত।

মধ্যমগ্রামের গুপ্তবাড়ির পাঠশালা "বঙ্গবিদ্যালয়" হইয়াছিল; মুনসেফ উদয়কৃষ্ণ গুপ্ত এখন উহাকে "নববিদ্যালয়ে" পরিণত করিতে উদ্যোগী। তাঁহাদেরই ভাগিনেয় বৈদ্যনাথ ভবানীপুরের ইস্কুলে পাঁচ ছয় বৎসর পড়িয়াছে। এখন মাতার পীড়ায় সস্ত্রীক সে মধ্যমগ্রামে থাকিবে, স্থির হইয়াছে। বৈদ্যনাথ 'নববিদ্যালয়ে' প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষার মাষ্টার হইবে, অবশ্য প্রধান শিক্ষক থাকিবেন বৃদ্ধ রামজয় ভট্টাচার্যই। বিজয়ার পরে উদয়কৃষ্ণ গুপ্ত এই বৎসর এই শিক্ষা-প্রস্তাবের আলোচনা উপলক্ষ করিয়া সেনদের ও চৌধুরীদের ডাকিলেন। বৃদ্ধ ইমানুদ্দীনকেও পরামর্শ চাহিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারাই গ্রামে থাকেন; গ্রামের মুনিব মালিক,—গ্রামের উন্নতি করুন্।

উদয়কৃষ্ণ রাজকর্মচারী, ভাগ্যবান পুরুষ, সভ্যতায় শিষ্টাচারেও দক্ষ, সত্যই কৌশলী পুরুষও। নূতন শিক্ষাদীক্ষা যে কলিকাতায় মহৎ উন্নতির হেতুস্বরূপ, তাহাতে যে চুঁচুড়া, বর্ধমান, হুগলি, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থলের ভদ্রমহোদয়গণ অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, তদ্দেশীয় শিক্ষিত মহোদয়গণ যে কি বিদ্যায়, কি বৈভবে সর্ব রকমেই পুরোগামী—ইংরেজি বিদ্যালাভ ছাড়া যে কোনোরূপে দেশের এই দুঃখদুর্দশা, অধঃপতন শেষ হইবে না,—এবং সে বিদ্যায় যে অর্থার্জনের কত বড় সুযোগ লাভ সম্ভব—তাহা উদয়কৃষ্ণ ভালো করিয়াই বুঝাইয়া বলিতে সক্ষম হইলেন। ইহাও বলিলেন, অস্মৎ-জেলায় বহু জ্ঞানী মানী ব্যক্তিও আজ উহার অভাবেই হীনাবস্থ। কাহারও' ইহা না বুঝিবার কথাও নয়—শিবপ্রসাদ নিজেই তাহা মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে শহরে যাতায়াত করিয়া বুঝিয়াছেন। সেনেরাও গুপ্তদের দেখিয়া তাহা আরও বেশি

উপলব্ধি করিয়াছেন। সকলেই ইংরাজি শিক্ষাদানের প্রস্তাবে একমত। নীরব হইয়া রহিলেন তথাপি ইমামুদ্দীন কাজী।

তিনি হজে যাইবেন। ফরাজীদের বিরুদ্ধে তিনি মৌলবী মোল্লার ফতোয়া দেখিয়াছেন। এ কথা বুঝিয়াছেন যে, উহারা মুসলমানেরই শত্রু। কিন্তু মুসলমানের দুর্দিন সম্বন্ধেও তাঁহার অভিমত দৃঢ় হইয়াছে। তিনি বলিলেন, গুপ্ত মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা সত্য। হিন্দু হইলে ইমামুদ্দীনও এইরূপই বলিতেন। কিন্তু তিনি মুসলমান। মুসলমানের এখন দুর্দিন। তাহার কারণ সে তাহার শরিয়ৎ ও রসুলের নির্দেশ ভুলিয়া গিয়াছে। মুসলমান হইয়া তিনি তাই এই ইংরেজের বিদ্যা, ইংরেজের কাজ—কোনটিই স্পর্শ করিতে পারেন না। তবে হিন্দুর পক্ষে তাহা ধর্মসঙ্গত। তাঁহারা ফার্সি আরবী পাঠ করিতেন, না হয় ইংরেজিও পাঠ করিবেন।—তাঁহাদের সহিত মুসলমানের অনেক তফাৎ।

আরও এক পদ তাই পশ্চাতে সরিয়া গেলেন মুসলমান—তফাৎটা বাড়িয়াই চলিল।

উদয়কৃষ্ণ ইহাও জানিতেন। কিন্তু উত্তর দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। সেন ও চৌধুরীরা পরস্পরের কলহ ভুলিয়া যে, তাহার প্রস্তাবে একমত হইয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট। তাঁহার অন্য প্রয়াসও এখন সিদ্ধ হইল। বিজয়ার আলিঙ্গনে শিবপ্রসাদ ও হরিশ সেনই শুধু এই গৃহে মিলিত হইলেন না; চণ্ডীতলার মাঠের দীর্ঘ বৈরিতা, মামলা-মোকদ্দমাও উভয়ে ত্যাগ করিতে এই উপলক্ষে প্রতিশ্রুত হইলেন। উদয়কৃষ্ণ বুঝাইলেন—তাঁহারা শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রবংশ—কলহ করিবেন কেন?—তাঁহাদের দৃষ্টান্তেই যে দশজন শিক্ষালাভ করিবে।

ভূমিকা

সেন ও চৌধুরীদের যুদ্ধটা সমাপ্ত হইল। আসলে কথা, সেই 'চৌধুরী হাটই' এখন নদী 'শিকস্ত' হইতে চলিয়াছে। নূতন চর যাহা 'পয়স্ত' হইল তাহাও সেনেদেব মহালের দিকে।—কি লইয়া আর কলহ করিবেন তবে চৌধুরীরা? প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য চলিল,—চিত্রিসার ও কালচিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন চলিবে তখন চৌধুরী ও সেনেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা বিলুপ্ত হইবে কিরূপে? বিশেষত, এখনো রঘুপতি জীবিত রহিয়াছেন। কালীশ সেনের মাতা এখনো কাঁদিয়া অভিশম্পাত দেন চৌধুরীদের। অবশ্য ঋণগ্রস্ত, বহুগোষ্ঠীতে বর্ধিত ও পদ্মার গ্রাসে অবলুপ্ত-বিত্ত এই দুই গোষ্ঠীর কাহারও আর বুঝিতে বাকী থাকে নাই—ইংরেজের আইন-আদালতে নিজেদের নিঃস্বতা, আর সেখানে 'ভুঞার' মূল্য। জয় কাহারও হয় না, ঋণভারই উভয়ের বাড়ে। বরং ইংরেজি শিখিলে সরকারী চাকরী লাভে ও অর্থলাভেই হয়ত আবার প্রাতষ্ঠা সম্ভব।

শিবপ্রসাদ চৌধুরীও এইবার চিত্রিসারে ভাঙা নাটমন্দিরে খুলিয়া বসিলেন 'বিদ্যালয়'। মৌজা গিয়াছে, হাট গিয়াছে, কিন্তু চৌধুরীরাই দেশের মানুষকে চিরদিন শিক্ষাদান করিবেন। পাঠশালা পূর্বেই ছিল—পাড়ার ছেলেমেয়েদের পড়াইতেন গ্রামের চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। কিন্তু শুধু ইহাতে আর কুলাইবে না। এখন 'বিদ্যালয়' খুলিতে হইবে। হাঁ, শুধু ফলা বানান শুভঙ্করী নয়, রীতিমত সাহিত্য, অঙ্ক, ভূগোল পড়াইবার ব্যবস্থা হইবে। এইখানকার ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। চৌধুরীরা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। তাহার কনিষ্ঠ সহোদর দেবপ্রসাদও এখানে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া পরে ঢাকায় যাইবে পড়িতে। রঘুপতির পুত্র রাঘব ও রাজীব, আর বাড়ির কুলীন ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীরা এই বিদ্যালয়েই পাঁঠারম্ভ করিবে। চিত্রিসার কালচিতায় নূতন জ্ঞানালোক বিকীরণ করিবেন চিরদিনের মত এখনো চৌধুরীরাই।

ভূমিকা

ততক্ষণ গুপ্তদের পক্ষচ্ছায়ায় কালচিতার সেনেরা ছুটিল বাখরগঞ্জে, কৃষ্ণনগরে। অর্থার্জন করিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যার্জনও প্রয়োজন। রঘুপতি চৌধুরী হাসিলেন—'কোম্পানির কুঠির গোলামী সেনেদের রক্তগত। বেলি সাহেবকে 'বাবা' ডাকিয়াছিলেন সেদিনে হরনাথ সেন।' কিন্তু যাহাই তিনি বলুন, সকলেই জানে—সেনেরাই এখন 'নয়া ভুঞা।' ভাগ্য পরীক্ষায় চৌধুরীদের তাহারা আর এক পদ পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে এখন এই সূত্রে।

কথাটা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিল নূতন যুবক দেবপ্রসাদ। বিদ্যালয়ের পরিধি সে পূর্বেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। মধ্যমগ্রামের বৈদ্যনাথ দাসের নিকট সে ইংরেজি পড়িবার জন্য যায়—পড়িয়া বিমুগ্ধ হয় 'সমাচার দর্পণ' ও 'জ্ঞানান্বেষণ', নানা পুস্তক।

কি লইয়া কলহ করিতেছে চৌধুরী ও নয়া ভুঞারা? আজ শিকস্ত হইয়া গিয়াছে তাহাদের সেই কাল। নূতন কাল নূতন পৃথিবী পয়স্ত করিতেছে। তাহারই বার্তা 'জ্ঞানান্বেষণে', 'দর্পণে'।

তাহার মনে স্বপ্ন জাগে, সংকল্প উদিত হয়—সেও কলিকাতা গিয়া বিদ্যার্জন ও অর্থার্জন করিবে।

কিন্তু মুখে দেবপ্রসাদ কিছু বলিতেও পারে না।

দেবপ্রসাদ পরিবারের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। পিতৃস্নেহ সে বেশি দিন লাভ করিতে পারে নাই। চিরদিনই আবার সে একটু দুর্বলদেহ, নানা পীড়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়া জুটিত। এখন যৌবনে পদার্পণ করিতে সেই উপদ্রবগুলি কম। কিন্তু তথাপি তাহাকে এই চৌধুরী বাড়ির মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করা কষ্ট। কোথায় পীতাম্বর চৌধুরী, রঘুপতি

চৌধুরী,—কিংবা এই শিবপ্রসাদ, হরপ্রসাদ চৌধুরী,—শ্যামবর্ণ কিন্তু সুগঠিত, বলিষ্ঠ দেহ পুরুষ তাহারা;—আর কোথায় এই রোগা একহারা, মুখচোরা যুবক দেবপ্রসাদ। শিবপ্রসাদ কিন্তু এই ফর্সা রং, দীর্ঘ চোখ, শান্ত শঙ্কিত দৃষ্টি স্নেহভাজন কনিষ্ঠের দিকে চাহিয়া ভাবিতেন—এমনি কি ছিলেন তাঁহাদের বৃদ্ধ পিতামহ সনাতন চৌধুরী তাঁহার প্রথম যৌবনে?—হাফেজের ভক্ত, আলেমদার? দেবপ্রসাদেরও যে তেমনি মেধা ও আগ্রহ পাঠাভ্যাসে। তেমনি তাহার বিদ্যার্জনের বাসনা—বাহিরে কলিকাতায় গিযা।

শিবপ্রসাদেরও ইচ্ছা হয়—তাহাকে বিদ্যালাভের সুযোগদান করেন; দেবপ্রসাদ তেমনি পণ্ডিত হউক—ইংরেজি বিদ্যায়। কিন্তু কি করিযা তাহা সম্ভব? কলিকাতা দূর দেশ। এই দুর্বল দেহ কিশোব একা সেখানে যাইবে কিরূপে? ঢাকায় অবশ্য বিদ্যালয আছে, কলেজ হইতেছে। কিন্তু সেই ঢাকা আর নাই। তাহার তাঁত-শিল্প বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষই ষোল বৎসরে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে। ঢাকা গিয়া দেবপ্রসাদ আর কতটুকু পণ্ডিত হইরে?

আর রঘুপতি চৌধুরী তখনো বাঁচিয়া। তিনি বরং উল্টা বলিলেন,—বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবু। ওই রোগা দেহ। উহার উপরে বিদ্যার বোঝা চাপাইতে হইবে? কেন তাহাদের কি ইংরেজ শিখিয়া বিদেশে গিয়া পরের চাকরি করিয়া খাইতে হইবে নাকি?

আসলে কথাটা তাহারও মনে মনে ঘুরিতেছিল—অর্থার্জনের কোনো নূতন উপায় না দেখিলে আর মান-সম্মান থাকুক, পরিবারের ব্যয়-সঙ্কুলানও সম্ভব নয়।

তাই দেবপ্রসাদের ভাগ্যে ইংরেজি শিক্ষালাভ ঘটিল্ না। ষোল বৎসর

বয়সে তাহার বিবাহ হইয়া গেল—বুড়োঢার কমলাক্ষ জ্যোতির্ভূষণের কন্যার সহিত।

মহেশ্বরী তখন আট বৎসরের বালিকা। কল্পনায় চৌধুরী বাড়ির যে চিত্র নানা কাহিনী আশ্রয় করিয়া বধূ মহেশ্বরীর মনের পটে গড়িয়া উঠে তাহাতে বর্ণ-রেখা-বৈচিত্র্যের অভাব নাই—শঙ্কর চৌধুরী, সুরথ চৌধুরী, আর সর্বোপরি পদ্মনাভ চৌধুরী ও সনাতন চৌধুরী,—শেষে সেই পরলোকগত শ্বশুর ও শ্বশ্রূরা, পীতাম্বর চৌধুরী ও ছোট বড় কর্ত্রীরা। অবশ্য মহেশ্বরী আরও দেখেন—সম্মুখে এই বিত্ত-হীন, অসচ্ছল, সাধারণ ভদ্রাসন;—পাড় ভাঙা শঙ্কর দীঘি, নীল মাধবের জীর্ণ দেউল, জীর্ণ পঞ্চবটী তলা;—আর অদূরে পদ্মা। এই কঠিন বাস্তবের সহিত চৌধুরী কল্পনাকে একত্র গাঁথিয়া লইতে তথাপি মহেশ্বরী কোনো বাধা পান না। শঙ্করদীঘি, দেবীর আসন, কাছারি বাড়ি, নীলমাধবের দেউল, হাটতলার মাঠ—এইসব এখনো আছে। যাহা ছিল—আজ এখন নাই,—নদীর পয়স্তি হইয়া গিয়াছে তাহা বিষয় সম্পত্তি। কিন্তু সবই আছে যতক্ষণ চৌধুরীদের নাম আছে, ধাম আছে, আছে এই স্মৃতি, এই আত্ম-গরিমা-বোধ।

বাধা পাইতেছে বরং দেবপ্রসাদের কল্পনা।—সবই যাঁহাদের ছিল, এবং যাহাদের এখন আর তাহা নাই, তাঁহাদের যে বাহিরের পৃথিবীতে প্রতিদিন আঘাত খাইতে খাইতে রক্তাক্ত হইতে হয়। রঘুপতি চৌধুরী গর্ব করিলে হইবে কি, ঐ যে নতুন চর তাহা সেনেদেরই পয়স্ত মহাল। জালিয়াদের উপর রঘুপতি জোর করেন? কিন্তু লাভ কি? তাহারা পুরাতন মুনিবের মানপ্রাণ রাখিতেই চৌধুরীদের দিয়া যায় নদীর মাছ। না হইলে এই জল করে চৌধুরীদের কোনো দাবী নাই, তাহা জালিয়ারাও জানে। গৃহে পূজায় বিদায় প্রণামী আর তেমন

চলে না। পণ্ডিতেরা, ঘটকেরা তাহা প্রত্যাশাও করে না। দোল রাস কোনোরূপে চলে।—আপনা হইতে পালা গাহিতে আসে এখনো কোনো কথক, কোনো অখ্যাত কীর্তনিয়া। সবাই জানে—চৌধুরীদের সেইদিন আর নাই। রঘুপতি চৌধুরী নিষ্ফল রিক্ততায় শুধুই বাগাড়ম্বর করেন। কারণ, জমিজমা যাহা আছে তাহাও ইন্দু পালের নিকট সবই বন্ধক। শুধু বন্ধক নয়, তাহা এবার বিক্রয়ও হইবে তাহার নিকটে।

রঘুপতি চৌধুরীর গর্ব যখন অন্তঃসারহীন হইয়া উঠিতেছে ঠিক তখনি তিনি দেহত্যাগ করিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু শিবপ্রসাদ দেখিলেন—চৌধুরীদের নিতান্ত ঘরদুয়ার ও তৎসংলগ্ন দীঘি, পুকুর, বাগান ও থানাবাড়ির এই জমিছাড়া অন্য সব শেষ। বাকী সবই সিকস্তি হইয়া গিয়াছে। কাজেই উহারই সহিত সিকস্তি হইতে চলিয়াছে চৌধুরীদের মর্যাদা, কীর্তি।

লোহার সিন্ধুকে আছে সামান্য কয়েকখণ্ড মোহর—পূজার দিনে দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া তাহা রাখিয়া দেওয়া হয়। কাঠের সিন্ধুকে আছে বাসন-কোশন, শাল-দোশালা, পট্টবস্ত্র। আর দেউলে সনাতনের পুঁথিপত্র।

শিবপ্রসাদ অনেক ভাবিলেন। আসলে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি পূর্বেই; শুধু রঘুপতি চৌধুরীর প্রতিকূলতায় তাহা কার্যত করিতে পারেন নাই। তিনি মধ্যমগ্রামে বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মেঝকর্তা তখন ঢাকার দেওয়ানীতে উকিল; তাঁহার সহিত শিবপ্রসাদ পত্রালাপ করিলেন। ঐদিকে চিত্রিসারের শেষ সম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিয়া তিনি ইন্দু পালের দেনা চুকাইয়া দিলেন।

তারপর শুভ দিনে শিবপ্রসাদ কনিষ্ঠ দেবপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণ করিলেন—শিবপ্রসাদ জীবিকান্বেষণে চলিলেন, দেবীপ্রসাদ করিবে বিদ্যার্জন; হরপ্রসাদ রহিবেন গৃহে। প্রস্তাব উঠা অবধি চৌধুরীগৃহে সকলে এতদিন উদ্বিগ্ন, গম্ভীর হইয়া ছিল; এবার কাঁদিতে

বসিল। তারপর, অনির্দেশ্য আশায় সকলে বারেবারে মস্তকে ধারণ করিলেন সিংহবাহিনীর আশীর্বাদ, নীলমাধবের নির্মাল্য। নিশ্চয়ই, সুদিন আসিবে, মহেশ্বরীও বুঝেন।

চৌধুরীদের জীবন-যাত্রা মোড় ঘুরিয়া গেল।

ভূস্বামিত্বের সুদীর্ঘ ভূমিকা অবশেষে শেষ হইল। সামন্তভাগ্যের অতি-বিলম্বিত শেষপাদ হইতে খসিয়া পড়িয়া এবার অতি-সহজ ভাবেই শঙ্কর চৌধুরীর বংশধরগণ উদ্যোগী বৃত্তিজীবীর সক্রিয় পৈঠায় আসিয়া ঠেকিলেন। শিবপ্রসাদ মনে করিতে চাহিলেন—ইহা নূতন কিছু নয়। এমনি করিয়াই সুরথ চৌধুরীর দিন হইতে তঁহারা ভাগ্যান্বেষণ করিয়াছেন,—ইহাই উদ্যোগী পুরুষস্বভাব।—কোথা দিয়া যে পায়ের পর পা ফেলিয়া কবে হইতে এই নতুন দিকে সমাজের এই যাত্রার সূচনা হইয়াছিল, তাহা কাহারও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। নতুন অবস্থা আজ যখন মানিয়া লইতে হইল তখন সেই দৃষ্টি তাই গৃহসীমা ছাড়াইয়া খুব বেশি দূরে প্রসারিত হইয়া গেল না। দেখিল না কবে, কেন দিগ্‌দর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল; ইউরোপের বাণিজ্যতরী ভাসিয়াছিল; রাজারাজ্য চুরমার করিয়া বণিকতন্ত্র শিল্পবিপ্লবে পৃথিবী কবলিত করিল। বরং পল্লি ও পরিবারের যে প্রাচীন পরিমণ্ডল অদৃশ্যলোকে মিলাইয়া গিয়াছে—অন্তরে অন্তরে তাঁহারই স্মৃতিকে কল্পনায় অনুরঞ্জিত করিয়া—তখনো সেই স্বপ্নেই আপনাকে জীয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন চৌধুরীরা, গৃহ কর্ত্রীরা, মহেশ্বরীর মত তাহাদের বধূরা।

মহেশ্বরী দেখেন—অদূরে পদ্মা। কিন্তু তাহাতে কি? আগামী দিনের চৌধুরী-সন্ততির নিকটে বাস্তব-কল্পনার এই চৌধুরী উত্তরাধিকার তাঁহারা

—এই গৃহিণী-বধূরা—বরাবরকার মতই তুলিয়া দিয়া যাইবেন—যেমন তাঁহারা, চৌধুরী গৃহিণীরা, অব্যাহত রাখিয়াছেন তাঁহাদের চিরদিনকার ব্রতকথা, রূপকথা, তাঁহাদের আচার নিয়ম, তাঁহাদের বহু বহু পিতৃ-পিতামহীদের সঞ্চিত গৃহধর্ম ও সংস্কার। জীবন্ত থাকিবেন শঙ্কর চৌধুরী পদ্মনাভ চৌধুরী, সনাতন চৌধুরী – চৌধুরীদের মনে কল্পনায়।

যুবক দেবপ্রসাদ কিন্তু বোঝে—পদ্মাই শুধু চিত্রিসারের দুয়ারে নয়; পুরাতন পৃথিবীর সীমানা ধুইয়া মুছিয়া যাইতেছে কলিকাতায় ও বাঙলায় —কালের দুর্জয় আঘাতে। তাহার সম্মুখস্থ এই দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে এক বিরাট, অভাবনীয় সমৃদ্ধি ও উদ্যোগের জগৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে —'সংবাদ প্রভাকর' ও 'জ্ঞানান্বেষণের' পাতায় অত্যন্ত ঝাপসা রূপে তাহার রূপরেখা সে দেখিয়াছে। পুরাতন, একান্ত বিচ্ছিন্ন এই সমাজ-জীবনকে নূতন কাল প্রবল আকর্ষণে বাহিরে টানিয়া লইতেছে—পদ্মার স্রোত ধারার মাধ্যমে যেমন মহাসমুদ্রের সহস্রবাহু ঘিরিয়া লইতেছে চৌধুরীদের সেই বিচ্ছিন্ন, একান্ত চিত্রিসারকে। কিন্তু চোখে ঠেকিয়াও দেবপ্রসাদের চোখে ঠেকিল না—সমগ্র দেশের ইতিহাস বহুদিন আপনার বহু খণ্ডিত, এক-একটি অচল কেন্দ্রে আবর্তিত হইতে হইতে এখন যে খাতে গিয়া পড়িল—ইংরেজের সেই শত-বেঁকা শাসনের খাতেও বিড়ম্বিত এই জাতির জীবন আপনার গতিচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করে নাই,—উহা ভাসিয়া যাইতেছে শুধু সপ্ত-সমুদ্রের টানে, তেমনি আবর্ত তুলিয়া, অস্থির আঘাতে, নূতন জগতের ঠিকানা না জানিয়া।

চৌধুরীরা সকলেই বুঝিয়াছে – ইংরেজের সাম্রাজ্য-বন্ধনে সমস্ত দেশ আবদ্ধ; ইংরেজের বাণিজ্য-বন্ধন পল্লি পর্যন্ত প্রসারিত; ভৌমিকের ভূমিকাও শেষ হইতেছে,—এখন চাই উদ্যোগ, উদ্যম, পৌরুষ।

সমাপ্ত